"বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা-গল্পের পথিকৃত স্বর্গত হেমেন্দ্রকুমার
রায়-এর প্রকাশিত, অপ্রকাশিত ও হারিয়ে যাওয়া কিছু
ছোট ও বড় গোয়েন্দা গল্পের সংকলন।"

গোয়েন্দা অমনিবাস

হেমেন্দ্রকুমার রায়

পত্রলেখা
৯/৩, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট, ১৯৫৯

প্রকাশক : গুনেন শীল, 'পর্ণকুটীর'
৬, কামারপাড়া লেন, বরাহনগর, কলিকাতা ৩৬

প্রচ্ছদপট শিল্পী : গণেশ বসু প্রচার ও পরিকল্পনা : শীলজী

মুদ্রক : ভৈরব মুদ্রণ, ৪০ মানিক বোস ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬



হেমেন্দ্রকুমার রায়

(পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়সের ফটো হইতে)

যা আছে :

[এখানে যে কাহিনীটি দেওয়া হ'ল এটি গল্প নয়, একেবারে সত্যিকার গোয়েন্দাকাহিনী, এর একটি কথাও বানান নয়। ঘটনাস্থল আমেরিকার সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো সহর]

কালো দস্তানা

এক

—কে ওখানে? মেরি ষ্টার চেঁচিয়ে উঠল।

রাত্রিবেলা। মেরি ধড়মড় করে বিছানার উপরে উঠে বসে সভয়ে দেখলে জানলার কাছে একটা মস্ত বড় দেহ হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে আর্তনাদ করতে গেল, কিন্তু আতঙ্কে তার কণ্ঠ থেকে কোন স্বরই বেরুলো না।

অন্ধকার বিদীর্ণ করে জ্বলে উঠল একটি সূক্ষ্ম আলোক-শলাকা, পেন্সিল-টর্চ। তারই পিছনে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে একটা ভয়াবহ ছায়ামূর্তি।

মূর্তিটা কাছে এসে কর্কশ স্বরে বলল, সাবধান! চেঁচিয়েছ কি তোমার গলা কেটে ফেলেছি। তার কালো দস্তানা-পরা ডানহাতে একখানা চক্‌চকে ছুরি।

লোকটা ঘরের আলমারি-দেরাজ হাতড়ে জিজ্ঞাসা করলে,তোমার বাকি টাকা কোথায় আছে ?

মেরি তখন তার কণ্ঠস্বর ফিরে পেয়েছে, সে পরিত্রাহি চীৎকার করে উঠল।

—কী ? আবার চীৎকার। ক্রুদ্ধস্বরে এই কথা বলেই লোকটা ডান হাত দিয়ে মেরির মুখের উপরে প্রচণ্ড একটা আঘাত করলে, তারপর দ্রুত দৌড়ে দরজা খুলে বাইরে পালিয়ে গেল।

মেরি রক্তাক্ত মুখে চীৎকার করতে লাগল ॥

সেখানা হচ্ছে প্রকাণ্ড ফ্ল্যাট বাড়ি, তার মধ্যে বাস করে বহু লোক। দেখতে দেখতে চারিদিক থেকে প্রতিবেশীরা ছুটে আসতে লাগল।

মিঃ ক্যাসিনারো থাকতেন সামনের ঘরে। মেরির আর্তনাদ শুনে তিনি বাইরে বেরিয়েই দেখেন, হলঘরে দাঁড়িয়ে আছে একজন বিপুলবপু অপরিচিত মূর্তি। গায়ে তার চৌখুপী চেক-কাটা কোর্তা, হাতে কালো দস্তানা।

—কে হে তুমি ?

উত্তরে লোকটা তার উপরে ঘুসির পর ঘুসি চালাতে লাগল। ক্যাসিনারোও পাল্টা ঘুসি মারতে ছাড়লেন না। ইতিমধ্যে সেখানে হাইন্‌স নামে আর এক ভাড়াটিয়া এসে পড়লেন। অপরিচিত ব্যক্তি বেগতিক দেখে একটা গরাদহীন জানলা দিয়ে লাফ মেরে বাইরে গিয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে ফোনে খবর পেয়েই দ্রুতগামী মোটরে চড়ে হ্যাঙ্ক, ডেভিস্ ও উয়েল নামে তিনজন পুলিশ কর্মচারী এসে হাজির।

সংক্ষেপে সব শোনবার পর তাদের ধারণা হ'ল অপরাধী এখনো বেশী দূর যেতে পারেনি, রাস্তায় খুঁজলে আবার তার দেখা পাওয়া যেতে পারে।

ঠিক তাই। গাড়ী ছুটিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হবার পরই দেখা গেল

একটা দ্রুতধাবমান মূর্তি—গায়ে তার চৌখুপী চেক-কাটা কোর্তা।

—এই! থামো, থামো!

আর থামো! সে আরো বাড়িয়ে দিলে দৌড়ের বেগ।

ডেভিস্ রিভলবার তুলল। পুলিসের সবাই জানে, অব্যর্থ তার লক্ষ্য।

ছুটন্ত লোকটা খুব উঁচু একটা কাঠের পাঁচিলের সামনে গিয়ে পড়ল, মানুষের পক্ষে যা লাফিয়ে পার হওয়া অসম্ভব। কিন্তু লোকটা দাঁড়াল না, মারলে লাফ। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিময় ধমক দিয়ে উঠল ডেভিসের রিভলবার। পলাতকও অদৃশ্য হ'ল পাঁচিলের ওপারে। সবাই অবাক!

ডেভিস্ বললে, আমার দৃঢ় ধারণা, গুলিটা লেগেছে গিয়ে লোকটার পায়ে।

কাঠের পাঁচিলে দেখা গেল রিভলবারের গুলির চিহ্ন। পাঁচিলের ওপাশে পাওয়া গেল রক্তের দাগ। লোকটার পাত্তা পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু সে আহত হয়েছে।

দুই

পরদিন সকালে চোরের ছুরিখানা পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞ বললেন, এর বাঁটে কতকগুলো দাগ আছে বটে, কিন্তু এত অস্পষ্ট যে কোনই কাজে আসবে না।

পুলিশের বড়কর্তার কাছে বসে ডিটেক্‌টিভরা এই ঘটনা নিয়ে আলোচনা করলেন—

একজন বললেন, চোরের বর্ণনা আর কার্যপদ্ধতি পাওয়া গেছে। তার সঙ্গে থাকে ছুরি আর পেন্সিল-টর্চ। সে গায়ে পরে চৌখুপী চেক-কাটা কোর্তা আর হাতে পরে কালো দস্তানা। তার কালো

কোঁকড়ান চুল, চেহারা ভালো। মাথায় সে ছয় ফুটের চেয়ে উঁচু। মেরি ষ্টারকে সে ছুরি দিয়ে ভয় দেখিয়েছে।

আর একজন বললেন, গেল ডিসেম্বর আর জানুয়ারীতে ঠিক এই রকম দেখতে আর একজন লোক কালিফোর্নিয়ায় আর বুন ষ্ট্রীটে আরো দুজন স্ত্রীলোকের বাড়ীতে হানা দিয়েছিল।

আর একজন বললেন, এ-সব একই চোরের কীর্তি না হয়ে যায় না। চোরের কার্যপদ্ধতি অবিকল একরকম। সে রাত্রে চুরি করতে ঢোকে ঘুমন্ত স্ত্রীলোকদের ঘরে।

আপাতত সূত্র এর বেশী এগুলো না।

* * *

কয়েকদিন পরেই ন্যান্‌সি মুলার নামে একটি মহিলার ঘরে কালো দস্তানা পরা চোরের আবির্ভাব হ'ল।

আরো কয়েকদিন পরে সে হানা দিলে মিসেস্ বিলি স্টারের ঘরে এবং সেখানে কুড়িয়ে পাওয়া গেল তার কালো দস্তানা দুটো। নিশ্চয়ই সে দস্তানা পরে আঙুলের ছাপ লুকোবার জন্যে।

আর একটা সূত্র পাওয়া গেল।

শেষোক্ত ঘটনাক্ষেত্রে একজন প্রতিবেশী চুরির পরে দেখেছিল, চৌখুপী চেক-কাটা কোর্তাপরা একটা লোক একখানা নীলরঙের মাল সরবরাহের ট্রাক চালিয়ে চলে যাচ্ছে।

গোয়েন্দাদের মনে প্রশ্ন জাগল, তবে কি চোর এমন কোন কোম্পানীতে চাকরি করে, যাদের কাজ হচ্ছে গাড়ীতে করে মাল সরবরাহ করা!

গোয়েন্দারা যখন মাল সরবরাহের গাড়ীর কারখানায় কারখানায় খোঁজখবর নিচ্ছে, তখন কয়েকদিনের মধ্যেই আরো চার জায়গায় হানা দিলে কালো দস্তানার চোর। কিন্তু পুলিশ কোথাও তাকে গ্রেপ্তার করবার মত কোন নতুন সূত্রই আবিষ্কার করতে পারলে না।

তারপর আরো তিন জায়গায় হ'ল দশ, এগারো ও বারো নম্বরের

চুরি। শেষ ঘটনাক্ষেত্রে গোয়েন্দারা খুঁজে পেলে চোরের একপাটি জুতোর ছাপ। অস্পষ্ট ছাপ বটে, কিন্তু তারই সাহায্যে তোলা হ'ল নিখুঁত একটি ছাঁচ।

গোয়েন্দা ব্রাউন খুসি হয়ে বললেন, চোর ধরা পড়লে এই ছাঁচই হবে তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

গোয়েন্দা আর্ন বললেন, হ্যাঁ, যদি আমরা কখনো তাকে ধরতে পারি।

মেয়ে-মহলে হ'ল বিষম আতঙ্কের সৃষ্টি। কালো দস্তানার চোর বেছে বেছে কেবল আত্মরক্ষায় অক্ষম নারীদেরই আক্রমণ করে। এখনো সে কাউকে খুন করেনি বটে, কিন্তু করতেই বা কতক্ষণ!

পুলিশ উঠে পড়ে লাগল। তেরোজন সুদক্ষ গোয়েন্দাকে নিযুক্ত করা হ'ল কেবল একটিমাত্র মামলার জন্যে। কত সন্দেহজনক ব্যক্তি এবং পুরাতন অপরাধীকে ধরে আনা হ'ল কিন্তু তারা সবাই একে একে ছাড়া পেল প্রমাণ অভাবে। দু'জন গোয়েন্দা প্রায় সারা রাত ধরে গাড়ী নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল, যদি দৈবগতিকে চোরের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়! একটানা পরিশ্রম ও অনিদ্রার জন্যে গোয়েন্দাদের চেহারা হয়ে উঠল লক্ষ্মীছাড়ার মতো। খবরের কাগজেও রীতিমত সাড়া পড়ে গেল। এমন দুর্ধর্ষ ও অদ্ভুত চোরের কথা এর আগে কোনদিন শোনা যায়নি।

গোয়েন্দারা আর এক অভিনব উপায় অবলম্বন করলে। চোর যে সব স্ত্রীলোকের বাড়ী হানা দিয়েছিল, প্রতি রাত্রে টহল দেবার সময়ে তারা সঙ্গে করে নিয়ে বেরুতে লাগল তাঁদের কাউকে না কাউকেই। জনতার মধ্যে যদি তারা কাউকে চোর বলে চিনতে পারে।

কিন্তু তবু কোন সুরাহা হ'ল না। সহরের প্রায় প্রত্যেক গোয়েন্দা ও পাহারাওয়ালা যখন কালো দস্তানার চোরকে পাকড়াও করবার জন্যে অত্যন্ত সজাগ হয়ে আছে, তখন পুলিসের নাকের উপরেই চলতে লাগল ঘন ঘন চুরির পর চুরি।

তিন

অবশেষে—

চোর হানা দিলে আর এক মেয়ের ঘরে। কত তুচ্ছ সূত্র থেকে গোয়েন্দারা কত বড় রহস্য ভেদ করতে পারে, এইবার তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

কথা প্রসঙ্গে মেয়েটি গোয়েন্দাদের বললে, আমার ঘরের দেওয়ালে একখানা বাড়ির ছবি টাঙানো রয়েছে দেখেছেন? চোর হঠাৎ ঐ ছবিখানা দেখে ব'লে উঠেছিল, তাদের প্রেষ্টনে ঠিক ঐরকম একখানা বাড়ি আছে।

গোয়েন্দারা প্রেষ্টনের সংশোধনী কারাগারে (রিফরমেটরি) কর্তৃপক্ষকে ফোনে জিজ্ঞাসা করলে, কালো দস্তানার চোরের বর্ণনার সঙ্গে যার চেহারা মিলে যায়, এমন কোন কয়েদিকে ওখান থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কিনা।

বিশেষ করে দুজন লোকের নাম পাওয়া গেল। জিম ডাউনি ও ফ্রাঙ্ক আভিলেজ্। দুজনে কারাগারে গিয়েছিল মেয়েদের আক্রমণ ক'রে।

গোয়েন্দারা প্রথমে গেল ডাউনির বাসায়। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না।

তারপর সন্ধ্যার সময়ে আভিলেজের বাসায় গিয়ে দ্বারে করাঘাত করতে বেরিয়ে এল তার মা। বললে, আমার ছেলে আর এখানে থাকে না। বিয়ে করে নতুন বাসায় উঠে গিয়েছে।

—নতুন বাসার ঠিকানা?

বুড়ি ঠিকানা দিলে।

আভিলেজের নতুন বাসা। তার তরুণী স্ত্রী বেরিয়ে এসে বললে, আমার স্বামী বাড়ীতে নেই।

গোয়েন্দারা বললে, আমরা পুলিশের লোক। তোমাদের বাড়ীর ভিতরটা দেখব।

মিসেস আভিলেজ্ সমস্ত শুনে সবিস্ময়ে বলল, আমার স্বামী পরম সাধু। রাত্রে তিনি কোনদিন বাইরে পা দেন না, আমার সঙ্গেই থাকেন।

—কোনদিনই সে রাত্রে বাইরে যায় না?

—কোনদিন না।

—তবে আজ রাত্রে সে বাসায় নেই কেন?

—তিনি সিনেমায় গিয়েছেন।

—তুমি যাওনি কেন?

—আমি সিনেমা পছন্দ করি না।

—আভিলেজ প্রায় সিনেমায় যায়?

—হ্যাঁ, প্রায়ই।

—এই তোমার একটা মিথ্যা কথা ধরা পড়ল। তোমার স্বামী প্রায়ই রাত্রে বাড়ী থাকে না।

বাড়ীর একটা ঘরে পাওয়া গেল পেন্সিল-টর্চের কয়েকটা ব্যাটারি।

মেরি ষ্টারের ফ্ল্যাট-বাড়ীতে চোরের যে ছুরিখানা পাওয়া গিয়েছিল সেখানা ছিল একজন গোয়েন্দার কাছে। সে ছুরিখানা লুকিয়ে একটা দেরাজের ভিতরে ফেলে দিলে। তারপর ফিরে এসে মিসেস্ আভিলেজকে দেখিয়ে ছুরিখানা আবার দেরাজের ভিতর থেকে তুলে জিজ্ঞাসা করলে, এখানা কার ছুরি?

—আমার শ্বশুরের। গেল হপ্তায় তাঁর কাছ থেকে আমার স্বামী চেয়ে নিয়ে এসেছেন।

—গেল হপ্তায়! এটা হচ্ছে জুলাই মাস, আর ছুরিখানা পুলিশের হেপাজতে আছে গত ফেব্রুয়ারী মাস থেকে।

—মিসেস্ আভিলেজ্, তুমি মিথ্যে কথা ব'লছ। আমরা সত্য কথা জানতে চাই।

—আমি আর কোন কথাই বলব না। আমি আমার স্বামীকে ভালোবাসি। তিনি চোর, একথা আমি বিশ্বাস করি না।

এমন সময় ঘরের বাইরে চৌখুপী চেক-কাটা কোর্তা পরা একটি লোক সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করলে, ঘরের ভেতর কে?

মিসেস্ আভিলেজ্ দ্রুত ছুটে গিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, ওগো পুলিস!

আভিলেজ্ চোখের পলক পড়তে না পড়তেই ফিরে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে মারলে এক লাফ।

একজন গোয়েন্দা রিভলবার তুলে ঘোড়া টেপেআর কি, আচম্বিতে মিসেস্ আভিলেজ্ ঝাঁপিয়ে পড়ল রিভলবারের সামনেই।

সেই ফাঁকে আভিলেজ্ আবার চলে গেল চোখের আড়ালে।

এরপরে একেবারে ভেঙে পড়ে মিসেস্ আভিলেজ সমস্ত কথাই আর স্বীকার না করে পারলে না।

চার

আর বেশী কিছু বলবার নেই।

দুই শত পুলিশের লোক তন্ন তন্ন করে গোটা শহরটা খুঁজে বেড়াচ্ছে তবু আভিলেজের টিকি দেখবার জো নেই।

চোর যে আর নিজের বিপজ্জনক বাসায় ফিরে আসবে না, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। গোয়েন্দারা তার মায়ের বাসায় গিয়ে হাজির।

সেখানে চোরের দেখা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু দৃশ্যমান হবার সঙ্গে সঙ্গেই আশ্চর্য তৎপরতা দেখিয়ে আবার সে হ'ল অদৃশ্য।

দলে দলে পুলিশের লোক ছুটল পিছনে পিছনে। আবার এ রাস্তা ও রাস্তা।

একখানা বাড়ীর উপর থেকে একজন মহিলা বললেন, একটা লোক এইমাত্র আমার বাগানের ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে ঐ দশ ফুট উঁচু বেড়াটা পার হয়ে ওপাশে গিয়ে পড়েছে।

বেড়ার ওপাশে গিয়ে দেখা গেল, একখানা মোটরগাড়ীর তলায় লুকিয়ে রয়েছে ফ্রাঙ্ক আভিলেজ্‌ স্বয়ং। গোয়েন্দারা রিভলবার বার করতেই সে কাতরে বলে উঠল, গুলি কর—আমাকে পাগলা কুকুরের মত গুলি করে মেরে ফ্যালো।

—তোমাকে কেউ গুলি করে মেরে ফেলব না আভিলেজ্‌। গাড়ীর তলা থেকে বেরিয়ে এস।

কালো দস্তানার চোর ধরা পড়েছে শুনে চারিদিক থেকে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা ক্যামেরা নিয়ে ছুটে এল।

আভিলেজ প্রাণপণে ধস্তাধস্তি করতে করতে বললে, না, না, না। ছবি তুলতে আমি দেব না। খবরের কাগজে আমার ছবি বেরুবে! তাহলে আমার বউয়ের দুঃখের সীমা থাকবে না। সে বালিকা, তার বয়স মোটে সতেরো বছর।

কিন্তু ছবি তার উঠল।

ক ক ক

বলা বাহুল্য, আভিলেজের বাসা এখন জেলখানায়।

সাড়ে বারোটার দুপুর……

সিকাগো শহরের মিচিগ্যান এ্যাভেন্যু ও বাইশ নম্বর রাস্তার মোড়।…এক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। বেশ চঞ্চল ভাব ; ব্যস্ততা সারা দেহে। হঠাৎ একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে আসতে দেখে—হাত তুলে থামালেন। তাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। পরণে নীল রং-এর সার্জের গাউন। তার ওপর খয়েরী একটা ফ্রক কোট। হাতে একটা লেডিস ব্যাগ। চোখে গগল্‌স।

—কোথায় যাব, মেমসাব?—সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করল ট্যাক্সি-ড্রাইভার।

—ড্রেকসেল ষ্টেট ব্যাঙ্ক। কটেজ গ্রোভ এ্যাভেন্যু—বলে দরজা খুলে নবাবী চালে ঢুকে বসলেন ভদ্রমহিলা গাড়ির ভেতরে। ড্রাইভারও গাড়িতে ষ্টার্ট দিল।

একটু পরে ব্যাঙ্কের দরজায় এসে ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল—

—অপেক্ষা করব নাকি, মেমসাব?

—নিশ্চয়ই—বলে দুলকি চালে ব্যাঙ্কের ভেতর ঢুকে পড়লেন ভদ্রমহিলা। ড্রাইভার দরজার সামনে অপেক্ষা করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে আরোহিণী ফিরে এলেন। বিরক্তিতে ভেঙে পড়ে ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, কি বিভ্রাট! ব্যাঙ্কের ম্যানেজার টিফিন করতে চলে গেছেন। আজকে আর 'চেক' ভাঙান হ'ল না। এদিকে হাতেও পয়সা নেই, তোমার ভাড়া দিই কি করে বল দিকিনি?—লজ্জিত হয়ে পড়লেন যেন।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার ঘাড় চুলকাতে লাগল। কি ফ্যাসাদ!

একটু পরে ভদ্রমহিলা ভাঙ্গা গলায় বললেন—ভাড়াটা যদি কালকে দি, খুব অসুবিধা হবে নাকি?

—কালকে দেবেন।—হতাশ কণ্ঠে বলে উঠল সোফার। পরে ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে বললে—যখন নেই, তখন কি আর করবেন, কালই না হয় দেবেন।

মেমসাহেবকে বেশ ভদ্রঘরের বলেই মনে হচ্ছে।

আরোহিণীর মুখে ফুটে উঠল একটা তৃপ্তির হাসি। বললেন—কালকে আমি তোমার গাড়িতেই আবার আসব। চেকটা ভাঙ্গিয়েই তোমার দেনা শোধ করে দেব। সেই সঙ্গে তোমাকেও একটা দশ ডলারের নোট,—তোমার বক্‌শিস।

—আশা করি আমাকে ঠকাবেন না।—জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালো ড্রাইভার।

—কি যে বল।—বলে দরজা খুলে বসলেন প্রৌঢ়া মহিলাটি। আর একটা কাজ যদি কর, আমাকে আবার মিচিগ্যান এ্যাভেন্যুতে ছেড়ে দাও—অনুরোধের সুর জুড়ে দিলেন পরে। ড্রাইভারকে অগত্যা আবার গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে হ'ল। কথা রইল—আগামীকাল ঠিক দশটায় মিচিগান এ্যাভেন্যুর মোড়ে আসবে। মেমসাহেবকে আবার নিয়ে যাবে ব্যাঙ্কে।

পরের দিন। একুশে ডিসেম্বর।···সোফার এলবার্ট ঠিক দশটার সময় এসে দেখল,ভদ্রমহিলা আগে থেকে এসে মোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

মিনিট দশেকের মধ্যেই তারা গিয়ে পৌঁছল ব্যাঙ্কে।

গাড়ি থেকে নেমেই মেমসাহেব ড্রাইভারকে বললে—ঠিক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাক। ভেতর থেকে তোমায় যেন দেখতে পাই। এলবার্টেও সেই ইচ্ছা। আগের দিনের ভাড়াটাও বাকি আছে। কে জানে—পেছনের দরজা দিয়ে সরে পড়তে পারে।

ভদ্রমহিলা সোজা ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। একটু ইতস্ততঃ করে ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

মিঃ নীল, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার টেবিলে বসে কাজ করছিলেন। মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন—কি চাই?

—আমি একটা এ্যাকাউন্ট খুলতে চাই। শান্ত কণ্ঠে বললেন ভদ্রমহিলা।

—বসুন। সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন ম্যানেজার সাহেব। আসন গ্রহণ করলেন নতুন খদ্দের।—সবার আগে আমার পরিচয়-পত্রটা পড়তে অনুরোধ করছি আপনাকে, মিঃ নীল।—বলে একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন ম্যানেজারের সামনে।

মিঃ নীল কাগজটা হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। লেখা রয়েছে তাতে—

'সাবধান করে দিচ্ছি আপনাকে, যদি চীৎকার করেন কিংবা একটুও বেচাল দেখান, তাহলে আপনার সঙ্গে, আপনার ব্যাঙ্কের সমস্ত কর্মচারীই একসঙ্গে মারা পড়বে।'

ম্যানেজারের মুখে ফুটে উঠল দারুণ বিস্ময়! আতঙ্কে তাকালেন সামনের নিরীহ প্রাণীটির দিকে। একি ব্যাপার শুনলেন! ভদ্রমহিলা আবার শুরু করলেন—যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, দরজার দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। আমার একজন সহকারী দাঁড়িয়ে আছে ট্যাক্সি চালকের ছদ্মবেশে। সকলেই এসেছে আজ ওই বেশে।

মিঃ নীল পাশের জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। সত্যিই-ত' একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে। বিষম ঘাবড়ে গেলেন। কি করা যায় এখন?

ততক্ষণে সামনের নারী মূর্তিটি আবার বলতে শুরু করেছেন—আমার কাছে ৫০০ পাউণ্ডের একটা বোমা সম-পরিমাণ বিস্ফোরণ আছে—নাইট্রোগ্লিসারিণ। যদি আমার কথামত কাজ না করেন আমি আপনাকে এবং এ ব্যাঙ্কের সকলকেই উড়িয়ে দোব। এক্ষুণি পাঁচ হাজার ডলার আনতে হুকুম দিয়ে দিন।

মিঃ নীল জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো একবার ভিজিয়ে নিলেন। পরে কাঁসর-ভাঙা গলায় বলে উঠলেন—টাকাটা আপনি কি ভাবে চান,—মিস্?

—সব দশ ডলারের নোট। গম্ভীর স্বরে হুকুম দিলেন শ্রীমতি। মিঃ নীল বেয়ারাকে দিয়ে একটা স্লিপ ক্যাশিয়ারকে পাঠিয়ে দিলেন। ভদ্রমহিলা হাত-ব্যাগটা একবার খুললেন। ভেতরে একটা রিভলবারের কুঁদো যেন দেখা গেল। একটু পরে আদেশ মতো ক্যাশিয়ার টাকাটা নিয়ে এসে হাজির করলেন। শ্রীমতিও ক্ষিপ্র হাতে ব্যাগে ভরে ফেললেন।

, কাজের ফাঁকে ম্যানেজারের মুখের দিকে তাকাল একবার ক্যাশিয়ার। একি ব্যাপার?—কোথায় যেন খটকা লাগছে। মনিবের মুখে-চোখে কেমন যেন একটা আতঙ্কের ভাব। বহুদিন তাঁর অধীনে কাজ করছেন, কিন্তু ম্যানেজারসাহেব যখন নিজে কিছু বলছেন না তখন কিছু একটা করে বসা উচিত হবে না, এ ভেবে ক্যাশিয়ার প্রভুভক্ত কুকুরের মতন পাশে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

মেমসাহেব কাজ গুছিয়ে নিয়ে এবার উঠে দাঁড়ালেন। চলার পথে বলে উঠলেন—সামান্য কটি টাকা। প্রাণে যে বেঁচে গেলেন এই রক্ষে! যাক্, আমাকে কিন্তু অনুসরণ করবার চেষ্টা করবেন না। বিপদ ঘটতে পারে!

ক্যাশিয়ার সবই শুনল এবং তৈরী হয়ে নিল। ইঙ্গিতের অপেক্ষায় শিকারী বেড়ালের মত ওঁৎ পেতে রইল।

চতুরিকাটি যেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, ম্যানেজার চিৎকার করে উঠলেন—জাপটে ধর মেয়েটাকে! ওর কাছে বিস্ফোরক আছে! বার করতে দিও না কোন মতে।

ক্যাশিয়ার প্রস্তুত হয়েই ছিল। ব্লাডহাউণ্ডের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ল। অক্টোপাসের মতন জড়িয়ে ধরল নারী-দস্যুকে। কোন সুযোগই দিল না, পিস্তল কিংবা বিস্ফোরক ব্যবহার করবার। তার পরের ঘটনাটা খুবই ছোট্ট। পুলিস এল। গ্রেপ্তার করল মেয়ে-ডাকাতটাকে।

তদন্তে দেখা গেল, অপরাধীর নাম মিসেস অ, কু, ব। বয়স ছত্রিশের কাছাকাছি। পেশা, নার্সগিরি। দু'বার বিয়ে করেছে। একটি আট বছরের মেয়েও আছে। সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে—সে নিজে একজন কবি এবং নাম করা একজন ডিটেক্‌টিভ গল্প লেখিকা।

পুলিশের জেরায় উত্তরে স্বীকার করল—দারুণ আর্থিক অনটনে সারা রাত্রি ধরে উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ মনে পড়ে যায়, সে ত' নিজেই একটা ডিটেক্‌টিভ গল্প লিখেছিল। কি করে একটা মেয়ে ব্যাঙ্কে ডাকাতি করেছে, হুবহু সে যেমনটি নিজে করেছে। ঘটনার দিন ড্রেকসেল ষ্টেট ব্যাঙ্কে নিজের লেখা মাফিকই চেষ্টা করেছিল। নিদারুণ আর্থিক অনটন ঘোচাবার এটাই ছিল তার একমাত্র পথ। শুধু ধোঁকাবাজিতেই কাজ হসিল করবার ইচ্ছা ছিল তার।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেল, তার হাতের শিশিতে বিস্ফোরক ছিল না,—ছিল শুধু স্রেফ জল। আর ব্যাগের ভেতরে পিস্তলের কুঁদো বলে যেটাকে মনে হয়েছিল, সেটা ছিল একটা পাকানো সাধারণ লোহা। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! ডিটেকটিভ উপন্যাস লেখিকার কি শোচনীয়ই না পরিণতি।

প্রথম দিন কি হয়েছিল জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর দিল—সেদিন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সত্যিই টিফিন করতে গেছিলেন। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করলে পাছে লোকের সন্দেহ হয়, এই আশঙ্কায় বিফল মনোরথেই বাড়ি ফিরে গেছিল। হাতে একটাও পয়সা ছিল না। ছোট্ট মেয়েটাকে নিয়ে সেদিন একরকম উপোস করেই কাটিয়ে দিয়েছিল।

১৯৩৯ সালে ৯ই জানুয়ারী কুক্ কাউন্টি ক্রিমিনাল কোর্টের চিফ জাষ্টিস মিঃ মাইকেল এল ক্যাকিনল্যর এজলাসে অ, কু, ব-র বিচার হল। অপরাধিনী তার দোষ স্বীকার করল।

যদিও অভাবের তাড়নায় একটা অন্যায় করে ফেলেছে, কিন্তু অপরাধী একজন নারী এবং সারা জীবন সৎপথে কাটিয়েছে, এই বিবেচনায় জজসাহেব শাস্তিটা একটু কম করেই দিলেন।

—

আগন্তুক

এই ঘটনাটি ঘটেছিল আমেরিকার কান্‌সাস শহরে, ১৯৪৭সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।

শীতের রাত্রি। প্রায় একটা বাজে। শেষ খদ্দের চলে যাবার কিছুক্ষণ পর 'স্পিক্ ইজি বার'-এর মালিক র‍্যালফ্ মিলার সারা দিনের মদ বিক্রীর টাকা সিন্দুকে গুছিয়ে রাখছিলেন। এমন সময় সামনের দরজা খোলার যেন একটু শব্দ হল! একজন আগন্তুক প্রবেশ করলেন। লম্বা চওড়া বিরাট দেহ; তার ওপর একটা ওভারকোট। ফেল্‌ট হ্যাটটা দুরন্ত শীত এড়াবার জন্যেই বোধহয় বেশ খানিকটা নাক পর্যন্ত ঢাকা পড়েছে। গলায় একটা মোটা মাফলার—দাড়ির বেশ খানিকটা ঢাকা পড়েছে।

আগন্তুকের দিকে চোখ তুলে তাকালেন মিঃ মিলার। জানালেন, তাঁর 'বার' বন্ধ হয়ে গেছে। ভদ্রলোকের প্রয়োজন না মেটাতে পারার জন্য বড়ই দুঃখিত তিনি।

আগন্তুকের মধ্যে কিন্তু কোন চাঞ্চল্যই দেখা গেল না। ওভারকোটের পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়েধীর পদে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে এলেন। সামনেই খোলা সিন্দুকের ভেতর থরে থরে সাজানো কারেন্সী নোট।

রাতের অতিথিকে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে মিলার তখুনি সিন্দুক বন্ধ করবার জন্য উদ্যোগ করলেন। হঠাৎ আগন্তুক কাউন্টারের এক কোণে এসে কর্কশ কণ্ঠে বললেন, প্রাণের মায়া থাকলে সিন্দুক বন্ধ ক'রো না।

মিঃ মিলার চমকে উঠলেন। মুখে চোখে ফুটে উঠল অপরিসীম বিস্ময়; সিন্দুক বন্ধ না করার কারণ জানতে চাইলেন না তিনি।

আগন্তুক এবার তার কোটের পকেট থেকে ডান হাতটা বার করলেন। হাতে ঝক্‌ঝক্ করছে একটা ১৮-র কোলটের রিভলবার। দৃঢ় দৃষ্টিতে মিলারের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

মিঃ মিলারের এবার বুঝতে বাকি রইল না, লোকটি কি চায়? কিন্তু সারাদিনের পরিশ্রমের মূল্য এবং তাঁর ভবিষ্যতের সংস্থানটুকু একজন ডাকাতের হাতে তুলে দিতে তিনি একান্তই নারাজ। এধার ওধার তাকালেন—সাহায্যের আশায়। যদি কোন পথভোলা পথিক ভুল করে বারে ঢুকে পড়েন, যদি কোন মাতাল এখনও স্থান মাহাত্ম্য ভুলতে না পেরে থাকে।

আগন্তুকের চোখে বোধহয় মিলারের উদ্দেশ্য ধরা পড়ল। এক পা সরে গিয়ে মিলারের মাথায় রিভলবারের কুঁদোটা সজোরে বসিয়ে দিল সে।



অস্ফুট একটা কাতরোক্তি করে র‍্যালফ্ মিলার সংজ্ঞা হারিয়ে রক্তাপ্লুত দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আগন্তুক এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে, খোলা সিন্দুকের ভেতর থেকে দশ হাজার টাকা গুছিয়ে নিয়ে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে এল। সামনেই হুইস্কীর বোতল। শরীরে আমেজ আনবার জন্যে পরিষ্কার একটা 'পেগ গ্লাস' পাশ থেকে টেনে

নিল। সবচেয়ে দামী বোতল থেকে বেশ কিছুটা মদে ভর্তি করে নিল গ্লাসটা। তারপর এক চুমুকেই সেটা শেষ করে শিস্ দিতে দিতে বার থেকে বেরিয়ে গেল। 'পেগ্ গ্লাস'টা কাউন্টারের উপরেই পড়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে মিঃ মিলারের জ্ঞান ফিরে এল। আস্তে আস্তে চোখের সামনে পূর্বের ঘটনাগুলো ভেসে উঠল তাঁর। দুর্বল শরীরে তিনি কোন রকমে উঠে দাঁড়ালেন। সামনের সিন্দুকটা খাঁ খাঁ করছে। তার সারা জীবনের সঞ্চয় হারিয়ে গেছে। শেষের খদ্দের তাঁকে পথে বসিয়ে দিয়েছে। একে সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম তার ওপর এমন একটা আঘাত—মিঃ মিলারের মাথা ঘুরতে লাগল। চোখের সামনে হলের টেবিল চেয়ারগুলো সব যেন নাচতে শুরু করল। মিঃ মিলারের মনে হল আবার তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন। কিন্তু এখন জ্ঞান হারালে তো চলবে না, তাই শরীরের সমস্ত শক্তি নিংড়ে তিনি সাহায্যের জন্য চীৎকার করে উঠলেন। নিঝুম রাতে তাঁর সে চীৎকার অনেক দূর পর্যন্ত ভেসে গেল।

মিনিট কয়েক পরে 'পেট্রল পুলিশ' মিঃ জন হিগ্‌সন 'বারে'প্রবেশ করল। মিঃ মিলারের মুখে সব শুনে সে সঙ্গে সঙ্গে ফোনে হেড-কোয়ার্টার থেকে সাহায্য চেয়ে পাঠাল।

অল্পক্ষণের মধ্যে কানসাস্ শহরের পুলিশের বড়কর্ত্তার সঙ্গে ডিটেক্‌টিভ ক্যাপ্টেন মিঃ সিমসন্ এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। তদন্তকার্যও সুরু হয়ে গেল। মিঃ মিলারকে জেরা করা হলো। মিঃ মিলার উত্তরে জানালেন,এর আগে তিনি কোনদিন আসামীকে তাঁর দোকানে আসতে দেখেননি, তার ওপর আসামীর মুখ এবং দাড়ি টুপি ও মাফলারে ঢাকা থাকায় তাঁর পক্ষে তাকে চেনা কষ্টকর।

তদন্তে কোন সূত্রই পাওয়া গেল না। নিশুতি রাতে আসার জন্য দুর্বৃত্তকে কেউ দেখেনি এবং 'বার'-এর আশেপাশে ঘটনার সময় কেউ না থাকায় আসামীকে অনুসরণ করার কোন ব্যবস্থাই হয়নি। সে যেন মাটি ফুঁড়ে এসে হাওয়ায় মিশে গেছে।

পুলিশের বড় কর্তার কপালে সর্পিল রেখা ফুটে উঠল। গভীর চিন্তায় মুখ-চোখ থম থম করতে লাগল তাঁর। এখন কি উপায়? আসামীকে খুঁজে বের করার কোনপথই কি নেই! কোথাও কি কোন চিহ্নই সে রেখে যায়নি! তাকে পাবার অলক্ষ্য গতিপথে হুকুম দিলেন, আরও গভীর অনুসন্ধান চালাতে, খুঁজে দেখতে সব কটা কোণ, পরীক্ষা চালাতে সব কটা অসামঞ্জস্য। অপরাধী সাধারণতঃ কিছু না কিছু ভুল করেই! তাই আবার চললো কঠোর অভিযান। অপরাধীর ভুলের হিসাব-নিকাশ, তার সামাজিক মূল্য নিরূপণের।

হঠাৎ ক্যাপ্টেন সিমসনের নজর পড়ল কাউন্টারের উপরে একটা 'পেগ্ গ্লাস'—তলায় খানিকটা মদের তলানি। এর সঙ্গে কি সম্পর্ক থাকতে পারে খানিকক্ষণ আগেকার ডাকাতির সঙ্গে? মদের দোকানে থকেবে 'পেগ্ গ্লাস,' আর তার তলায় থাকবে মদের তলানি এ আর এমন আশ্চর্য্য কি! তবু সন্ধানী চোখে কেমন যেন একটা খট্‌কা লাগল! পরীক্ষার ফাঁকে ক্যাপ্টেন সিমসন মিলারকে রহস্যচ্ছলে জিজ্ঞাসা করলেন, সম্বিৎ ফিরে পাওয়ার পর বেশ খানিকটা ব্রাণ্ডি খেয়ে আপনাকে শক্তি সঞ্চয় করতে হয়েছিল, না মিষ্টার মিলার?

মিঃ মিলার বিস্ময় প্রকাশ করলেন; কই ঘটনার পর তিনি তো কোন কিছু খাননি! তবে?

ক্যাপ্টেন সিমসন ঘুরে দাঁড়ালেন। একটা ক্ষীণ রশ্মি হয়ত তিনি দেখতে পেয়েছেন। কৌতুহল ভরে র‍্যালফ মিলারকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঘটনার পরে আপনি মদ খাননি? তবে কাউন্টারের পেগ্-গ্লাসে মদের তলানিটুকু এল কি করে? বোধহয় শেষের দিকের কোন খদ্দেরের পানবিশেষ পরিষ্কার করা হয়নি, না মিঃ মিলার?

—না ক্যাপ্টেন সিমসন, আমার কর্মচারীরা সমস্ত গেলাস পরিষ্কার করে কাউন্টারের সেল্‌ফে রেখে গিয়েছিল। আমি হলফ করে বলতে পারি, অজ্ঞান হবার আগে কাঁউন্টারে-এ গেলাস ছিল না।

ক্যাপ্টেন সিমসনের চোখ দুটো শিকারী বেড়ালের মতন জ্বল্‌জ্বল্

করে উঠল। অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করলেন, জ্ঞান হবার পর আপনি এ গেলাস স্পর্শ করেছেন নাকি?

—না। উত্তর দিলেন র‍্যালফ্ মিলার।

—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। অপরাধীর অজানিত ভুল বোধহয় ধরা পড়েছে। তার পথের নিশানা সে-ই রেখে গেছে।

সন্তর্পণে 'পেগ্ গ্লাস'টা অয়েল পেপারে মুড়ে নিয়ে ক্যাপ্টেন সিম্সন 'বার' থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাবার পথে সার্জেণ্ট গ্রিগ্-কে আর কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা পরীক্ষা করবার আদেশ দিয়ে গেলেন।

হেড কোয়ার্টারে পৌঁছেই ক্যাপ্টেন সিম্সন গ্লাসটা পুলিশ-ল্যাবরেটরীতে পাঠিয়ে দিলেন পরীক্ষা করে দেখতে, কোন আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া যায় কিনা।

পরের দিন সকালে রিপোর্ট এল, গ্লাসে আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া গেছে। সেটা অদৃশ্যভাবে পড়েছিল। বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিস্ফুট করার পর ফটো নেওয়া হয়েছে। ফটোগুলোও পাঠিয়ে দিয়েছে ল্যাবরেটরী থেকে। অতএব কালক্ষেপ না করে ক্যাপ্টেন সিম্সন সেগুলো পাঠিয়ে দিলেন 'ক্রিমিন্যাল ব্যুরো'তে মিলিয়ে দেখবার জন্যে—কোন দাগী আসামী কিংবা সন্দেহভাজন ব্যক্তির আঙ্গুলের ছাপের সঙ্গে মেলে কিনা।

দুপুরের দিকে খবর এল, সিম্সনের পাঠানো আঙ্গুলের ছাপ দাগী আসামী ডিক্ মার্টিনের ছাপের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

পুলিশ তৎক্ষণাৎ ডিক্ মার্টিনকে গ্রেপ্তার করল।

জেরার উত্তরে মার্টিন জানালো, ঘটনার সময়ে সে 'প্লাজা' থিয়েটারে অভিনয় দেখছিল। উক্তির স্বপক্ষে সে হাজির ক'রল সেদিনকার 'শো'-এর টিকিটের 'কাউণ্টার পার্ট।' তবে ঘটনার পর 'স্পিক ইজি' বারে পেগ গ্লাসে তার আঙ্গুলের ছাপ এল কি করে?—এর উত্তরে সে বলল, অত্যাধিক শীতের দরুণ সেদিন রাত একটার সময় এসেছিল 'স্পিক ইজি' বারে মদ খেয়ে শরীরটা একটু গরম করে নিতে। 'বার'

তখন খোলাই ছিল, কিন্তু ভেতরে কেউ ছিল না। তাগিদ থাকায় সে নিজেই খানিকটা মদ পেগ-গ্লাসে ঢেলে নিয়েছিল। তারপর অকস্মাৎ র‍্যালফ্ মিলারকে সে ওই অবস্থায় দেখতে পায়। একবার ভাবল পুলিশে খবর দেয়, কিন্তু নিজেই একজন দাগী আসামী। পুলিশ যদি তাকেই সন্দেহ করে চালান দেয়, এই ভয়ে সে বার থেকে নিঃশব্দে সরে পড়ে।

আইনের চোখে এ যুক্তি একেবারে অসাড় নয়। তবে কি সব ভেস্তে যাবে! প্রকৃত অপরাধীর সাজা হবে না!

অদৃশ্য আঙুলের ছাপের বৈজ্ঞানিক পরিস্ফুটন ও সুষ্ঠু বিশ্লেষণ আসামীকে চিনিয়ে দিয়েছে। এখন প্রয়োজন শুধু আনুষঙ্গিক সাক্ষ্য প্রমাণ সহযোগে তাকে আইনের চোখে স্বীকার করিয়ে দেওয়া।

এবার চেষ্টা চলল পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহের। ডিক্ মার্টিনের বাসা তল্লাস করা হলো। পাওয়া গেল ওভারকোট, মাফলার টুপি ও তার সঙ্গে একটা বড় চাবি। লুণ্ঠিত অর্থ কিংবা রিভলবারের, কোন হদিস পাওয়া গেল না।

পুলিশ বেশ কিছুটা দমে গেল। বামাল না পাওয়া গেলে মার্টিনকে আদালতে অভিযুক্ত করা সম্ভব হবে না। কিন্তু এতদূর এগিয়ে হাল ছাড়লে তো চলবে না। প্রতিটি রন্ধ্র খুঁজে দেখতে হবে অভিযুক্ত করার মত যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ জোটে কিনা।

সর্বপ্রথমে কাজ হলো মার্টিনকে সনাক্ত করান। ওভারকোটের সঙ্গে কপাল পর্যন্ত নামানো টুপি ও গলায় মাফলার জড়িয়ে মার্টিনকে হাজির করা হলো মিলারের সামনে। সঙ্গে রইল আরও দু'পাঁচ জন একই পোষাকের লোক ও একজন ম্যাজিস্ট্রেট। মিলার দ্বিধা না করে মার্টিনকে সনাক্ত করল।

সন্দেহ ঘনীভূত হলো।

এবার চলল গ্রীলিং বা অবিরত জেরা। মার্টিন কিন্তু অপরাধ স্বীকার করলে না। নির্দোষ ভাণ করে রইল। তার কাছে পাওয়া

চাবি সম্বন্ধে বলল, সেটা তার পৈতৃক সম্পত্তি। বাপের মৃত্যুর সময় তাঁর বাক্সে পেয়েছে। কিসের চাবি তা ঠিক বলতে পারবে না।

চাবির গায়ে একটা নম্বর খোদাই করা দেখে পুলিশের সন্দেহ হলো। তাঁরা আমেরিকার সমস্ত বড় বড় তালা-চাবি তৈরীর কারখানায় অনুসন্ধান করলেন। অবশেষে একটি কোম্পানী জানালো, এ ধরণের চাবি তাঁরা 'কান্‌সাস সিটি সেফ্ ডিপজিট ভল্ট'কে তৈরী করে দিয়েছেন।

এবার চলল 'সেফ্ ডিপজিট ভল্ট'-এর অনুসন্ধান—ম্যানেজার চাবি দেখে চিনতে পারলেন; চাবির উপরে খোদাই করা নম্বরটা তাঁদের বিভিন্ন বাক্সের সাঙ্কেতিক নম্বর বলে জানালেন। পরে রেজিষ্টার দেখে বাক্সের ক্রমিক নম্বরটাও বলে দিলেন।

পুলিশ বাক্স খুলল। দেখা গেল তার মধ্যে রয়েছে ন'হাজার ন'শো টাকার মতন কারেন্সী নোট ও একটা ১৮-র কোল্টের রিভলবার। কুঁদোয় লালচে একটা কিসের দাগ যেন!

আবার পুলিশ-ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা চলল। এবার কিন্তু আঙুলের ছাপের নয়, অকৃত্রিম রক্তের। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেল লালচে দাগগুলো সত্যসত্যই মানুষের রক্তের দাগ, এবং 'এ' বিভাগের রক্তের। মিলারের দেহের রক্ত পরীক্ষা করে জানা গেল তার রক্তও 'এ' বিভাগের। পুলিশ নিঃসন্দেহ হলো, কুঁদোর রক্ত মিলারেরই।

সবশেষে অনুসন্ধান হলো, ভল্টের ভেতরে পাওয়া কারেন্সী নোটগুলো সত্যসত্যই মিলারের কি না! তাও প্রমাণিত হয়ে গেল। কান্‌সাস সিটির একটা ব্যাঙ্ক সাক্ষ্য দিল ভল্টের মধ্যকার খানকতক নম্বরের সঙ্গে তাঁদের মিলারের সাত দিন আগে দেওয়া নোটের নম্বর হুবহু মিলে যাচ্ছে।

ডিক্ মার্টিন এবার নিরুত্তর। অবশেষে স্বীকার করল তার অপরাধ। বিচারে তার পনেরো বছর কারাদণ্ড হল।

একপাটি জুতো

একটা তদন্ত সেরে বাড়ী-মুখো হয়েছে জয়ন্ত ও মাণিক। সঙ্গে একজন সেপাই ও একজন দারোগা। রাস্তা দিয়ে তারা গল্প করতে করতে আসছে, হঠাৎ একখানা বাড়ীর দোতলা থেকে ডাক এল—ও জয়ন্ত, ও মাণিক।

তারা মুখ তুলে দেখে বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে আছে তাদের পুরাতন বন্ধু নবীনচন্দ্র। সে জমিদার। জয়ন্ত ও মানিককে নিয়ে মাঝে মাঝে নিজের জমিদারিতে শিকার করতে যান।

জয়ন্ত বললে, কি খবর নবীন?

নবীন বললে, তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে। ভিতরে এসে বৈঠকখানায় বসো। আমি যাচ্ছি।

বৈঠকখানায় ঢুকেই জয়ন্তের হুঁশিয়ার চোখ দেখলে দুটো ব্যাপার। দেওয়ালের বড় ঘড়িটা নামিয়ে রাখা হয়েছে মেঝের উপরে। এবং পূর্বদিকের জানালায় একটা গরাদ নেই, সেটাকেও কে খুলে মেঝের উপরে ফেলে রেখেছে। জানালার কাছে গিয়ে সে বুঝতে পারলে, জানালার তলাকার কাঠের ফ্রেমে বাটালি বা কোন অস্ত্র চালিয়ে কেউ স্থানচ্যুত করেছে গরাদটাকে।

সে ফিরে বললে, মানিক, এই ঘরে কেউ অনধিকার প্রবেশ করেছে। নবীন বোধহয় সেইজন্যেই আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে চায়।

ঠিক আন্দাজ করেছ জয়ন্ত। সেইজন্যেই আমি তোমাকে ডেকেছি বটে।—বলতে বলতে নবীন ঘরের ভিতর এসে দাঁড়াল।

আসন গ্রহণ করল সকলে। বেয়ারাকে চা, টোষ্ট, এগ্‌পোচ আনবার হুকুম দিয়ে নবীন বললে, কাল রাতে এই ঘরে চুরি হয়ে গিয়েছে। গুরুতর চুরি নয়, তোমার মত ধুরন্ধর গোয়েন্দার কাছে তুচ্ছ ব্যাপার বলেই মনে হবে। চুরি গিয়েছে আমার একটি রেডিও।

মাণিক বিস্মিত স্বরে বললে, তোমার ঘরে রেডিও!

নবীন হেসে বললে, হ্যাঁ মাণিক। তোমরা সকলেই জানো, রেডিও-র একটানা একঘেয়ে ঘ্যানঘ্যানানী আমার ধাতে সহ্য হয় না, তাই এতদিন এ বাড়ীতে রেডিওর ছিল না কোন ঠাঁই। কিন্তু বড় মেয়েটা রেডিওর জন্যে এমন বিষম আব্দার ধরেছে যে, কাল বৈকালে নগদ একশত পঞ্চাশ টাকা মূল্য দিয়ে একটা রেডিও না কিনে এনে আর পারা গেল না। যন্ত্রটা টেবিলের উপর রেখে ঘর থেকে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু চোর তাকে এখানে রাত্রিবাসও করতে দেয়নি।

জয়ন্ত বললে, চোর এসেছে ঐ গরাদটা খুলে?

—হ্যাঁ।

—পূর্বদিকের ঐ সরু গলিটা কি?

—মেথর আসবার পথ। চোর বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঐ গলিতে দাঁড়িয়ে ফ্রেম কেটে গরাদ খোলবার সুযোগ পেয়েছিল!

—ঘড়িটা মেঝেয় নামানো কেন?

ওটাও চোরের কীর্তি। তার ইচ্ছা ছিল ঘড়িটাও সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। কিন্তু ঘরের সন্দেহজনক শব্দ শুনে বেয়ারা এসে পড়ায় সে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। তাড়াতাড়ি পালাবার সময়ে সে নিজের একপাটি জুতোও নিয়ে যেতে পারেনি।

এইবার জয়ন্ত কিঞ্চিৎ আগ্রহ প্রকাশ করে বললে, জুতো? কোথায় সেই জুতো?

—ঐ যে, জানালার তলাতেই পড়ে রয়েছে।

জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে জুতোর পাটিটা তুলে নিলে, বেশ মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলে প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে। তারপর মুখ তুলে ধীরে ধীরে বললে—নবীন এ হচ্ছে এমন কোন লোকের জুতো যার ডান পদতল বিকৃত, জুতোর বেডৌল গড়ণ দেখেই তা ধরা যায়। বাটার কারখানায় তৈরী সস্তা দামের ছয় নম্বরের রবারের জুতো। এর ভিতরে সাদা সাদা কি রয়েছে দেখেছ।

—বোধহয় গুঁড়ো চূণ।

জয়ন্ত মুখে কিছু না বলে মাথা নেড়ে জানালে, না।

বেয়ার চা প্রভৃতি নিয়ে এল এমন সময়ে।

একটা টেবিলের কাছে গিয়ে জয়ন্ত বলল, রেডিওটা কাল রাতে এই টেবিলের উপর ছিল তো? বেশ, আমি এখানে বসেই চা পান করব।

জয়ন্ত নীরবে চা ও খাবার খেতে খেতে উত্তর দিকের জানালা-গুলো দিয়ে বারংবার রাস্তার দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল।

পানাহার শেষ করে জয়ন্ত বললে, নবীন, তোমার বাড়ীতে রেডিওর গণ্ডগোল কেউ কোনদিন শোনেনি; এ বাড়ীতে ঐ উপসর্গ আছে, বাইরের লোকেরা এমন সন্দেহ করতে পারে না। অথচ যেদিন তুমি রেডিও কিনেছ, ঠিক সেই দিনই তা চুরি হয়ে গেল। সুতরাং বেশ বোঝা যায় এ হচ্ছে পাড়ার কোন সন্ধানী চোরের কাণ্ড। যন্ত্রটা সে বৈকালেই রাস্তা থেকে দেখতে পেয়েছিল।

নবীন বললে, কিন্তু সে যে কে, বুঝতে পারব কেমন করে?

—এখান থেকে রাস্তার ওপারে দেখতে পাচ্ছি দু'খানা বাড়ী। ও বাড়ী দু'খানা কাদের?

—লাল বাড়ীখানায় থাকেন হাইকোর্টের এক উকিল। পাশের হলদে বাড়ীখানা ভাড়াটে-বাড়ী। একখানা কি দু'খানা ঘর নিয়ে এখানে

বাস করে ছয়-সাতটি পরিবার। আমাদের সরকারবাবুও থাকেন ঐ বাড়ীর দোতলায়।

—বটে, বটে! একবার তাঁকে এখানে আসতে বলবে?

অবিলম্বে সরকারবাবুর প্রবেশ। জয়ন্ত সুধোলে, আপনার নাম?

—শ্রীবিনয়কুমার প্রামানিক?

—সামনে ঐ বাড়ীতে কতদিন বাস করছেন?

—প্রায় তিন বৎসর।

—ওখানকার আর সব ভাড়াটেকে আপনি চেনেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রায় সকলকেই।

—দোতালায় আপনার সঙ্গে থাকেন কারা?

—পরিবার নিয়ে আর তিনটি ভদ্রলোক।

—তাঁদের পেশা?

—দুজন কেরাণী, একজন স্কুল-মাষ্টার।

—নীচেয় কারা থাকেন?

—সবাই পূর্ববঙ্গের লোক।

—তাঁরা কি কাজ করেন?

—বেশীর ভাগ লোকই কাটা কাপড়ের ব্যবসা করে। একজন কেবল শাঁখারীদের দোকানের কারিগর।

—নাম জানেন?

—হ্যাঁ, দুলাল।

—বিনয়বাবু, একটা কাজ করুন। দয়া করে দুলালকে একবার এখানে ডেকে আনুন। তাকে বলবেন, নবীনবাবুর স্ত্রী দু'ডজন খুব ভালো শাঁখা কিনতে চান, তিনিই তাকে ডেকেছেন।

—যে আজ্ঞে।

সরকারের প্রস্থান। নবীন সবিস্ময়ে বললে, তোমার এ কি অদ্ভুত খেয়াল জয়ন্ত! দু'ডজন কি, আমার স্ত্রী এক গাছাও শাঁখা কিনতে চান না।

—তোমার স্ত্রী আজ আলবৎ দু'ডজন শাঁখা কিনতে চান। তুমি জানো না।

—আমি জানি না, তুমি জানো?

—নিশ্চয়।

—জয়ন্ত, তুমি একটি পাগল।

—নবীন, তুমি একটি সুবৃহৎ হাঁদারাম!

—মানে?

—মানে এখনি বুঝতে পারবে।

—দেখা যাক্। কিন্তু দু'ডজন শাঁখার দাম দিতে হবে তোমাকেই।

ঘরের বাইরে পদশব্দ। সরকারবাবুর পিছনে একটি মূর্ত্তির আবির্ভাব। বয়স উনিশ-বিশের বেশী হবে না। সঙ্কুচিত ভাবভঙ্গি, সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। পরণে আধ-ময়লা গেঞ্জী ও লুঙ্গি। খালি পা।

জয়ন্ত সুধোলে, তোমার নাম দুলাল।

আগন্তুক ভয়ে ভয়ে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

জয়ন্ত লক্ষ্য করলে, দুলালের ডানপায়ের পাতা এমনভাবে বিকৃত যে সোজাভাবে মাটিতে পা ফেলে সে দাঁড়াতে পারে না। তার দুই পায়ের নীচের দিকে লেগে রয়েছে সাদা সাদা কিসের গুঁড়ো!

জয়ন্ত বললে, দুলাল, আমার কাছে এস।

দুলাল প্রায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এল।

ফস্ করে সেই রবারের জুতোর পাটি বার করে জয়ন্ত শান্ত স্বরে বললে, দুলাল, কাল রাতে তোমার একপাটি জুতা এই ঘরে ফেলে রেখে গিয়েছিলে। ফিরিয়ে নাও তোমার জুতো।

প্রথমটা চমকে উঠে, তারপর সবেগে মাথা নেড়ে দুলাল বলে উঠল, ও জুতো আমার নয়।

—জুতো তোমারই। পায়ে পরে দেখ—তোমার দুমড়ানো পায়ের সঙ্গে ঠিক খাপ খেয়ে যাবে।

দুলাল চুপ করে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখ ধরা-পড়া

চোরের মত।

জয়ন্ত বললে, নবীন, এই একপাটি জুতোর মধ্যেই আছে চোরের স্বাক্ষর। জুতোর ভিতরে যে সাদা গুঁড়োগুলোকে তুমি চূণের গুঁড়ো বলে ভ্রম করেছিলে, আসলে তা হচ্ছে শাঁখের গুঁড়ো ; আমি দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। শাঁখারীরা ঠিক দুই পায়ের উপর শাঁখ রেখে যখন করাত চালায়, তখন তাদের দুই পায়ের উপরেই ছড়িয়ে পড়ে শঙ্খচূর্ণ। দুলালের পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখ—শাঁখের পাউডার মেখে ওর পদযুগল এখনও শ্বেতবর্ণ হয়ে রয়েছে। ওর দুই পদ জুতোর মধ্যে প্রবেশ করলে তার ভিতরেও লেগে থাকে শাঁখের গুঁড়ো। বেডৌল জুতোর পাটি পরীক্ষা করে খুব সহজেই ধরে ফেলেছিলাম যে এর মালিক হচ্ছে এমন কোন শাঁখারী, যার দক্ষিণ পদতল বিকৃত। তবু যদি দুলাল এখনো অপরাধ স্বীকার না করে, তুমি এই দারোগা-বাবুটির সাহায্য নিতে পার। এস মানিক, আমাদের এখন বিদায় নেবার সময় হয়েছে।

আমার গোয়েন্দাগিরি

রবিবারে রবিবারে প্রশান্তবাবুর বৈঠকখানায় ব'সত একটি তাস-দাবা-পাশার আসর। দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর সভ্যরা একে একে সেখানে গিয়ে দেখা দিতেন। তারপর খেলা চলত প্রায় বেলা পাঁচটা পর্যন্ত।

মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে বসতাম আমিও। তাস বা পাশার দিকে মোটেই ঘেঁষতাম না, কিন্তু দাবার দিকে আমার ঝোঁক ছিল যথেষ্ট। ওখানে জন তিনেক পাকা দাবা খেলোয়াড় আসতেন, তাঁদের সঙ্গে আমি করতাম শক্তি পরীক্ষা।

বলা বাহুল্য, খেলার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে নানা-প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ আলোচনাও চলত। বাজারে মাছের দর ও বক্তৃতামঞ্চে চড়ে জহরলাল নেহেরুর লম্ফ-ঝম্ফ, গড়ের মাঠের ফুটবল খেলা ও বিলিতি পার্লামেণ্টে মন্ত্রিদের বাক্যবন্দুকনিনাদ, বাংলা রঙ্গালয়ে অভিনেতাদের অভিনয় ও ধর্মালোচনা অর্থাৎ জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত কোন কিছুই থাকত না আমাদের উত্তপ্ত আলোচনার বাইরে।

সেদিন তখনও খেলা সুরু হয়নি, এমন সময় পুলিস-কোর্টের একটা মামলার কথা উঠল। সম্প্রতি একসঙ্গে তিনটে নরহত্যা হয়েছিল এবং ইনস্পেক্টর সুন্দরবাবু কেসটা হাতে নিয়ে হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করে আসামীকে আদালতে হাজির করেছেন।

একজন সুধোলেন, মানিকবাবু, এ মামলাতেও আপনাদের হাত আছে তো? লোকে তো বলে, সুন্দরবাবুর সব মামলার পিছনে থাকেন আপনি আর আপনার বন্ধু জয়ন্তবাবু।

—লোকের এ বিশ্বাস ভ্রান্ত। অবশ্য কোন কোন মামলায় সুন্দরবাবু আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে আসেন বটে। পরে সে সব

ক্ষেত্রে জয়ন্তই হয় আসল পরামর্শদাতা, আমি তার সঙ্গে হাজির থাকি মাত্র।

হঠাৎ পিছন থেকে প্রশ্ন শুনলাম, জয়ন্তবাবুর সঙ্গে এতদিন থেকে গোয়েন্দাগিরিতে আপনার কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি জন্মেছে তো?

ফিরে দেখি নরেন্দ্রবাবু—সুবিখ্যাত ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ সেন। বিলেত ফেরত। যেমন তাঁর হাত-যশ, তেমনি তার পসার। তাঁর আয়ের পরিমাণ শুনলে মাথা ঘুরে যায়। পাশের বাড়ীতে থাকেন। মাঝে মাঝে হাঁফ ছাড়বার জন্যে এই আসরে উঁকি-ঝুঁকি মারতে আসেন।

নরেনবাবু আবার সুধোলেন, জয়ন্তবাবুর পার্শ্বচর হয়ে গোয়েন্দা-গিরিতে আপনারও কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি জন্মেছে তো?

আমি হেসে বললাম, হ্যাঁ নরেনবাবু, জয়ন্তের সঙ্গে আমার তুলনা চলে না বটে, কিন্তু গোয়েন্দাগিরিতে সাধারণ লোকের চেয়ে আমি কিছু বেশী জ্ঞান অর্জ্জন করেছি বৈকি।

নরেন্দ্রবাবু একখানা কাষ্ঠাসনের উপরে নিজের অঙ্গভার ন্যস্ত করে বললেন, তাহলে ছোট্ট একটি মামলার কথা শুনবেন?

আমি বললাম, আমার বন্ধু জয়ন্তের মতে গোয়েন্দাগিরিতে ছোট বা বড় মামলা বলে কোন কথা নেই। একমাত্র দ্রষ্টব্য হচ্ছে, মামলাটা চিত্তাকর্ষক কিনা? এই দেখুন না, পুলিশকোর্টের যে মামলাটা নিয়ে আজ গোয়েন্দাগিরির কথা উঠেছে, একদিক দিয়ে সেটা বড় যে-সে মামলা নয়। একসঙ্গে তিন-তিনটে খুন! কিন্তু অপরাধী ঘটনাক্ষেত্রে এত সূত্র রেখে গিয়েছিল যে ধরা পড়েছে অতি সহজে। আসলে একেই বলে ছোট মামলা। কারণ এটা চিত্তাকর্ষক নয়, এর মধ্যে মস্তিষ্কের খেলা নেই। আবার এমন সব মামলাও আছে যেখানে অপরাধ হয়তো তুচ্ছ অথচ অপরাধীকে গ্রেপ্তার করবার মত সূত্র পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। এমন সব মামলাতে সফল হলেই গোয়েন্দার প্রকৃত কৃতিত্ব প্রকাশ পায়।

নরেনবাবু বললেন, আমি যদি ঐ রকম কোন মামলারই ভার আপনার হাতে দিতে চাই, আপনি গ্রহণ করতে রাজি আছেন কি ?

—বললুম, আমার আপত্তি নেই। মনে মনে ভাবলুম, একবার পরীক্ষা করে দেখাই যাক না, জয়ন্তের কোন সাহায্য না নিয়েই নিজের বুদ্ধির জোরে মামলাটার কিনারা করতে পারি কিনা।

ঘরের অন্যান্য লোকেরা প্রশ্ন করতে লাগলেন, কিসের মামলা ডাক্তারবাবু? খুনের না চুরির, না আর কিছুর ?

নরেনবাবু বললেন, এখন আমি কোন কথাই ভাঙব না, আসুন মানিকবাবু আমার সঙ্গে, আমার বাড়ীতে চলুন।

॥ দুই ॥

নরেনবাবুর বাড়ী। একখানি মাঝারি আকারের ঘর। একদিকে দেওয়াল ঘেঁসে একখানা গদী-মোড়া বড় চেয়ার, তার সামনে একটি টেবিল। টেবিলের উপরে দোয়াতদানে লাল ও কালো কালির দোয়াত, কলমদানে দুটি কলম, ব্লটিংয়ের 'প্যাড'—তার উপরে খানিকটা অংশ লাল কালি মাখা, একটি টেলিফোন যন্ত্র। টেবিলের তিন পাশে খানকয়েক কাঠের চেয়ার। ঘরের দেওয়ালে একখানা 'অ্যালম্যানাক' ছাড়া আর কোন ছবি নেই। মেঝে মার্বেল পাথরের। কোন রকম বাহুল্য বর্জিত পরিচ্ছন্ন ঘর।

এইসব লক্ষ্য করছি, নরেনবাবু বললেন, এই ঘরে বসে প্রত্যহ সকাল আর সন্ধ্যায় আমি রোগীদের সঙ্গে দেখা করি। পরশু সন্ধ্যায় এখানেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেছে।

—কি রকম ঘটনা ?

—মোহনতোষবাবুর এক বন্ধুর নাম বিনোদবাবু। বিনোদলাল চ্যাটার্জী। ভদ্রলোক কন্যাদায়ে পড়েছিলেন। মোহনতোষবাবুর বিশেষ অনুরোধে তাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা ধার দিয়েছিলুম।

—মোহনতোষবাবু কে ?

—তিনি আমার প্রতিবেশীও বটে, রোগীও বটে। কিন্তু তাঁর একটা বড় পরিচয়ও আছে। আপনি কি সৌখিন নাট্য সম্প্রদায়ের বিখ্যাত অভিনেতা মোহনতোষ চৌধুরির নাম শোনেন নি ?

—কারুর কারুর মুখে শুনেছি বটে।

—তার কথাই বলছি।

—তারপর ?

—পরশু সন্ধ্যার সময় আমি এই ঘরে বসে আছি, এমন সময়ে বিনোদবাবু এসে তার ঋণ পরিশোধ করে গেলেন। পাঁচখানি হাজার টাকার নোট। ঠিক তারই মিনিট পাঁচেক পরে ফোনে একটা অত্যন্ত জরুরি ডাক এল। বসন্তপুরের মহারাজাবাহাদুর 'ব্লাডপ্রেসারে'র দরুন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন, আমাকে সেই মুহূর্তেই যেতে হবে। তখনি যাত্রা করলুম। তাড়াতাড়ি যাবার সময়ে নোট পাঁচখানা ব্লটিংয়ের 'প্যাডে'র তলায় ঢুকিয়ে রেখে গেলাম। রাজবাড়ী থেকে যখন ফিরে এলুম রাত তখন সাড়ে নয়টা। এসে এই ঘরে ঢুকে দেখি, 'প্যাডে'র উপর লাল কালির দোয়াতটা উলটে পড়ে রয়েছে আর 'প্যাডে'র তলা থেকে অদৃশ্য হয়েছে হাজার টাকার নোট পাঁচখানা!

আমি বললুম, নিশ্চয় চোর 'প্যাডে'র তলা থেকে যখন নোটগুলি টেনে নিচ্ছিল, সেই সময়ে দৈবগতিকে তার হাত লেগে লাল কালির দোয়াতটা উলটে পড়ে গিয়েছিল।

—খুব সম্ভব তাই।

—কারুর উপরে আপনার সন্দেহ হয় ?

—বিশেষ কারুর উপরে নয়।

—পুলিশকে খবর দিয়েছেন ?

—না।

—কেন ?

—কেলেঙ্কারির ভয়ে। আমি বেশ জানি পুলিশ এসে আমার বাড়ীর লোকদের টানাটানি করবে। আমার পক্ষে সেটা অসহনীয়। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাড়ীর কোন লোকের দ্বারা ঐ কাজ হয়নি —হ'তে পারে না। অন্দরমহলে থাকেন আমার বৃদ্ধা মাতা, পত্নী, আমার দুই বালিকা-কন্যা আর শিশুপুত্র। তাদের কারুরই এ ঘরে আসবার কথা নয়। বাড়ীর প্রত্যেক দাসদাসী পুরাতন আর বিশ্বস্ত। নোটগুলো যখন 'প্যাডে'র তলায় রাখি, তখন তাদের কেউ যে এ অঞ্চলে ছিল না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। সুতরাং তাদের কেউ 'প্যাড' তুলে দেখতে যাবে কেন?

—বাইরের কোন জায়গা থেকে কেউ কি আপনার কার্য্যকলাপের উপরে দৃষ্টি রাখতে পারে না?

—মানিকবাবু, পরশুদিন সন্ধ্যার আগেই এই দুর্দান্ত শীতেও হঠাৎ বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, মনে আছে কি? দেখুন এই ঘরের উত্তর দিকে আছে চারটে জানালা, আর পূর্ব দিকে আছে দুটো জানালা আর দরজা। দক্ষিণ আর পশ্চিম দিক একবারে বন্ধ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে উত্তরের জানালাগুলোর ভিতর দিয়ে এই ঘরটা দেখা যায় বটে, কিন্তু বৃষ্টির ছাঁট আসছিল বলে উত্তর দিকের সব জানালাই বন্ধ ছিল। খোলা ছিল খালি পূর্ব দিকের জানালা দরজা। ওদিকে আছে আমার বাড়ীর উঠান, তারপর বারো ফুট উঁচু পাঁচিল, তারপর মোহনতোষবাবুর বাড়ী। আমার বাড়ীর উঠানে আলো জ্বলছিল, আমি সেখানে জনপ্রাণীকেও দেখতে পাইনি। বৃষ্টি আর শীতের জন্যে মোহনতোষবাবুর বাড়ীর জানালাগুলো নিশ্চয়ই বন্ধ ছিল, নইলে ও-বাড়ীর ঘরের আলোগুলো আমার চোখে পড়ত। সেদিন আমি কি করছি না করছি, কেউ তা দেখতে পায়নি।

—আপনি রাজবাড়ীতে যাওয়ার পর সেদিন অন্য কোন রোগীর বাড়ী থেকে আর কেউ কি আপনাকে ডাকতে আসেনি?

—এসেছিল বৈকি। হরিচরণের মুখে শুনেছি, পাঁচজন এসেছিল।

—হরিচরণ কে ?

—সে বালক বয়স থেকেই এ বাড়ীতে কাজ করে, এমন বিশ্বাসী আর সৎ লোক আমি জীবনে আর দেখিনি। আমার সমস্ত আলমারী দেরাজ, বাক্সের চাবি থাকে তার হাতে আমার সমস্ত টাকা সেই-ই ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে আসে, তাকে নইলে আমার চলে না। আমার অবর্তমানে সে-ই বাইরের লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়।

—হরিচরণ কি বলে ?

—সেদিন পাঁচজন লোক আমাকে ডাকতে এসেছিল। তাদের মধ্যে তিনজন লোক আমি নেই শুনেই চলে যায়, একজন লোক ঠিকানা রেখে আমাকে 'কল' দিয়ে যায়, কেবল একজন লোক বলে, আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। হরিচরণ তখন তাকে এই ঘরে এনে বসিয়ে নিজের অন্য কাজে চলে যায়। কিন্তু মিনিট দশেক পরে ফিরে এসে লোকটিকে সে আর দেখতে পায়নি। তবে এজন্যে তার মনে কোন সন্দেহ হয়নি। কারণ এখানে কোন মূল্যবান জিনিস থাকে না, আর বাইরের লোকের আনাগোনার জন্য এ ঘরটা সর্বদাই পড়ে থাকে। হরিচরণের বিশ্বাস, আমার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে লোকটি আর অপেক্ষা না করে চলে গিয়েছিল।

—সে নাম-ধাম কিছু রেখে যায়নি ?

—না।

—তার চেহারার বর্ণনা পেয়েছেন ?

—পেয়েছি। তার দোহারা চেহারা, শ্যাম-বর্ণ, দেহ দীর্ঘ। শীতের জন্যে সে মাথা থেকে প্রায় সমস্ত দেহটাই আলোয়ান জড়িয়ে রেখেছিল, দেখা যাচ্ছিল কেবল তার মুখখানা। তার চোখে ছিল কালো চশমা, মুখে ছিল কাঁচা-পাকা গোঁফ আর 'ফ্রেঞ্চ কাট' দাড়ী। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশের কম হবে না।

—লোকটির চেহারার বর্ণনা কিছু অসাধারণ। আপনার কি তারই উপরে সন্দেহ হয় ?

—মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয় যে, কোন একজন বাইরের লোক আমার ঘরে এসে হঠাৎ টেবিলের 'প্যাড' তুলে দেখতে যাবে কেন? এ-রকম কৌতূহল অস্বাভাবিক নয় কি?

আমি নিরুত্তর হয়ে চিন্তা করতে লাগলুম। জয়ন্ত বলে, কোনো নতুন মামলা হাতে পেলে গোয়েন্দার প্রধান আর প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে, সকলকেই সন্দেহ করা। কিন্তু খানিকক্ষণ ভাবনা চিন্তার পর আমার সন্দেহ ঘনিভূত হয়ে উঠল, দুজন লোকের উপরে। কে ঐ আলোয়ান মুড়ি দেওয়া, কালো চশমা পরা ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা রহস্যময় আগন্তুক? নরেনবাবুর প্রস্থানের পরেই ঘটনাক্ষেত্রে তার আবির্ভাব এবং কেমন করেই বা জানতে পারলে, 'প্যাডের' তলায় আছে পাঁচ-হাজার টাকার নোট? তার মূর্তি, তার প্রবেশ ও প্রস্থান, তার কার্য্য-কলাপ সমস্তই এমন অদ্ভুত যে যুক্তি প্রয়োগ করেও কিছু করবার বা বোঝবার উপায় নেই।

শেষটা আমি সাব্যস্ত করলুম, এতটা যুক্তিহীনতা কিছুতেই সম্ভব-পর নয়। ঐ মূর্তির কোন অস্তিত্ব নেই, ও হচ্ছে কাল্পনিক মূর্তি, ঘটনা-ক্ষেত্রে তাকে টেনে আনা হয়েছে, অন্য কোন ব্যক্তির স্বার্থের অনুরোধে।

সেই অন্য ব্যক্তি কে? নিশ্চয়ই হরিচরণ। তার সাধুতা আর বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে নরেনবাবুর কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার 'সার্টিফিকেট' মূল্যহীন। সাধুতার আবরণে সর্বদাই নিজেদের ঢেকে রাখে বলেই অসাধুতা আমাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করতে পারে। আবার মানুষের মন এমন আশ্চর্য্য বস্তু যে, সত্যিকার সাধুও সময়ে সময়ে হঠাৎ অসাধু হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, হরিচরণ, ঐ হরিচরণ। কালো চশমা পরা মূর্তিটার সৃষ্টি হয়েছে তারই উর্বর মস্তিষ্কের মধ্যে। নিজে নিরাপদ হবে বলে হরিচরণই ঐ রহস্যময় কাল্পনিক মূর্তিটাকে টেনে এনেছে ঘটনাক্ষেত্রে।

অতএব হরিচরণকে ডেকে এনে খানিক নাড়াচাড়া করলেই পাওয়া যাবে মামলার মূলসূত্র।

॥ তিন ॥

ঠিক এই সময়েই ঘরের বাইরে থেকে ডাক শুনলাম—মানিক, অ—মানিক! তুমি এখানে আছ নাকি?

এ জয়ন্তের কণ্ঠস্বর। তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দেখি, উঠানের রোয়াকের উপরে হাস্যমুখেই দাঁড়িয়ে আছে জয়ন্ত।

—ব্যাপার কি? তুমি কোত্থেকে?

—তোমাদের রবিবাসরীয় আড্ডায় গিয়েছিলাম তোমাকে অন্বেষণ করতে। কিন্তু সেখানে গিয়ে খবর পেলাম, তোমাদের আজকের আসর এইখানে।

নরেনবাবুর সঙ্গে জয়ন্তের পরিচয় করিয়ে দিলাম। তিনি তাঁকে সাদরে ঘরের ভিতরে নিয়ে এলেন।

জয়ন্ত সুধোলে, ডাক্তারবাবু আপনি হঠাৎ আমার মানিক অপহরণ করেছেন কেন?

—আজ্ঞে, মানিকবাবুর হাতে আমি একটি মামলার ভার অর্পণ করেছি।

—বটে, বটে, বটে! মানিকও তাহলে আজকাল স্বাধীনভাবে গোয়েন্দার ভূমিকা গ্রহণ করতে চায়। বেশ, বেশ, উন্নতিই হচ্ছে! প্রকৃতির নিয়ম।

আমি একটু লজ্জিতভাবে বললাম, না ভাই জয়ন্ত, আমি তোমার উপযুক্ত শিষ্য হতে পেরেছি কি না, সেইটেই আমি আজ পরীক্ষা করতে এসেছি।

—দেখেছেন ডাক্তারবাবু, বন্ধুবর মানিকের বিনয়েরও অভাব নেই। এ হচ্ছে আসল গুণীর লক্ষণ। তারপর মানিক, মামলাটার মধ্যে তুমি প্রবেশ করতে পেরেছ তো?

—মনে হচ্ছে পেরেছি। মামলাটার কথা তুমি শুনতে চাও?

—আপত্তি নেই।

তারপর দুই চক্ষু মুদে জয়ন্ত আমার মুখে মামলার আদ্যপান্ত শ্রবণ করল। সেই কালো চশমাধারী মূর্তি ও হরিচরণ সম্বন্ধে আমার মতামতও তাকে চুপিচুপি জানিয়ে রাখতে ভুললুম না।

জয়ন্ত চোখ খুলে উঠে দাঁড়াল, তারপর টেবিলের সামনে গিয়ে ডাক্তারবাবুর নিজস্ব চেয়ারের উপর বসে পড়ল। তারপর পূর্বদিকের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল নিষ্পলক নেত্রে। তারপর মুখ নামিয়ে টেবিলের 'প্যাডে'র দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। তারপর মৃদু হেসে চুপ করে বসে রইল প্রায় সাত-আট মিনিট ধরে। তার মুখ সম্পূর্ণ ভাবহীন ; কিন্তু আমি বুঝতে পারলুম, তার মন এখন অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করলে, ডাক্তারবাবু, ঘটনার দিন যখন আপনি বাইরে যান তখন এই টেবিলের 'প্যাডে'র উপর আর কোন কাগজপত্র ছিল?

—না।

—তাহলে যা ভেবেছি তাই। মানিক, তোমার বিশ্বাস চোর যখন 'প্যাডে'র তলা থেকে নোটগুলো টেনে নিচ্ছিল, সেই সময়েই লাল কালির দোয়াতটা দৈবগতিকে উল্‌টে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—তোমার বিশ্বাস ভুল।

—কি করে জানলে?

—উল্‌টে দেখ 'প্যাডের উপর ছড়ানো লাল কালির মাঝখানে রয়েছে একটা চতুষ্কোণ (কিন্তু সমচতুষ্কোণ নয়) সাদা জায়গা। এ জায়গাটার কালি লাগেনি কেন?

—ওখানে বোধহয় কোন কাগজপত্র ছিল। কালির ধারা তার উপর দিয়েই বয়ে গিয়েছে।



—এ জায়গাটায় কালি লাগেনি কেন ? পৃঃ-৩৮

—এতক্ষণে তোমার বুদ্ধি কিঞ্চিত খুলেছে দেখে খুশি হলুম।

নরেনবাবু বলে উঠলেন, না মশাই, সেদিন ঐ 'প্যাডে'র উপরে নিশ্চয়ই কোন কাগজপত্র ছিল না।

জয়ন্ত সায় দিয়ে বললো, আপনিও ঠিক কথা বলেছেন ডাক্তার বাবু। তবু এই সাদা অংশটার সৃষ্টি হ'ল, কেন শুনুন। চোর টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে প্রথমে 'প্যাডে'র তলা থেকে নোটগুলো বার করে নেয়। তারপর সেগুলো 'প্যাডে'র উপর রেখে গুনে দেখে। ঠিক সেই সময়েই তার গায়ের আলোয়ান বা অন্য কিছু লেগে লাল কালির দোয়াতটা উল্‌টে যায়।

আমি চমৎকৃত হয়ে বললুম, তা হলে লাল কালি পড়েছিল সেই নোটগুলোর উপর?

জয়ন্ত আমার কথার জবাব না দিয়ে বললে, ডাক্তারবাবু, নোট-গুলোর নম্বর নিশ্চয়ই আপনার কাছে নেই?

—না মশাই, নম্বর টুকে নেবার সময় পাইনি। তবে বিনোদবাবুর কাছে খবর নিলে নম্বরগুলো পাওয়া যেতে পারে।

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আজকে এখনি খবর দিন। নম্বরগুলো পেলেই আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন। এখন আমি বিদায় নিলুম, হয় কাল সন্ধ্যার সময়ে নয় দুই একদিন পরেই আপনার সঙ্গে আবার দেখা করব—এটা চিত্তাকর্ষক হলেও সহজ মামলা। চল মাণিক। নমস্কার ডাক্তারবাবু।

রাস্তায় এসে জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করলুম, কে চোর সে বিষয়ে তুমি কিছু আন্দাজ করতে পেরেছ?

জয়ন্ত ক্রুদ্ধস্বরে বললে, আমি এইটুকু আন্দাজ করতে পেরেছি যে তুমি হচ্ছ একটি গাড়ল, গর্দ্দভ ইগ্নোরেমাস।

আমি একেবারে দ'মে গেলুম।

॥ চার ॥

সোমবারের সন্ধ্যা। জয়ন্তের পিছনে গুটি গুটি যাত্রা করলুম নরেনবাবুর বাড়ীর দিকে। দেখেছি কাল বৈকাল থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত এবং আজ সকাল থেকে বৈকাল পর্য্যন্ত সে বাড়ীর বাইরেই কাটিয়ে দিয়েছে। তার কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটুও ছোটখাটো ইঙ্গিত পর্য্যন্ত আমাকে দেয়নি। আজও তার মুখ এমন গম্ভীর যে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতেও ভরসা হল না।

নরেনবাবু বসেছিলেন আমাদের অপেক্ষায়। সাগ্রহে সুধোলেন কিছু খবরাখবর পেলেন নাকি ?

পকেট থেকে খাম বের করে জয়ন্ত বললে, এই নিন।

খামের ভিতর থেকে বেরুল পাঁচখানা নোট—প্রত্যেকখানা হাজার টাকার।

জয়ন্ত বললে, দেখছেন ডাক্তারবাবু, সব নোটের উপরেই কিছু না কিছু লাল কালির দাগ আছে। একখানা নোটের একদিকে প্রায় সবটাই লাল কালিমাখা,—এখানা ছিল সব উপরে।

বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে নরেনবাবু প্রায় আধ মিনিট নীরবে বসে রইলেন। তারপর বললেন, নোটগুলোর উপরে লাল কালির দাগ এতটা ফিকে কেন ?

—চোর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলবার চেষ্টা করেছিল।

—কিন্তু চোর কে ?

জয়ন্ত বললে, ক্ষমা করবেন, চোরের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি তার নাম প্রকাশ করব না। কেবল এইটুকু জেনে রাখুন, সে আপনার বাড়ীর লোক নয়। ভবিষ্যতে সৎ পথে থাকবার জন্যে আমি তাকে সুযোগ দিতে চাই, কারণ এটা হচ্ছে তার প্রথম অপরাধ। আজ আমরা আসি, নমস্কার।

।। পাঁচ ।।

বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলুম, ভাই জয়ন্ত, আমার কাছেও কি তুমি চোরের নাম প্রকাশ করবে না?

জয়ন্ত হেসে বললে, নিশ্চয়ই করব। চোরের নাম মোহনতোষ-চৌধুরী।

সবিস্ময়ে বললুম, তাকে তুমি কেমন করে সন্দেহ করলে?

—কেবল পূর্ব দিকের দরজা-জানালা দিয়েই সেদিন নরেনবাবুর ঘরের ভিতরটা দেখবার সুযোগ ছিল। আর নরেনবাবুর চেয়ারে বসে পূর্বদিকে তাকিয়ে আমি দেখতে পেলুম কেবল মোহনতোষের বাড়ীর দোতলার ঘর। এই হল আমার প্রথম সন্দেহ। তারপর সেই কালো চশমাপরা 'ফ্রেঞ্চ কাট' দাড়িওয়ালা লোকটার কথা ভাবতে লাগলুম। সে শীতের ওজরে আবার মাথা থেকে প্রায় সর্বাঙ্গে আলোয়ান মুড়ি দিয়ে এসেছিল। কালো চশমা, সর্বাঙ্গে আবরণ—এসব যেন আত্মগোপনের চেষ্টা 'ফ্রেঞ্চ কাট' দাড়িও সন্দেহজনক। লোকটা হয়তো ছদ্মবেশের সাহায্য নিয়েছিল। পাছে হরিচরণ তাকে চিনে ফেলে, সে নিশ্চয়ই পরিচিত ব্যক্তি। তার আকস্মিক প্রস্থানও কম সন্দেহজনক নয়। আগেই শুনেছি, মোহনতোষ একজন অভিনেতা, তার ছদ্মবেশ ধারণের উপকরণ আছে। এই হল আমার দ্বিতীয় সন্দেহ। তার বন্ধু বিনোদ যে ঘটনার দিনই সন্ধ্যাবেলায় নরেনবাবুর টাকা শোধ দিতে যাবে, এটাও নিশ্চয়ই সে জানতে পেরেছিল। আমার তৃতীয় সন্দেহ। তারপর আমি এখানে ওখানে ঘুরে যে সব তথ্য সংগ্রহ করলুম তা হচ্ছে এই: মোহনতোষ বিবাহ করেনি, বাড়ীতে একাই থাকে। বাড়ীর একতলা সে ভাড়া দিয়েছে। তার মাসিক আয় প্রায় সাড়ে তিনশো টাকা। ঐ আয়ে তার মত একা লোকের

দিন অনায়াসে চলে যেতে পারে, কিন্তু তার চলত না। কারণ সে ছিল বিষম জুয়াড়ী। বাজারে তার কয়েক হাজার টাকা ঋণ হয়েছিল। সে বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকেও টাকা ধার করতে ছাড়েনি। এই ঋণ কতক শোধ করতে না পারলে শীঘ্রই তাকে আদালতে আসামী হয়ে দাঁড়াতে হ'ত।

মানিক, সব কথা আর সবিস্তারে বলবার দরকার নেই। ইন্‌স্পেক্টর সুন্দরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আজ আমি মোহনতোষের সঙ্গে দেখা করেছিলুম। এই তার প্রথম অপরাধ। আমাকে দেখেই ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল। তারপর আমি কিভাবে কার্য্যসিদ্ধি করেছি তার একটা প্রায় সঠিক বর্ণনা দিলুম আর জানালুম যে নোটের নম্বর আমরা পেয়েছি, এখন এই কালিমাখা নোটগুলো ভাঙাতে গেলেই বিপদ অনিবার্য, তখন সে একেবারেই ভেঙে পড়ল।

তার নিজের মুখেই শুনলুম, কোনরকম চুরি করবার ইচ্ছাই তার ছিল না, কখনো চুরিচামারী করেও নি। ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময়ে তার অত্যন্ত মাথা ধরেছিল, ঘরে আলো নিভিয়ে সে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছিল। সেখান থেকেই সে দেখতে পায় তার বন্ধু বিনোদ এসে নোটগুলো দিয়ে গেল নরেনবাবুকে আর তিনিও হঠাৎ ফোনে ডাক পেয়ে সেগুলো 'প্যাডে'র তলায় গুঁজে রেখে তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় গজিয়ে উঠল সস্তায় কিস্তিমাৎ করবার দুর্বুদ্ধি। কিন্তু মানিক, এটাই তার প্রথম অপরাধ বলে আমরা ক্ষমা করেছি।

—আর সেই সঙ্গে তুমি ব্যর্থ করে দিলে আমার প্রথম গোয়েন্দাগিরি। দুঃখিতভাবে আমি বললুম।

গোয়েন্দা-পুলিসের পদস্থ কর্মচারী সুন্দরবাবু হয়েছেন অত্যন্ত অপ্রসন্ন। স্নেহাস্পদ সুহৃদের এতটা অধঃপতন তিনি সহ্য করতে প্রস্তুত নন আদৌ। জয়ন্তকে তিনি যে সহোদরের মতই ভালবাসেন, সে বিষয়ে সন্দেহ ন্যস্তি। অপরাধ-বিদ্যা-বিশারদ বলে বাজারে তার খ্যাতি-প্রতিপত্তির সীমা নেই। অথচ সে নাকি তার এই দুর্লভ খ্যাতির মূলে কুঠারাঘাত করতে উদ্যত হয়েছে—অন্ততঃ সুন্দরবাবু মত হচ্ছে তাই।

জয়ন্তর অপরাধ, অপরাধ-বিদ্যা ছেড়ে সে পড়েছে সম্মোহন-বিদ্যার মোহে। সব কাজ ভুলে সে 'হিপ্‌নটিজম' বা সম্মোহন-বিদ্যাকে আয়ত্তে আনতে নিযুক্ত হয়েছে এবং এখন সর্বদাই তার মুখে শোনা যায় ঐ একই আলোচনা। এমন কি কোন চিত্তাকর্ষক হত্যা বা ডাকাতি বা চুরির মামলার কথা তুললেও সে একটুও আকৃষ্ট হ'তে চায় না।

ফলে সুন্দরবাবু দস্তুরমত অসুবিধায় পড়েছেন। জটিল মামলা হাতে পেলে জয়ন্তের সঙ্গে পরামর্শ না করলে তাঁর পেটের ভাত হজম হ'ত না। কিন্তু আজকাল এ সম্পর্কীয় কোন প্রশ্ন করলে সে নিরুত্তর হয়ে থাকে এবং বেশী পীড়াপীড়ি করলে উঠে যায় বিরক্ত মুখে।

তার বন্ধু মানিককে ডেকে সুন্দরবাবু আহত স্বরে বললেন, 'দেখলে ভায়া, জয়ন্তের আচরণটা দেখলে। মুখের উপরে অপমান। হুম্!'

মানিক বললে, 'আরে মশাই, আপনি কি জয়ন্তকে চেনেন না। সে যখন যা নিয়ে মাতে, একেবারে তার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে তল খুঁজতে চায়। সে এখন 'হিপ্‌নটিজম্'সম্বন্ধে রাশি রাশি বই আনিয়ে পড়ছে, এ-বিষয়ে যাঁরা পণ্ডিত তাদের কাছে গিয়ে ধর্না দিচ্ছে, নিজেও যখন-তখন হাতে-নাতে পরীক্ষা চালাচ্ছে, সুতরাং এই সময়ে অন্য যা তা কথা নিয়ে অন্যমনস্ক হ'তে চাইবে কেন?'

সুন্দরবাবু তপ্তকণ্ঠে বললে, 'যা তা কথা মানে? অপরাধ-বিদ্যার চেয়ে সম্মোহন বিদ্যার মর্যাদা বেশী নাকি? কী যে বল মানিক, 'ছিঃ'!

মানিক বললে, 'আপাতত জয়ন্ত তাই মনে করে বটে। হয়তো জয়ন্ত সম্মোহন-বিদ্যাকে নিজের কোন কাজে লাগাতে চায়।'

—'নিজের কাজে লাগাতে চায়! হুম্, জয়ন্তের কাজ তো অপরাধ নিয়েই, বাজারে শখের গোয়েন্দা ব'লেই তার যা কিছু খাতির। সম্মোহন-বিদ্যা তার কোন্ কাজে লাগবে শুনি?'

—'আমি জানি না, জয়ন্ত জানে। তাকেই জিজ্ঞাসা করুন না!'

—'তাকে জিজ্ঞাসা করব? জবাব না পেয়ে আবার অপদস্থ হব? ধ্যেৎ, আমার বয়ে গেছে, আমি এই চললুম,—ব'লেই টেবিলের উপর থেকে টুপিটা তুলে নিয়ে রাগে গজগজ করতে করতে সুন্দরবাবুর জুতো মসমসিয়ে সবেগে প্রস্থান।

আর একদিন সন্ধ্যাকালে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েই তিনি অসন্তুষ্ট নেত্রে দেখলেন, ঘরের ভিতরে কে একটা লোক ইজিচেয়ারের উপর রয়েছে অর্ধশয়ান অবস্থায় এবং তার সামনের টেবিলের উপর ঝুঁকে প'ড়ে জয়ন্ত নিম্নস্বরে বলছে, 'ঘরের আলো কমিয়ে দিয়েছি, এইবারে আপনি চোখ বুঁজে ফেলুন। এখুনি আপনার ঘুম আসবে।'

ঘরের এক কোণ থেকে সুন্দরবাবুকে দেখতে পেয়েই মানিক সন্তর্পণে বাইরে এসে তাঁকে নিয়ে খানিক তফাতে গিয়ে বলল, এখন আর জয়ন্তের সঙ্গে কথা কইবার চেষ্টা করবেন না।'

—'কেন?'

—'যোগনিদ্রায় গোলমাল হ'তে পারে।'

—'ওরে বাবা, যোগনিদ্রা আবার কি চীজ্?

—'হিপ্নটিজম্-এর আর এক বাংলা নাম হচ্ছে যোগনিদ্রা।'

—'হুম্!'

—'যোগনিদ্রায় কৃত্রিম উপায়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা হয়। ঘরের ভিতরে লোকটিকে যোগনিদ্রায় অভিভূত করা হচ্ছে। এর পরে লোকটি হবে জয়ন্তের হাতের কলের পুতুলের মত।'

—'জানি হে জানি, ও-রকম ম্যাজিক ঢের দেখেছি। বলি, এই

ছেলেখেলা আরো কতদিন চলবে ?'

—'আমি জানি না, জয়ন্ত জানে।'

—'সেই একঘেয়ে বুলি—'আমি জানি না, জয়ন্ত জানে।' সুন্দরবাবু এতটা ক্রোধাবিষ্ট হ'লেন যে, তাঁর মুখ দিয়ে আর বাক্য নিঃসরণ হ'ল না। স্বল্পালোকিত ঘরের দিকে একটা বিষাক্ত দৃষ্টিবাণ ছুঁড়ে তিনি তৎক্ষণাৎ ভুঁড়ি দুলিয়ে গট্‌গটিয়ে সে স্থান ত্যাগ করলেন।

। দুই ।

সম্মোহন বা যোগনিদ্রা নিয়ে তখন জয়ন্তের পরীক্ষা কার্য্য চলছে একটানা। সেদিনও সকালে চা পান করবার সময়ে সে হিপ্‌নটিজম্ সংক্রান্ত কি একখানা ইংরেজী পুস্তকের উপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিল।

এমন সময়ে ঘরের ভিতরে সুন্দরবাবুর আবির্ভাব। তিনি অভিমান ক'রে জয়ন্তের সঙ্গে কথা কওয়া ছেড়েছেন বটে,কিন্তু ওখানকার জিভে জল-আনা প্রভাতী চায়ের আসরটি ছাড়তে পারেননি। প্রতিদিন যথা সময়ে এসে পড়েন, প্রচুর তরল ও নিরেট পদার্থ উদরদেশে পাঠিয়ে দেন, মানিকের সঙ্গে খেতে খেতে বাক্য বিনিময় করেন এবং ডানহাতের কাজ ফুরিয়ে গেলেই দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, 'তাহলে আসি ভাই মানিক, আর বসবার সময় নেই—ডিউটি ইজ ডিউটি।'

আজ যেন সুন্দরবাবুকে কেমন চিন্তান্বিত ব'লে মনে হ'ল। তিনি মাত্র দুই পেয়ালা চা, চারখানা টোস্ট্ ও চারটে 'এগ-পোচ' গলধঃকরণ ক'রেই উঠে পড়বার উপক্রম করলেন।

বিস্মিতকণ্ঠে মানিক শুধাল,'সেকি দাদা,এর মধ্যেই ? ব্যাপার কি ?'

—'হুম্। ডিউটি ইজ্ ডিউটি।'

—'এমন কী ডিউটি ?'

—'একটা মহা ধড়িবাজ আসামীর পাল্লায় পড়ে একেবারে জব্দ হয়ে আছি।'

—'মামলাটা কিসের ?'

জয়ন্তের দিকে চকিতে একটা চোরা কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে সুন্দরবাবু বললেন, 'বাপরে, এই যোগনিদ্রার আশ্রমে ফৌজদারী মামলার কথা তুললে কি আর রক্ষে আছে। মাথা কাটা যেতে পারে যে।'

সুন্দরবাবুকে অভাবিতভাবে চমকিত ক'রে জয়ন্ত বই থেকে মুখ তুলে আচম্বিতে প্রশ্ন করল, 'আপনি কি মনে করেন, ফৌজদারী মামলার সঙ্গে সম্মোহনের কোনই সম্পর্ক থাকতে পারে না?'

—'কেবল আমি কেন, তুমিও কি তাই মনে কর না?'

—'না না, একশোবার না।'

—'তবে সম্মোহনের খাতিরে আমাদের বয়কট করছ কেন?'

—'আমি পরীক্ষা ক'রে দেখছি 'হিপ্‌নটিজম্‌' বা সম্মোহন-বিদ্যার সাহায্যে 'ক্রিমিনোলজি' বা অপরাধ-বিদ্যা আরো খানিকটা অগ্রসর হ'তে পারে কি না?

—'তা সম্ভবপর হ'লেও পুলিশের কাজে লাগবে না।

—'কেন?'

—'আদালতের আইন সম্মোহন-বিদ্যাকে মানবে না।

—'জানি, সুন্দরবাবু জানি। তবু যে সম্মোহন-বিদ্যাকে গোয়েন্দার কাজে খাটানো যায়, আমার হাতের এই বইখানা পড়লে আপনারও সে সন্দেহ থাকতো না।'

সুন্দরবাবু কৌতুহলী কণ্ঠে বললেন, 'বটে, বটে তাই নাকি!'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।—অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর অপরাধ-বিশেষজ্ঞদের কৃপায় আমরা এ সম্পর্কে অনেক নতুন নতুন কথা জানতে পেরেছি। ভিয়েনা শহরের ডাঃ ম্যাক্সিমিলিয়ান ল্যাঙ্গ্‌সন সম্মোহন-বিদ্যার মহিমায় দেশবিদেশের পুলিশকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। লিওনার্ড হ্যারেলসন নামে আমেরিকার আর এক বিখ্যাত গোয়েন্দাও সম্মোহনকে নিজের কাজে লাগিয়ে আশ্চর্যরূপে উপকৃত হয়েছেন। এই কেতাবে তাঁদের কীর্তির কাহিনী লেখা আছে। পড়ে দেখবেন?'

সুন্দরবাবু মুখভঙ্গি করে বসলেন, 'ও আমার পোড়াকপাল, মামলার

পর মামলায় হামলা সামলাতে-সামলাতেই জীবন জর-জর হয়ে উঠল, কেতাব পড়বার ফুরসত কোথায় ভাই, ও-সব তোমাদেরই শোভা পায়। কিন্তু কি বললে? হিপ্‌নটিজম্‌ পুলিশের কাজেও লাগে। কিন্তু আমার হাতের এই মামলাতে তোমার ঐ যোগনিদ্রা বোধহয় কিছু সুবিধা করে উঠতে পারবে না।'

—'সংক্ষেপে মামলাটার কথা বলুন, তাহলেই বুঝতে পারব।'

এতদিন পরে জয়ন্ত তার উদাসীনতার খোলস ত্যাগ করল ব'লে সুন্দরবাবুর মুখে ফুটল খুশীর হাসি। মামলার বিবরণ বলবার আগে তিনি খোসমেজাজে একটা চুরোটে অগ্নিসংযোগ করলেন।

।। তিন ।।

'জয়ন্ত, খুব সংক্ষেপেই তোমাকে মামলার বিবরণ বলব।'

যামিনীকান্ত চক্রবর্তীর দেশ হচ্ছে পূর্ববঙ্গে, কিন্তু কলকাতা শহরে এসে কাপড়ের ব্যবসা ফেঁদে তিনি রোজগার করেন বেশ দু-পয়সা। এখানে বাসা বেঁধেছেন শ্যামবাজার অঞ্চলে।

তাঁর মেয়ের নাম হাসিনী, বয়স সতেরো। পিতার একমাত্র সন্তান। রং, গড়ণ আর মুখশ্রী—সবদিক দিয়ে দেখবার মত সুন্দরী। তাকালে লোকে আর চোখ ফেরাতে পারে না। হাসিনী কুমারী।

অর্ধশিক্ষিত পিতার একমাত্র দুলালী কন্যা হাসিনী লেখাপড়া নামমাত্র জানলেও কেবলমাত্র চোখে দেখে এমন হালফ্যাসানের সাজগোজ করতে শিখেছিল যে, অনায়াসেই তাকে বিদুষী ও আপ্‌-টু-ডেট শহুরে মেয়ে বলে চালিয়ে দেওয়া চলত।

সে উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের আনন্দ আবিষ্কার ক'রত সচিত্র চলচ্চিত্র পত্রিকাগুলোর মধ্যে এবং প্রায় নিত্যই সন্ধ্যার পর সাগ্রহে যাত্রা করত শহরের কোন-না-কোন থিয়েটার বা চলচ্চিত্রালয়ের দিকে। সিনেমা-অভিনেত্রীদের জীবনের মধ্যেই লাভ করত সে যা-কিছু অ্যাড্‌ভেঞ্চার ও রোমান্সের সন্ধান এবং অদূর ভবিষ্যতে একদিন-

না-একদিন সিনেমার পর্দার উপরে নিজেও দেখবে নিজেকে—এই ছিল তার একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বলল, সংক্ষেপে মোদ্দা ব্যাপারটা বলুন না দাদা, গৌরচন্দ্রিকাতেই এত বর্ণনা কেন?

—তা একটু বর্ণনা দিতে হবে বৈকি ভায়া, এটা যে হাসিনী-হরণ কাহিনী।

—হরণের কারণ?

—খুব স্পষ্ট। অর্থলোভ।

—বটে। তা হরণ করলে কে?

—নকুল বিশ্বাস। পুলিশ-জানিত অতি চতুর পুরাতন পাপী। একবার জাল নোট, আর একবার ভুয়ো চেক চালাতে গিয়ে ধরা পড়ে। কিন্তু আইনের ফাঁকিতে জেল না খেটে বেঁচে গিয়েছে দু-বারই। নচ্ছারটার উপর অনেকদিন থেকেই আমার বড় আক্রোশ, কিন্তু এ-বারেও সে হয়তো আমাদের কলা দেখাবে। কারণ, তাকে গ্রেপ্তার করেও বোধহয় জেল খাটাতে পারব না, আবার সে আমাদের ভোগা দেবে।

—কেন?

—নকুল যে হাসিনীকে নিয়ে পালিয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেবল হাসিনী নয়, সেই সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে—হাসিনীর গায়ের দশহাজার টাকার জড়োয়া গহনা আর তার বাপের নগদ পাঁচহাজার টাকা। পালাবার সময় দু'জন সাক্ষী স্বচক্ষে তাদের দেখেছে। আরো সাক্ষী আছে। কিন্তু নকুল বলে, তারা হচ্ছে পুলিশের সাজানো সাক্ষী, ঘটনার দিন সে ছিল শ্রীরামপুরে তার মামার বাড়িতে। সেখানেও তদন্ত করতে যাওয়া হয়—কিন্তু যেমন ভাগ্নে, তেমন মামা, ঘুঁটের এপিঠ-ওপিঠ, সেও নকুলের কথায় সায় দেয়।

—আর হাসিনী?

—তার পাত্তা নেই, নকুল তাকে কোথায় গুম ক'রে ফেলেছে কেউ

তা বলতে পারে না। এখন আমার অবস্থাটা বুঝেছ তো জয়ন্ত। নকুলকে আমি কেবল ছেড়ে দিতেই বাধ্য হব না, আমার দুর্নাম হবে যে, মিথ্যা সাক্ষী সাজিয়ে আমি একজন নিরাপরাধকে জেলে পাঠাতে চেয়েছি। এমন মামলায় তোমার সম্মোহন বিদ্যা আমার কোন্ কাজে লাগবে বল? একে তো ও বিদ্যাটা আইনের ক্ষেত্রে ঘষা টাকার মতন অচল, তার উপর নকুলের মত ধড়িবাজ ব্যক্তিকে কেউ সম্মোহিত করতে পারবে ব'লে আমার বিশ্বাস নেই। কারণ, আমি অভিজ্ঞ ব্যক্তির মুখেই শুনেছি, যার ইচ্ছাশক্তি দুর্বল, সেই-ই সম্মোহিত হয় প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে। কিন্তু আমি জোর ক'রেই বলতে পারি নকুলের ইচ্ছাশক্তি আর কারুরই চেয়ে দুর্বল নয়।

জয়ন্ত বলল, ও-সব সেকেলে ধারণা ছেড়ে দিন দাদা। কারণ বহু পরীক্ষার পর আজকাল প্রমাণিত হয়েছে যে, বুদ্ধি যার যতই প্রখর আর ইচ্ছাশক্তি যতই প্রবল, ততই বেশী তাড়াতাড়ি সে যোগনিদ্রার প্রভাবে নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু ও-কথা যাক্। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আজ সন্ধ্যার পর অর্থাৎ রাত দশটার সময় শ্রীমান নকুলকে খুব ভালো করে খাইয়ে—পুর্ণোদরে একবার আমার সামনে নিয়ে আসতে পারবেন কি?

সুন্দরবাবু চমৎকৃতভাবে বললেন, হুম্, এ আবার তোমার কি খেয়াল!

—খেয়াল নয়, বলুন না পারবেন কি না?

—কেন পারব না—আলবৎ পারব।

—বেশ, ঐ কথাই রইল। আমি একলা থাকব আমার পাঠাগারে নকুলকে একলা ভেতরে পাঠিয়ে দেবেন, কিন্তু তার হাতে যেন হাত-কড়া না থাকে।

—বা-রে যদি চম্পট দেয়?

—নিশ্চয়ই সে এত বোকা নয় যে পালিয়ে গিয়ে নিজেকে অপরাধী ব'লে প্রমাণিত করবে। তাছাড়া বাইরে দরজার পাশেই

মানিকের সঙ্গে স্বয়ং আপনি ওঁৎ পেতে থাকবেন, সে পালাবে কেমন করে?

—কিন্তু কোন্ ওজরে তাকে এখানে নিয়ে আসব।

—তাকে বলবেন, সরকার তার পক্ষ সমর্থনের জন্য আমাকে উকিল নিযুক্ত করেছেন। জানেন তো, ছাত্রজীবনে আমি ওকালতিটাও পাস ক'রে রেখেছিলুম।

সুন্দরবাবু প্রায় হতভম্বের মত বললেন, তোমার উদ্দেশ্য আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আপাতত কিছুই বোঝবার দরকার নেই। কিন্তু মনে রাখবেন, মাছ, মাংস, ডিম আর ভালো ভালো মিষ্টান্নে নকুলচন্দ্রের উদরগহ্বর একেবারে কানায়-কানায় ভরপুর করে ফেলতে হবে। সে যদি চায়, দু-তিন পেগ পর্যন্ত হুইস্কি কি ব্রাণ্ডি দিতেও নারাজ হবেন না। ঠিক রাত দশটার সময় আমার পাঠাগারে পানভোজনে পরিতৃপ্ত নকুলচন্দ্রকে আমি দর্শন করতে চাই।

॥ চার ॥

কাঁটায় কাঁটায় রাত দশটার সময় নকুল প্রবেশ করল জয়ন্তের পাঠাগারের মধ্যে।

এক নম্বরের উন্মার্গগামী উড়ুক্কু বখাটে-মার্কা চেহারা—যদিও তার মুখশ্রী ও দেহের রং-গড়ন মন্দ নয়। চোখের তলায় গাঢ় কালিমা জমাট হয়ে যেন তার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পরিচয় দিতে চায়। দৃষ্টি কঠিন, কুটিল ও চাতুর্যপূর্ণ। বয়স পঁয়ত্রিশের বেশী নয়।

সন্দিগ্ধ নজরে সে ঘরের চারিদিকটা একবার ভালো করে দেখে নিলে। দূরে টেবিলের উপর একটা আবরণে ঢাকা অল্পশক্তি বিজলী-বাতির ম্লান আলোতে অস্পষ্ট দেখা যায়, সারা দেওয়ালে রয়েছে সারি

সারি বই-ভরা আলমারি। পাওয়া যায় ধূপের স্নিগ্ধ সুগন্ধ ; সেই সঙ্গে যোগ দিয়ে বাতাসকে ভারাক্রান্ত করে তুলছে ফুলদানীতে রক্ষিত গুচ্ছ গুচ্ছ সুরভিগন্ধা রজনীগন্ধা। সেই শান্ত পরিবেশকে সঙ্গীতপূর্ণ করে তুলে এক কোণে চেয়ারে ব'সে একটি লোক নিজের মনে অঙ্গুলিচালনা করছে, সেতারের তারে এবং ছন্দে ছন্দে ধ্বনিত হয়ে উঠছে কোন ঝিমিয়ে-পড়া নিদ্রালু রাগিণীর রিণি-রিণি। চারদিকে বিলিয়ে দিচ্ছে যেন একটা রহস্যময় অলস নিশুতি-মন্ত্র!

সেতারে ঘুম-পাড়ানি সুর থামিয়ে জয়ন্ত বলল, আসুন! আসুন! বিদ্রোহপূর্ণ উদ্ধত স্বরে নকুল বলল, আমাকে কেন এখানে আনা হয়েছে?

জয়ন্ত স্থির নেত্রে তার পানে তাকিয়ে বলল, কেন, আপনি কি শোনেন নি? সরকার আপনাকে সাহায্য করতে চান।

—সাহায্যের প্রয়োজন নেই। আমার নিজের উকিল আছে।

—তাই নাকি! তা আমি জানতুম না। বেশ, বেশ। কিন্তু এলেন যখন একটু বিশ্রাম করে যান। জয়ন্ত সামনের ইজিচেয়ারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল।

নকুল বসে পড়ল যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। অনুভব করল, জয়ন্তের দৃষ্টি তখনও তার উপরে স্থির আছে—সে দৃষ্টি যেন মর্মভেদী, অত্যন্ত অস্বস্তিকর।

কিছুক্ষণের স্তব্ধতা। সেতারের রাগিণী বোবা হয়েছে বটে, কিন্তু জয়ন্তের আঙুল তারে তারে তুলতে লাগল ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং—

সে ধ্বনি আর থামল না—বাক্যালাপের ভিতরেও সমানে জেগে রইল।

জয়ন্ত খুব মৃদুস্বরে শুধাল, আপনার মুখ এমন শান্ত কেন?

নীরস হাসি হেসে নকুল বলল, মুরগীকে জবাই করবার আগে ভালো করে খাইয়ে-দাইয়ে মোটা করে তোলা হয়। হয়তো সেই উদ্দেশ্যেই পুলিশ আজ আমার জন্য রাজভোজের ব্যবস্থা করেছিল।

এমন করে খাওয়া হয়েছে যে এখন কেবল ঘুমোতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু পুলিশ আমাকে ঘুমোতে দিল না, একরকম জোর করেই এখানে টেনে আনল। এ বোধহয় যন্ত্রণা দেবার নতুন পদ্ধতি!

ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং—সেতারের ধ্বনি জেগে উঠল। সেই ক্রিং ক্রিং ধ্বনি আগেকার নিদ্রালু রাগিনীরই কোন না কোন পর্দা ধরে বেজে উঠেছে।

জয়ন্ত বলল, না, না, যন্ত্রণা পাবেন কেন? আপনি অনায়াসেই ঘুমোতে পারেন।

—মাথার উপরে পুলিশের ডাণ্ডা নিয়ে। আর এই অস্থানে—?

—ও সব কথা ভুলে যান। ঘুম পেয়েছে, ঘুমিয়ে পড়ুন। কেউ আপনাকে বিরক্ত করতে আসবে না। ঘুমিয়ে পড়ুন।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং।

অবাক হয়ে নকুল ভাবতে লাগল, সবই যেন অস্বাভাবিক! লোকটার মতলব কি? ও অমন করে এক দৃষ্টিতে আমার পানে তাকিয়ে আছে কেন? এই ঘরটার সমস্তই কেমন যেন থমথম করছে। ঐ আলো আঁধারি, ঐ ফুলের গন্ধ—ঐ সেতারের ধ্বনি—সবই যেন ঘুমকে ডেকে আনে। লোকটাও যেন চুপি চুপি বলছে—ঘুমিয়ে পড়ুন, ঘুমিয়ে পড়ুন। না! ওর অপলক চোখের দিকে আর তাকানো যায় না। মনে হচ্ছে যেন, যাকে লুকিয়ে রেখেছি পাহারা এড়িয়ে খুঁজে বার করবে। না, না, ঐ সর্বনেশে সর্বগ্রাসী দৃষ্টির দিকে তার তাকানো উচিত নয়—উচিত নয়।

নকুল নিমীলিত করে ফেলল নিজের দৃষ্টি।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং—এ যেন ঘুম-পাড়ানিয়া ঘুমন্ত রাত্রির স্বপ্নসঙ্গীত।

জয়ন্ত দূর থেকেই যেন নকুলের কানে কানে বলল, ঘুমিয়ে পড়ুন, ঘুমিয়ে পড়ুন, ঘুমিয়ে পড়ুন।

নকুলের মাথাটা হঠাৎ একদিকে কাৎ হয়ে এলিয়ে পড়ল—দুই বাহুও শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ল দেহের দুই পার্শ্বে।

এই তো যোগনিদ্রা।

জয়ন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে উঠে বসে আস্তে আস্তে হাততালি দিলে এবং সুন্দরবাবুর সঙ্গে মানিক ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল।

নকুলের মুদ্রিত চোখ দুটো আবার খুলে গেল।

সুন্দরবাবু হতাশভাবে বললেন, ও জয়ন্ত, নকুলকে তাহলে ঘুম পাড়াতে পারলে না?

জয়ন্ত বললে, এ হচ্ছে জাগ্রত সুষুপ্তি। একেই বলে যোগনিদ্রা। ও চোখ খুলে তাকিয়ে আছে বটে, কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ওর কাছে লুপ্ত এখন বাইরের জগৎ।

মানিক বলল, অতঃপর?

—অতঃপর নকুল আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবে।···নকুল··· নকুল, শুনছ?

প্রায় শোনা যায় কি না যায় এমনি মৃদুস্বরে নকুল বললে, অ্যাঁ?

—তুমি কি এখন ঘুমিয়ে পড়েছ?

—হ্যাঁ।

—তুমি হাসিনীকে চেনো?

—চিনি।

—সে এখন কোথায়?

—শহরতলীর পঞ্চানন দাস লেনে।

—বাড়ির নম্বর—

—তেইশ।

—সেখানে তাকে নিয়ে গেল কে?

—আমি।

—ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। সব কথা ভাল করে খুলে বল

তখন নকুল তেমনি প্রায় অস্ফুট স্বরে যে সব কথা প্রকাশ করল, সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই :

প্রথমে সিনেমা-গৃহে নকুলের সঙ্গে হাসিনীর পরিচয় হয়। তারপর বিভিন্ন ছবিঘরে তাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠহয়েওঠে ধীরে ধীরে। হাসিনীর মুখেই প্রকাশ পায়,তার জীবনের প্রধান উচ্চাকাঙ্ক্ষা : সে ছবির পর্দায় আত্মপ্রকাশ করবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। নকুল তার সেই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করতে ইতঃস্তত করেনি। হাসিনীকে জানায় এক বিখ্যাত ষ্টুডিওর মালিক ও বহু বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক তার বিশেষ বন্ধু, সে অনুরোধ করলে তাঁরা তাকে হিরোইনের ভূমিকা দিতে আপত্তি করবেন না। হাসিনী শুনেই আগ্রহে উন্মুখ হয়ে ওঠে। নকুল বলে, তার বাবা নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে মত দেবেন না। হাসিনী বলে, চিত্রনটী হবার জন্য তার বাবার অমতেই সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে চায়। তারপর একবার ছবির পর্দায় দেখা দিলেই তার বাবা তাকে ক্ষমা করতে বাধ্য হবেন, কারণ তার বাবা তাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, আর সে ছাড়া তার বাবার আর কোন সন্তান নেই। নকুল বলে, ছবিওয়ালারা তাকে গ্রহণ করতে রাজী হলেও তাকে নিয়ে ছবি তুলতে সময় লাগবে কয়েক মাস, বাবাকে লুকিয়ে পালালে সেই কয়েক মাসের খরচ চালাবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, নকুলের তা দেবার ক্ষমতা নেই। হাসিনী বলে, নিজের খরচ নিজেই চালাবার ব্যবস্থা না করে, সে বাড়ি ছেড়ে পালাবে না। তারপর এক নির্দিষ্ট দিনে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে নকুলের সঙ্গে প্রথমে তারই বন্ধু শ্রীনাথ সেনের বউবাজারের হোটেলে গিয়ে ওঠে। দিন কয়েক যায় — তারপর ছবির ষ্টুডিয়োয় যাবার জন্য হাসিনী বিশেষ অধীর হয়ে উঠলে, নকুল নিজের আসল মনের কথা প্রকাশ করে বলে, সে তাকে আগে বিবাহ করবে, তারপর ষ্টুডিয়োয় নিয়ে যাবে। সেই কথা শুনে হাসিনী গোলমাল শুরু করে দেয়। ইতিমধ্যে তাদের নিয়ে পুলিশের জোর তদন্ত আরম্ভ হয়। নকুল ভয় পেয়ে হাসিনীকে স্থানান্তরিত করে

শ্রীনাথের শহরতলীর বসতবাড়িতে নিয়ে যায়। এখন সেইখানেই সে বন্দিনী হয়ে আছে।

জয়ন্ত সুধাল, হাসিনীর দশ হাজার টাকার গহনা আর নগদ পাঁচ হাজার টাকার খবর কি?

নকুল বলল, আমি সে-সব আমার কাছে গচ্ছিত রাখতে চেয়েছিলুম কিন্তু হাসিনী কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজি হয়নি।

—তুমি কি ভেবেছিলে, হাসিনী তোমাকে পছন্দ করে?

—হ্যাঁ, ভেবেছিলুম সে সাধারণ চরিত্রের মেয়ে। আমাকে বিবাহ করতে আপত্তি করবে না, আর আমিও সহজেই তার পিতার সম্পত্তির উত্তাধিকারী হব।

—তারপর?

—তারপর বুঝলুম সে ভয়ানক মেয়ে। তার কাছে বিবাহের কথা তুলতেই সে অগ্নি মূর্তি হয়ে উঠল, আমাকে আর কাছে ঘেঁসতেই দিল না।

নকুল মৌন হবার পর জয়ন্ত মুখ ফিরিয়ে বলল, সুন্দরবাবু, সব শুনলেন?

সুন্দরবাবু বললেন, হুম, আশ্চর্য!

জয়ন্ত বলল, কেমন করে যোগনিদ্রার সঙ্গে অপরাধবিদ্যার সম্পর্ক স্থাপন করা যায়, বুঝলেন তো? এখন তেইশ নম্বর পঞ্চানন দাস লেনে গিয়ে হাসিনী দেবীকে উদ্ধার করলেই আপনি বাজিমাৎ করতে পারবেন, তাহলে আদালতে আর যোগনিদ্রার নামোল্লেখও করতে হবে না। কারণ, বন্দিনীর মুখেই জাহির হবে নকুলের শয়তানির কাহিনী। জেগে ওঠবার পর যোগনিদ্রার কোন কথাই নকুলেশ্বরেরও আর মনে পড়বে না।

মানিক বলল, সব শুনে হাসিনীদেবীর উপর আমার শ্রদ্ধা হচ্ছে। সুন্দরবাবুর বর্ণনায় আমরা হাসিনী দেবীর একপেশে ছবি দেখেছি। তাঁর পূর্ণাঙ্গ নারীত্বের কোন পরিচয় পাইনি।

জয়ন্ত বলল, সিনেমার মোহ হাসিনী দেবীর আসল চরিত্রকে এতটুকু আচ্ছন্ন করতে পারেনি,—বাস্তবের এক আঘাতে তাঁর সমস্ত মোহ ছুটে গিয়েছে। সচরাচর এটা দেখা যায় না।

সুন্দরবাবু বললেন, আমারও মানরক্ষা হল, নকুলদেরও বাড়াভাতে ছাই পড়ল। হাসিনীদেবীকে বিবাহ করে সে আর ধনী শ্বশুরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারল না।

জয়ন্ত বলল, আমি তা'হলে এখন নকুলের ঘুম ভাঙাই, আপনিও আবার হাতকড়া বার করুন।

* * *

জয়ন্তের কথা মিলে গেল অক্ষরে অক্ষরে।

পুলিস যথাসময়ে গিয়ে ঘেরাও করে ফেললে শ্রীনাথের শহরতলীর বসতবাড়ি।

শ্রীনাথ পলাতক—দূর থেকেই সে পুলিসের গাড়ি আবিষ্কার করে ফেলেছিল এবং সেপাইরা আসছে যে তারই বাড়ি দিকে, এটুকু বুঝতে তার বিলম্ব হয়নি।

হাসিনী বাইরে এসে দাঁড়াল বেশ সপ্রতিভ মুখেই। সুন্দরবাবু শুধোলেন, এখন কি করবে ? বাড়ি যাবে, না সিনেমা-অভিনেত্রী হবে ?

হসিনীর দুই চক্ষু বিদ্যুৎ-কণিকার মত জ্বলে উঠেই নিভে গেল। শান্ত কণ্ঠে বললে, বাড়ি যাব। ভুল বুঝে এইসব করেছি, উপায় নেই।

—বাবার কাছে যেতে ভয় পাবে না ?

—বাবা বকবেন বটে, কিন্তু তিনি আমাকে ভালবাসেন। তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব। তিনি আমাকে ঠেলতে পারবেন না।

সন্ধ্যার সময় জয়ন্তের কাছে গিয়ে দুই বাহু শূন্যে আস্ফোলন করে সুন্দরবাবু বললেন, জয়তু জয়ন্ত। ধন্য তোমার যোগনিদ্রা—হুম।

মানিক বলল, 'আমেন!' অর্থাৎ তথাস্তু।

জাগ্রত হৃদপিণ্ড

মন আমার অশান্ত—অতি, অতিশয় অশান্ত! কিন্তু কেন তোমরা আমাকে পাগল মনে করবে? ব্যাধি আমার অনুভূতিকে নষ্ট করতে পারেনি প্রখর করে তুলছে অধিকতর। আমার শ্রবণশক্তির তীক্ষ্ণতা যথেষ্ট। স্বর্গের আর মর্তের সব কিছুই আমি শুনতে পাই, কানে শুনি নরকের অনেক কথাই। তবু কি বলবে আমি পাগল? শোনো! কেমন শান্তভাবে গুছিয়ে গুছিয়ে কথা বলব তোমাদের কাছে।

আমার মগজে এমন কথা জাগল কেন, তার কারণ নির্দেশ করা অসম্ভব! কিন্তু কল্পনাটা আমাকে ভূতের মত পেয়ে বসেছিল কিবা রাত্রি, কিবা দিন। উদ্দেশ্য ছিল না কিছুই, ছিল না কোন ক্রোধের উত্তেজনা!

বুড়োকে আমি ভালোই বাসতুম। কখনো সে আমার কোন অপকারই করেনি। কখনো তার কাছে আমি অপমানিত হইনি। তার টাকাকড়ির উপরেও আমার কোন লোভ ছিল না।

কিন্তু একটা কারণ আছে বোধহয়! তার ঐ চোখটা। হ্যাঁ, তাই বটে, তাই-ই বটে! তার একটা চোখ দেখতে ছিল শকুনির মত এবং তার উপরে ছিল ছানির মত পাতলা পর্দা। সেই চোখটা দিয়ে যখন সে তাকিয়ে দেখত আমার পানে, তখন যে জল হয়ে যেত আমার বুকের রক্ত! ক্রমে সেটা হয়ে উঠল অসহনীয়, মনে মনে আমি স্থির করে ফেললুম বুড়োকে মেরে একেবারে ঘুচিয়ে দেব ঐ চোখের ঝঞ্ঝাট।

কারণ আর কিছুই নয়। তোমরা আমাকে পাগল ভাবছ? কিন্তু তখন আমাকে দেখলেই বুঝতে পারতে যে, কতদিকে নজর রেখে কত সাবধানে আমি কাজ হাসিল করেছি, কত বড় চালকের মত। হত্যাকাণ্ডের এক হপ্তা আগে থেকেই বুড়োর সঙ্গে কী মিষ্টি ব্যবহারই করেছি।

আমরা এক বাসাতেই থাকতুম। প্রতিদিন ঠিক রাত-দুপুরে তার ঘরের দরজা ঠেলে খুলতুম—কিন্তু কত যে ধীরে ধীরে তা আর কহতব্য নয়। দরজা অল্প একটু ফাঁক করে প্রথমে আস্তে আস্তে গলিয়ে দিতুম আমার মাথাটা। সমস্ত মুখখানা ঘরের ভিতরে নিয়ে যেতে আমার সময় লাগত ঝাড়া এক ঘণ্টা। পাগল কখনও এত সাবধান হতে পারে।

আমার হাতে থাকত একটা চোরা লণ্ঠন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে লণ্ঠনের খুব ছোট্ট এক ফালি আলো খুলে ফেলতুম বুড়োর সেই শকুন-চোখের উপরে। কিন্তু উপর-উপরি সাত-সাতটা রাত এই কাণ্ড করেও সেই শকুন চোখটাকে খোলা অবস্থায় পেলুম না। চোখটা বন্ধ থাকলে আমি কাজ করি কেমন করে? হতাশ হয়েও আমারও কিন্তু বুড়োর উপরে একটুও রাগ হত না, ক্ষাপ্পা হয়ে উঠতুম কেবল সেই অপয়া চোখটারই উপরে। কেন সে বন্ধ হয়ে থাকে, কেন?

রোজ সকালেই আবার যেতুম বুড়োর ঘরে। এমন ভালোমানুষটি সেজে তার সংগে মন খুলে গল্প করতাম আর মন-রাখা কথা কইতাম ঘুণাক্ষরেও সে সন্দেহে করতে পারেনি যে, প্রতি রাতে ঘরে ঢুকে আমি তাকে দেখি ঘুমন্ত অবস্থায়।

তারপর অষ্টম রাত্রি। সেদিন হয়েছিলুম আমি আরো বেশী সাবধান। এমন ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ঢুকেছিলাম যে, ঘড়ির মিনিটের কাঁটার গতিও ততটা মন্থর হতে পারে না। একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছি—মাটিতে পড়ছে না যেন।

তবু বুঝি বুড়ো শুনতে পেলে। সে যেন হঠাৎ ধড়মড় করে জেগে উঠল।

ভাবছ, তখুনি আমি পালিয়ে এলুম? মোটেই নয়। ঘরের ভিতরে কালো পিচের মত অন্ধকার। ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে সব জানালা বন্ধ। বুড়ো ফাঁক করা দরজাটা দেখতে পেল না। আমি চোরা লণ্ঠনের টিনের দরজাটা খুলি খুলি করছি—

বুড়ো হঠাৎ সশব্দে বিছানার উপরে উঠে বসে সচমকে বললে, কে? কে ওখানে?

আমি চুপ! প্রায় ঘণ্টাখানেক সেইখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। বুড়োও নিঃসাড়, আবার শুয়ে পড়ল বলেও মনে হল না। বোধহয় সে বসে কান পেতে শুনছে!

তারপরেই বুড়ো গোঁ গোঁ শব্দ করে উঠল। সে হচ্ছে দারুণ আতঙ্কের শব্দ। তা দুঃখ যাতনার ধ্বনি নয়, মানুষ মারাত্মক ভয় পেলেই চাপা গলায় এমন আর্তনাদ করে এবং সে ধ্বনি আসে একেবারে অন্তরাত্মার ভিতর থেকেই। আমি ও ধ্বনিকে ভালো করেই জানি! বহু রাত্রে—ঠিক মধ্যরাত্রে সারা পৃথিবী যখন ঘুমন্ত, আমার আতঙ্কগ্রস্ত অন্তরাত্মার ভিতর থেকে ঠিক ঐ রকম আর্তধ্বনি ও তার ভয়াবহ প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছি—আমি শুনতে পেয়েছি। হ্যাঁ, ও ধ্বনিকে আমি খুব চিনি। বুড়োর মনের ভাব বুঝতে আমার বিলম্ব হল না।

কিছু একটা শব্দ শুনে সেই যে সে জেগে উঠেছে, এখনো আর ঘুমোতে পারেনি। বেড়ে উঠছে—ক্রমেই বেড়ে উঠেছে তার আতঙ্ক। 'যা শুনেছি, ভুল শুনেছি'—এই বলে সে নিজের মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

কখনো ভাবছে, বোধহয় বাতাসের শব্দ, নয়তো ইঁদুরেরা চলাফেরা করছে। হয়তো কোথা থেকে একটা ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডেকে উঠেছে!

কিন্তু বৃথা—বৃথা! কোন যুক্তিতেই সে মনকে বোঝাতে পারছে

না। তা পারবে কেন? মৃত্যু যে তার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে—কালো ছায়াপাত করেছে তার মনের ভিতরে! তাই ঘরের ভিতরে যদিও সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কিছু শুনতে পাচ্ছে না, তবু সে অনুভব করতে পারছে আমার উপস্থিতি।

বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন দেখলুম, আজ রাত্রে বুড়োর চোখে ঘুম আসা অসম্ভব, তখন স্থির করলুম, চোরা লণ্ঠনের টিন সরিয়ে একটুখানি আলো বাইরে ফেলে দেখা যাক, ব্যাপার কি দাঁড়ায়? তাই করলুম, কিন্তু কত চুপিচুপি যে করলুম তোমরা তা আন্দাজ করতে পারবে না। বাইরে বেরিয়ে এল একগাছা লতাতন্তুর মত সূক্ষ্ম আলোকরেখা।

সে আলোকরেখা গিয়ে পড়ল একেবারে বুড়োর শকুন-চোখের উপরেই।

চোখটা আজ আর বন্ধ নয়, ড্যাব্ ড্যাব্ করে তাকিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষাপ্পা হয়ে উঠলুম আমি। সেই ছানির মত পর্দা-পড়া বিশ্রী শকুন-চোখ, যা দেখলেই আমার দেহের অস্থি-মজ্জার ভিতর দিয়ে বয়ে যায় কনকনে তুষারস্রোত। বুড়োর মুখ বা দেহের কিছুটা আমি দেখতে পাচ্ছিলুম না, কিন্তু আলো গিয়ে পড়েছে যথাস্থানেই।

সেই সময়ে আমার কানে এল একটা শব্দ। একটা নিম্ন, চাপা, দ্রুত ধ্বনি,—ঘড়িকে তুলো দিয়ে চেপে রাখলে যেমন শব্দ হয়। ও-শব্দও আমার অজানা নয়। ও হচ্ছে বুড়োর হৃদপিণ্ডের ঢুপ্ ঢুপুনি। দামামা বাজলে সৈনিক যেমন চাঙ্গা হয়ে ওঠে, আমাকেও তেমনি জাগ্রত করে তুললে সেই শব্দ।

কিন্তু তখনও আমি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম মূর্তির মত। আমার হাত একটুও কাঁপছে না; স্থির হয়ে আছে শকুন-চোখের উপর নিক্ষিপ্ত আলোকরেখা। ইতিমধ্যে হৃদপিণ্ডের সেই ঢুপ্ ঢুপ্ শব্দ বেড়ে উঠেছে ক্রমে ক্রমে—বোধহয় চরমে উঠেছে বুড়োর আতঙ্ক। শব্দ

বাড়ছে, আরও বাড়ছে মুহূর্তে মুহূর্তে। গোড়াতেই বলেছি, মন আমার অশান্ত। সত্যিই তাই। সেই নিশুতি রাত, সেই পুরাতন বাড়ীর নিদারুণ স্তব্ধতার মধ্যে হৃদপিণ্ডের সেই অদ্ভুত শব্দ আতঙ্কে আচ্ছন্ন করে তুললো আমার প্রাণ মনকেও। তবু আরো কিছুক্ষণ আমি অপেক্ষা করলুম।

কিন্তু কি মুস্কিল—ঢুপ্ ঢুপ্ ঢুপ্ ঢুপ্ ঢুপ্ ঢুপ্! শব্দ যে ক্রমেই উচ্চতর হয়ে উঠছে। এইবারে হয়তো ফেটেই যাবে ওর হৃদপিণ্ডটা; একটা নতুন দুশ্চিন্তা আমাকে করলে আক্রমণ। যদি কোন প্রতিবেশী শব্দ শুনতে পায়? না, আর দেরি নয়। বুড়োর শেষ মুহূর্ত উপস্থিত।

প্রচণ্ড চীৎকার করে চোরা-লণ্ঠনের আবরণ সরিয়ে ফেলে আমি বুড়োর বিছানার কাছে গিয়ে পড়লুম। বুড়োও বিকট চিৎকার করে উঠল—কিন্তু মাত্র একবার। পর মুহূর্তেই তাকে আমি টেনে এনে মাটির উপরে পেড়ে ফেললুম, তারপর খাটের তোষক দিয়ে তার দেহটা জড়িয়ে চেপে ধরলুম প্রাণপণে। তারপর এক মিনিট' দু মিনিট, তিন মিনিট এবং আরো কয়েক মিনিট ধরে বুড়োর কলিজাটা করতে লাগল ঢুপ্ ঢুপ্। শব্দ এখন হোক্ গে যাক্, ঘরের দেওয়াল ফুঁড়ে বাইরের কোন লোকের কানে গিয়ে পৌঁছুতে পারবে না তা।

তারপর থেমে গেল শব্দ। বুড়ো মরেছে। তোষক সরিয়ে তার বুকের উপরে হাত রাখলুম। স্থির বুক, বুড়ো মরে কাঠ হয়ে গিয়েছে। স্তব্ধ রাত—খণ্ড খণ্ড করে ফেললুম মৃতদেহটা। মেঝেয় ছিল কাঠের পাটাতন। তারই খানিকটা সরিয়ে মেঝের অংশগুলো নীচে রেখে উপরে আবার রেখে দিলুম পাঠাতনের কাঠ। তারপর এমন সাবধানে কাজ করলুম যে, ঘরেতে কোথাও রক্তের ছিটে ফোঁটা পর্যন্ত রইল না। দেখছ তো, কী চালাক আমি—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ঘড়ি বেজে উঠল ঢং ঢং ঢং ঢং। রাত চারটে। আমার সব কাজ সমাপ্ত—আর আমাকে পায় কে।

ঘন ঘন সদর দরজায় কড়া নড়তে লাগল, অত্যন্ত জোরে জোরে।

নিশ্চিন্ত মনেই নীচে নেমে গিয়ে খুলে দিলুম সদর দরজা। পুলিশের লোক—ইন্‌সপেক্টর ও পাহারাওয়ালা। ব্যাপার কি?

এরই মধ্যে পাড়ার কেউ থানায় খবর দিয়েছে যে, এই বাড়ীর ভিতর থেকে বিকট স্বরে কে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছে। পুলিশ-কর্মচারীরা তাই তদন্ত করতে এসেছে।

শুনে আমার একটুও ভয় হল না। হাসতে হাসতে বললুম, দুঃস্বপ্ন দেখে আমিই ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠেছিলুম।

—এই বাসায় এক বৃদ্ধও থাকেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু কি কারণে তিনি আজ মফঃস্বলে গিয়েছেন?

—বাড়ীর ভিতরটা আমরা দেখতে চাই।

—অনায়াসেই দেখতে পারেন। আসুন আমার সঙ্গে। এই পথে।

নির্ভয়ে তাদের নিয়ে গেলুম একেবারে বুড়োর ঘরে। ঘরের চারিদিকে তন্নতন্ন করে খুঁজতে বললুম। ঘরের কোন কিছু চুরি যায়নি বা তছনছ হয়নি, সেদিকেও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করালুম। নিজের হাতে চেয়ার টেনে নিয়ে এসে তাদের সামনে এগিয়ে দিলুম এবং পাটাতনের নীচে যেখানে বুড়োর খণ্ড-বিখণ্ড দেহ আছে, ঠিক তারই উপরে একখানা চেয়ার নিয়ে এসে আমিও বসে পড়লাম।

আমার হাবভাব ব্যবহার নিশ্চয় তাদের কাছে সন্তোষজনক বলে মনে হল। ওরা বসে বসে যে প্রশ্নই করে, আমি চটপট তার জবাব দিই। তারপর তাদের প্রশ্ন করা বন্ধ হল বটে, তবু সেইখানে বসে বসে তারা গল্প করতে লাগল।

কিন্তু এইবারে আমার মনে হ'ল পুলিশের লোকগুলো এখান থেকে বিদায় হলেই বাঁচি। আমার কানের ভিতরে জেগে উঠল একটা শব্দ। ক্রমেই শব্দটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তার কথা ভোলবার জন্যে আমি তড়বড় করে কথা কইতে লাগলুম। তবু শব্দটা থামে না, পুলিশের লোকগুলোও নড়ে না। সবশেষে বুঝতে পারলুম যে শব্দটার উৎপত্তি আমার কানের ভিতরে নয়।

আমার মুখ যে বিবর্ণ হয়ে গেল, তাতে আর সন্দেহ নেই। মনের ভাব ঢাকবার জন্যে মুখে যতই জোরে কথা কই, ততই উচ্চতর হয়ে ওঠে শব্দটা। (সে এক নিম্ন, চাপা, দ্রুত ধ্বনি—ঘড়িকে তুলো দিয়ে ঢেকে রাখলে যেমন শব্দ হয়)। রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল আমার শ্বাস-প্রশ্বাস, কিন্তু তবু পুলিশের লোকগুলো সে শব্দ শুনতে পেলে না।

শব্দ বাড়ছে, বাড়ছে। আমি উত্তেজিতভাবে হাত পা নেড়ে যা তা কথা বলতে শুরু করলুম, শব্দ তবু বাড়তে থাকে। ও আপদ-গুলো কি কাজ আর বিদায় হবে না? হা ভগবান, কি করি, কি করি? ক্রমে আমি যেন পাগলের মত হয়ে উঠলুম। কোথা থেকে আসছে ঐ হৃৎপিণ্ডের ঢুপ্ ঢুপ্ শব্দ? ঢুপ্ ঢুপুনি বেড়ে উঠছে জোরে জোরে, আরো জোরে।

লোকগুলো তখনও বসে বসে গল্প করছে হাসিমুখে। নিশ্চয়ই ওরা শব্দটা শুনতে পেয়েছে। নিশ্চয়ই ওরা আমার আতঙ্কগ্রস্ত মুখ দেখে ব্যঙ্গ করছে মনে মনে! যা হবার হোক—এ যন্ত্রণা আর সহ্য করা অসম্ভব—আর আমি সইতে পারছি না ওদের ঐ কপট হাসি। আমি হয় ভীষণ চীৎকার করে উঠব, নয় এই মুহূর্তে মারা পড়ব। ঐ শোনো —আবার, আবার সেই শব্দ! জোরে। আরো জোরে, আরো জোরে, আরো, আরো জোরে!

সচীৎকারে বলে উঠলুম, ওরে পাষণ্ডরা, আর তোদের ভণ্ডামি করতে হবে না। বুড়োকে খুন করেছি আমি। পাটাতন তুলে ভাখ, এখানেই আছে তার বীভৎস হৃৎপিণ্ড।*

* এডগার অ্যালান পো লিখিত 'দি টেল অফ এ টেল হার্ট" অবলম্বনে।

কাঁচের কফিন

খুনের না মানুষ চুরির মামলা

—বোলো না, বোলো না, আজ আমাকে চা খেতে বোলো না! ঘরে ঢুকে বলে উঠলেন সুন্দরবাবু।

মানিক সবিস্ময়ে সুধোলে, একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে!

—না, আজ কিছুতেই আমি চা খাব না।

—একেবারে ধণুর্ভঙ্গ পণ?

—হুম্!

জয়ন্ত বললে, বেশ, চা না খান, খাবার খাবেন তো?

—কি খাবার?

—টিকিয়া কাবাব।

—ও, তাই নাকি?

—তার পরে আছে ভেগুালু।

—হংস মাংস?

—হঁা, বনবাসী হংস।

সুন্দরবাবু ভাবতে লাগলেন।

—খাবেন তো?

সুন্দরবাবু ত্যাগ করলেন একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস। তারপর মাথা নেড়ে করুণ স্বরে বললেন, উঁহুম্! আজ আমাকে হংস-মাংস ধ্বংস করতে বোলো না।

মানিক বললে, হালে আর পানি পাচ্ছি না! হংস-মাংসেও অরুচি? সুন্দরবাবু এইবার বোধহয় পরম হংস হয়ে বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ করবেন।

—মোটেই নয়, মোটেই নয়।

—তবে গেরস্থর ছেলে হয়েও এ-খাবনা ও-খাবনা বলছেন কেন ?

—আজ আমার উদর-দেশের বড়ই দুরবস্থা !

—অমন হৃষ্টপুষ্ট উদর, তবুও—

—আমার উদরাময় হয়েছে।

—তাই বলুন। তবে ওষুধ খান। আমি হোমিওপ্যাথি জানি, এক ডোজ্ ওষুধ দেব নাকি ?

—থো কর তোমার হোমা পাখীর কথা। আমি খাবার কি ওষুধ খেতে আসিনি। আমি এসেছি জরুরী কাজে।

—অসুস্থ দেহ, তবু কাজ থেকে ছুটি নেননি। কি টন্‌টনে কর্তব্যজ্ঞান।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই ! স্বর্গবাসী ঢেঁকিও ধান ভানে। পুলিশের আবার ছুটি কি হে ?

জয়ন্ত সুধোলে, নতুন মামলা বুঝি ?

—তাছাড়া আর কি ?

—কিসের মামলা ?

—বলা শক্ত। খুনের মামলা কি মানুষ চুরির মামলা, ঠিক করতে পারছি না !

একটু একটু করে জাগ্রত হচ্ছিল জয়ন্তের আগ্রহ। সে সামনের চেয়ারের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ ক'রে বললে, সুন্দরবাবু, ঐ চেয়ারে বসুন। ব্যাপারটা খুলে বলুন।

আসন গ্রহণ ক'রে সুন্দরবাবু বললেন, এটা আজব মামলা বলাও চলে ! রহস্যময় হ'লেও অনেকটা অর্থহীন ! নাটকের পাত্র-পাত্রী হচ্ছে তিনজন। একজন নারী আর দুজন পুরুষ। ওদের মধ্যে এক-জন পুরুষ হচ্ছে আসামী। তিনজনেই অদৃশ্য হয়েছে।

—অদৃশ্য হবার কারণ ?

—শোনো। বছর-দেড়ের আগে সুরেন্দ্রমোহন চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোক থানায় এসে অভিযোগ করেন, তাঁর পিতামহী সুশীলা-

সুন্দরী দেবীর কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই। সুশীলা দেবী বিধবা। তিনি তাঁর স্বামীর বিপুল সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী। তাঁর বয়স পঁচাত্তর বৎসর। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার দরুণ ডাক্তার মনোহর মিত্রের চিকিৎসাধীন ছিলেন। সুশীলাদেবী হঠাৎ একদিন একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়ে এনে মনোহর মিত্রের সঙ্গে বাড়ীর বাইরে চলে যান, তারপর আর ফিরে আসেন নি। খোঁজা-খুঁজির পর প্রকাশ পায়, অদৃশ্য হবার আগে সুশীলাদেবী ব্যাঙ্ক থেকে নগদ পনেরো লক্ষ টাকা তুলে আনিয়েছিলেন। সে টাকাও উধাও হয়েছে।

—ডাক্তার মনোহর মিত্র নামে এক ভদ্রলোকের খ্যাতি আমি শুনেছি। পদার্থশাস্ত্রে তাঁর নাকি অসাধারণ পাণ্ডিত্য।

—তিনিই ইনি। মনোহরবাবুকে তুমি কখনো চোখে দেখেছো?

—না।

—আমিও দেখিনি, তবে তাঁর চেহারার হুবহু বর্ণনা পেয়েছি।

—কি রকম?

—মনোহরবাবুর দীর্ঘতা পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির বেশী হবেনা, কিন্তু তাঁর দেহ রীতিমত চওড়া। তাঁর মাথায় আছে প্রায় কাঁধ পর্য্যন্ত ঝুলে পড়া সাদা ধবধবে চুল, মুখেও লম্বা পাকা দাড়ি আর তাঁর বয়সও ষাটের কম নয়, কিন্তু তার শরীর এখনো যুবকের মত সবল। রোজ সকালে সূর্য্য ওঠার আগে পদব্রজে অন্তত চার মাইল ভ্রমণ করে আসেন। তাঁর চোখ সর্বদাই ঢাকা থাকে কালো চশমায়। টিকালো নাক। শ্যামবর্ণ। সাদা পাঞ্জাবী, থান কাপড় আর সাদা ক্যাম্বিসের জুতো ছাড়া অন্য কিছু পরেন না। বর্মা চুরোটের অত্যন্ত ভক্ত। তাঁর মুখ সর্বক্ষণই গম্ভীর। ডান কপালের ওপর একটা এক ইঞ্চি লম্বা পুরাণো কাটা দাগ আছে। হাতে থাকে একগাছা রূপো-বাঁধানো মোটা মালাক্কা-বেতের লাঠি।

জয়ন্ত বললে, আরে মশাই, এ বর্ণনার কাছে যে আলোকচিত্রও হার মানে! এরপর বিপুল জনতার ভিতর থেকেও মনোহরবাবুকে আবিষ্কার করতে পারব।

সুন্দরবাবু দুঃখিত কণ্ঠে বললেন, আমি কিন্তু দেড় বৎসর চেষ্টা করে তাঁর টিকিও আবিষ্কার করতে পারলুম না।

—কেন?

—তিনিও অদৃশ্য হয়েছেন?

—তাঁর বাড়ী কোথায়?

—বালীগঞ্জে নিজের বাড়ী। সেখানে গিয়েছিলুম। কিন্তু বাড়ী একেবারে খালি।

—মনোহরবাবুর পরিবারবর্গ?

—মাথা নেই, তার মাথাব্যথা। তিনি বিবাহই করেননি।

—অন্য কোন আত্মীয় স্বজন?

—কারুর পাত্তা পাইনি। পাড়ার লোকেরমুখে শুনলাম, মনোহর বাবু জন-চারেক পুরাতন আর বিশ্বস্ত ভৃত্য নিয়ে ঐ বাড়িতে বাস করতেন বটে, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকলকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় চ'লে গিয়েছেন।

জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, আপনি বললেন সুশীলা দেবী ট্যাক্সিতে চড়ে মনোহরবাবুরসঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কি নিজের মোটর নেই?

—আছে বৈকি! একখানা নয়, তিনখানা।

—তাহলে মেনে নিতে হয়, সুশীলাদেবীর নিজের ইচ্ছাও ছিল, তিনি কোথায় যাচ্ছেন কেউ যেন জানতে না পারে।

—হয় তোমার অনুমান সত্য, নয় তিনি ট্যাক্সি ভাড়া করেছিলেন মনোহরবাবুর পরামর্শেই।

—আপনি ট্যাক্সিখানার সন্ধান নিয়েছিলেন?

—নিয়েছি বৈকি! ট্যাক্সি-চালককে খুঁজে বের করেছি। সে

আরোহীদের হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে। আর কিছুই সে জানে না।

—তাহলে মনোহরবাবুর সঙ্গে সুশীলাদেবী বোধহয় কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছেন। কিন্তু কলকাতার বাইরে—কোথায়?

—হুম, আমিও মনে মনে বারবার এই প্রশ্ন করেছি। কোথায় কোথায়, কোথায়?

—খালি ঐ প্রশ্ন নয় সুন্দরবাবু, আরো সব প্রশ্ন আছে। পঁচাত্তর বৎসর বয়সে পনেরো লক্ষ টাকা নিয়ে সুশীলাদেবী রুগ্ন দেহে এমন লুকিয়ে মনোহরবাবুর সঙ্গে চলে গেলেন কেন? তিনি বেঁচে আছেন কি নেই? মনোহরবাবু বিখ্যাত পদার্থবিদ হলেও মানুষ হিসাবে কি সাধু ব্যক্তি নন?

সুন্দরবাবু বললেন, আমার কথা এখনো ফুরোয়নি। সবটা শুনলে প্রশ্ন-সাগরে তোমাকে তলিয়ে যেতে হবে?

—আমার আগ্রহ যে জ্বলন্ত হয়ে উঠল। বলুন সুন্দরবাবু বলুন!

দুই

মানুষ না দেখে প্রতিকৃতি আঁকা

সুন্দরবাবু বললেন, যে মাসে সুশীলাদেবী অন্তর্হিত হন, সেই মাসে আরএকটা মানুষ নিরুদ্দেশ হওয়ার মামলা আমার হাতে আসে। দুটো মামলাই কতকটা একরকম। গোবিন্দলাল রায় একজন বড় জমিদার। বয়স সত্তরের কম নয়। তিনি বিপত্নীক হলেও সংসার তাঁর বৃহৎ। পাঁচ পুত্র, তিন কন্যা, পৌত্র-পৌত্রীও আছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন গোপনে ব্যাঙ্ক থেকে নগদ বারো লক্ষ টাকা তুলে নিয়ে তিনিও গিয়েছেন অজ্ঞাতবাসে। তবে গোবিন্দবাবু যাবার সময়ে একখানা

চিঠি রেখে গিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল—'আমি বিদেশ-ভ্রমণে যাচ্ছি। ফিরতে বিলম্ব হবে। তোমরা আমার জন্য চিন্তিত হয়ো না।' তারপর থেকে তাঁর আর কোন খোঁজ-খবর নেই। তিন মাসের মধ্যেও বৃদ্ধ পিতার কাছ থেকে একখানা পত্র পর্যন্ত না পেয়ে তাঁর পুত্ররা আমার আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করেও আমি গোবিন্দবাবুর নাগাল ধরতে পারিনি।

জয়ন্ত শুধোলো, আপনি কি মনে করেন, আগেকার মামলার সঙ্গে এ মামলাটারও কোন সম্পর্ক আছে?

—অল্পবিস্তর মিল কি নেই জয়ন্ত? একজন অতি-বৃদ্ধ নারী, আর একজন অতি-বৃদ্ধ পুরুষ; দুজনেই গোপনে অজ্ঞাতবাসে গমন করেছেন; আর দুজনেই যাবার ঠিক আগেই ব্যাঙ্ক থেকে বহু লক্ষ টাকা তুলে নিয়ে গেছেন; দুজনেই আত্মগোপন করবার দিন থেকে আজ পর্যন্ত নিজেদের অস্তিত্বের কোন প্রমাণই দেননি।

—কিন্তু গোবিন্দবাবুর সঙ্গে কি মনোহরবাবুর পরিচয় ছিল?

—গোবিন্দবাবুর বাড়ীর কোন লোকই মনোহরবাবুর নাম পর্যন্ত শোনেনি।

—তাহলে আপনি কি বলতে চান?

মাস খানেক আগে গোবিন্দবাবুর বড় ছেলে আমার হাতে একখানা পত্র দিয়ে ব'লে গিয়েছেন—'একখানা বইয়ের ভিতর থেকে এই চিঠিখানা পেয়েছি। চিঠিখানা পড়বার পর বাবা নিশ্চয়ই ঐ বইয়ের ভিতর গুঁজে রেখেছিলেন।' জয়ন্ত এই নাও চিঠিখানা প'ড়ে দেখ।

জয়ন্ত খামের ভিতর থেকে পত্র বার ক'রে নিয়ে পাঠ করলে:

প্রিয় গোবিন্দবাবু,

এতদিন পরে আমার প্রস্তাবে আপনি সম্মত হয়েছেন শুনে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করলুম। বেশ, আগষ্ট মাসের চার তারিখে পাঁচটার সময় আমার লোক হাওড়া ষ্টেশনে ফার্ষ্ট ক্লাস ওয়েটিংরুমে আপনার জন্যে অপেক্ষা করবে। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনাকে সঙ্গে ক'রে আনতে

হবে অন্তত নগদ বারো লক্ষ টাকা। যতদিন না আমাদের উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হয়। ততদিন আমরা এইখানেই বাস করব। আমার উপরে বিশ্বাস রাখুন। আপনার কোন আশঙ্কা নেই। পত্রের কথা কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না।

ইতি—

ভবদীয়

শ্রীমনোহর মিত্র

সুন্দরবাবু বললেন, পড়লে?

জয়ন্ত উত্তর দিল, হুঁ, চিঠির কাগজে কোন ঠিকানা নেই। কিন্তু খামের উপরে ডাকঘরের নাম রয়েছে সুলতানপুর।

—সুলতানপুর হচ্ছে একটি ছোটখাটো সহর। সেখানে আমি গিয়েছিলুম। কিন্তু ডাক্তার মনোহর মিত্রের নাম পর্যন্ত কেউ সেখানে শোনেনি।

—সুলতানপুর ডাকঘর থেকে কোন্ কোন্ গ্রামের চিঠি বিলি হয় সে খোঁজ নিয়েছিলেন তো?

—তা আবার নিইনি? শুধু খোঁজ নেওয়া কিহে, সব জায়গাতেই নিজে গিয়ে ঢুঁ মারতেও ছাড়িনি। কিন্তু লাভ হয়েছে প্রকাণ্ড অশ্বডিম্ব!

জয়ন্ত ভাবতে লাগল নীরবে।

সুন্দরবাবু বললেন, আমার কি সন্দেহ হচ্ছে জানো! মনোহর নাম ভাঁড়িয়ে কিছুদিন ও-অঞ্চলের কোথাও বাস করেছিল। তারপর সুশীলাদেবী আর গোবিন্দবাবুকে হাতে পেয়ে হত্যা ক'রে তাঁদের টাকাগুলো হাতিয়ে আবার স'রে পড়েছে কোন অজানা দেশে।

জয়ন্ত যেন নিজের মনেই বললে, চিঠি প'ড়ে জানা গেল মনোহর-বাবুর কোন প্রস্তাবে গোবিন্দবাবু প্রথমে রাজি হননি, কিন্তু পরে রাজি হয়েছিলেন। খুব সম্ভব সেই প্রস্তাবটাই কার্যে পরিণত করবার জন্যে তিনি চেয়েছিলেন বারো লক্ষ টাকা।

—হুম, কে বলতে পারে সুশীলাদেবীর কাছেও মনোহর ঠিক এইরকম প্রস্তাবই করেনি ?

—কিন্তু কি সেই প্রস্তাব, যার জন্যে লোকে এমন লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে রাজি হয়।

—কেবলই কি টাকা খরচ করতে রাজি হয় ? ধাপ্পায় ভুলে সংসার পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে অজ্ঞাতবাসে যেতেও কুণ্ঠিত হয় না !

—সুন্দরবাবু, প্রস্তাবটা যে অতিশয় অসাধারণ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

সুন্দরবাবু বললেন, জয়ন্ত, মনোহরের প্রস্তাব নিয়ে বেশি মস্তিষ্ক চালনা ক'রে কোনই লাভ নেই।

—লাভ আছে বৈকি ! প্রস্তাবটা কি জানতে পারলে আমাদের আর অন্ধকারে হাতড়ে মরতে হয় না !

—কিন্তু যখন তা আর জানবার উপায় নেই তখন আমাদের অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়তে হবে বৈকি !

—অন্ধকারে বহু ঢিল তো ছুঁড়েছেন, একটা ঢিলও লক্ষ্যে গিয়ে লাগল কি ?

—তুমি আমাকে আর কি করতে বল ?

—আপনি তো সর্বাগ্রে মনোহরবাবুকে আবিষ্কার করতে চান ?

—নিশ্চয়।

—তাহ'লে আমাদের সঙ্গে একবার সুলতানপুর চলুন।

—সেটা হবে ডাহা পণ্ডশ্রম। কারণ সে অঞ্চলের কোন পাথরই আমি ওল্টাতে বাকী রাখিনি।

—না, একখানা পাথর ওল্টাতে আপনি ভুলে গিয়েছেন।

—কোনখানা, শুনি ?

—যথা সময়ে প্রকাশ পাবে।

সুন্দরবাবু একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে বললেন, বেশ তাই সই।

—মানিক, সব শুনলে ?

—শুনলুম তো।

—এখন তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

—ফরমাজ কর।

—তোমার ছবি আঁকার হাত খুব পাকা।

—তুমি ছাড়া আর কেউ ও কথা বলে না।

—কারণ আমি আর্ট বুঝি, বাংলাদেশের পনেরো আনা লোক যা বোঝে না।

—আচ্ছা, পনের আনা অ-রসিকদের কথা এখন থাক। আমায় কি করতে হবে, তাই বল!

—মনোহরবাবুর আকৃতি-প্রকৃতির বিশেষত্বগুলি আগে তুমি সুন্দরবাবুর কাছ থেকে ভালো ক'রে আর একবার শুনে নাও। তারপর এমন একটি মনুষ্য-মূর্তি আঁকো, যার মধ্যে থাকবে ঐ বিশেষত্বগুলি।

সুন্দরবাবু কৌতূহলী হয়ে বললেন, ও রকম ছবি এঁকে কি লাভ হবে?

—ঐ ছবির সাহায্যে হয়তো আসামীকে সনাক্ত করা যাবে!

—জয়ন্ত কি যে বলে তার ঠিক নেই! মনোহরকে আমিও দেখিনি, মানিকও দেখেনি। আমি খেয়েছি পরের মুখে ঝাল। সাত নকলে আসল খাস্তা! মানিক শিব গড়তে বানর গ'ড়ে বসবে। ছবি দেখে মনোহরকে চেনাই যাবে না।

—ফলেন পরিচীয়তে সুন্দরবাবু, ফলেন পরিচীয়তে! অর্থাৎ ফলের দ্বারা চেনা যায় বৃক্ষকে। আসল তাৎপর্য্য হচ্ছে আকৃতির দ্বারা মানুষকে না চিনলেও তার ব্যবহারের দ্বারা তাকে চেনা যায় অনায়াসেই। বহু অভিজ্ঞতার ফলেই এইরকম এক-একটি প্রবাদ-বাক্য রচিত হয়, বুঝলেন মশায়?

—হুম, কিচ্ছু বুঝলুম না।

—তাহলে শ্রবণ করুন। পৃথিবীতে সেই জাতীয় মানুষের সংখ্যাই বেশী, যাদের আকৃতির মধ্যে থাকে না সুস্পষ্ট কোন বিশেষত্ব। হয়তো

তারা দেখতে সুন্দর, তবুও তারা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, হারিয়ে যায় জনতার গড্ডালিকা-প্রবাহের মধ্যে। কিন্তু আপনার মুখে বর্ণনা শুনে এটুকু বেশ বোঝা গেল, মনোহরবাবু ঐ শ্রেণীর সাধারণ মানুষের মতন নন। তাঁর মধ্যে একাধারে আছে একটি দুটি নয়, অনেকগুলো ক্যারেক্টারেস্টিক বা বিশেষত্বদ্যোতক লক্ষণ। যথা— উচ্চতায় সাধারণ, কিন্তু চওড়ায় অসাধারণ দেহ; মাথায় কাঁধ পর্য্যন্ত ঝুলে পড়া ধবধবে পাকা চুল, মুখেও লম্বা পাকা দাড়ী, বৃদ্ধ হ'লেও যুবকের মত সবল শরীর; চোখে কালো চশমা; সাদা পাঞ্জাবী, থান কাপড়, সাদা ক্যাম্বিসের জুতো; মুখে বা হাতে সর্বদাই বর্মা চুরোট, গম্ভীর মুখ ডান কপালে এক ইঞ্চি কাটা দাগ, হাতে মলাক্কা-বেতের রূপো-বাঁধানো লাঠি। একসঙ্গে এতগুলো বিশেষত্ব যদি ছবির মূর্তিতে ফোটে, তবে তা মনোহরবাবুর ফটোগ্রাফ না হলেও যে তাঁকে দেখেছে সেই-ই এই ছবি তাঁর ব'লে সনাক্ত করতে পারবে।

তবু সুন্দরবাবুর মন মানল না, তিনি বললেন, তুমি কেবল নিজের মন-গড়া কথাই বলছ, একটা প্রমাণও তো দিতে পারলে না।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, একটা কেন, অনেক প্রমাণই দিতে পারি।

—তাই নাকি? এদেশের কোন গোয়েন্দা যে এমন বর্ণনা শুনে প্রতিকৃতি এঁকে অপরাধী গ্রেপ্তার করেছে, আমি তো কখনো তা শুনিনি।

—এ-দেশের কথা শিকেয় তুলে রাখুন সুন্দরবাবু, এ-দেশের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। কিন্তু পাশ্চাত্য-দেশের গোয়েন্দারা অনেকবারই এমনি বর্ণনা-শুনে আঁকা প্রতিকৃতির সাহায্যে আসল অপরাধীকে বন্দী করতে পেরেছে।

সুন্দরবাবু বিস্ফরিত চক্ষে বললেন, বটে, বটে, বটে! আমি তা জানতুম না।

মানিক বললে, সুন্দরবাবু, আপনি অনেক কিছু আগেও

জানতেন না, এখনও জানেন না, আবার না জানালে ভবিষ্যতেও জানতে পারতেন না। তবু জানাতে গেলেই এত বেশী তর্ক করেন কেন বলুন দেখি!

সুন্দরবাবু দীপ্ত নেত্রে কেবল বললেন, হুম!

জয়ন্ত বললে, জানাজানি নিয়ে হানাহানি ছেড়ে দাও মাণিক। এখন বর্ণনা শুনে মনোহরের চিত্ররূপ আঁকবার চেষ্টা কর। কালই আমরা সুলতানপুরে যাত্রা করব।

তিন

সিদ্ধেশ্বরবাবুর চিঠি

সুলতানপুর খুব ছোট শহর হলেও তিনটি রেলপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত বলে লোকজনের সংখ্যা বড় অল্প নয়।

সহরের ভিতর দাঁড়িয়ে দেখা যায়, সুলতানপুরের বাইরে চারি-দিকেই প্রকৃতি যেন নিজের ভাণ্ডার উজাড় করে ছড়িয়ে দিয়েছে অজস্র সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য্য। সূর্যকিরণে ঝকমকে নদীর রৌপ্য-বাহু লীলায়িত ভঙ্গিতে ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে মরকত সবুজ দূর্বাক্ষেত্রের পর দূর্বাক্ষেত ; প্রান্তরের প্রান্তে দিকে দিকে ঘন নীল অরণ্যের জাফরি-কাটা যবনিকা আলো-ছায়ায় করছে ঝিলমিল ঝিলমিল, আর তাদের শিয়রে যক্ষপুরীর রহস্যময় অন্তঃপুরের জাগ্রত অথচ নিস্পন্দ প্রহরীর মত মাথাতুলে আছে সারিসারি শৈলশিখর। বনলক্ষ্মীর ছন্দ-সুন্দর বার্তা বহন করে শহরের ভিতর দলে দলে উড়ে আসে কলকণ্ঠ বিহঙ্গ এবং চন্দন শীতল সমীরণ থেকে থেকে এসে বলে যায় সঙ্গীতমধুর ভাষায়, কোন অজানা বনে অচেনা ফুল-ফোটার কাহিনী।

মানিক বলল, জয়ন্ত এমনি সব জায়গাতেই জন্মলাভ করে কবির কল্পনা।

জয়ন্ত বললে, কিন্তু আমরা কবি নই।

সুন্দরবাবু বললেন, আমরা ঠিক তার উল্টো। আমরা এখানে কাল্পনিক মিথ্যার সঙ্গে মিতালি করতে আসিনি, আমরা এসেছি বাস্তব সত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

ফাঁক পেলে মানিক ছাড়ে না। বললে, সত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে? সেকি সুন্দরবাবু, সত্য কি আপনার শত্রু?

সুন্দরবাবুর বদনমণ্ডলে ঘনিয়ে উঠেছিল অন্ধকার, কিন্তু জয়ন্ত তাড়াতাড়ি তার পক্ষ অবলম্বন করে বললে, না মানিক, সুন্দরবাবু বোধকরি বলতে চান, উনি এসেছেন সত্যের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

সুন্দরবাবুর মুখ তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হয়ে উঠল। তিনি বললেন, জয়ন্ত ঠিক ধরেছে। আমি তো এ কথাই বলতে চাই।

জয়ন্ত বললে, যাক্ ও কথা। সুন্দরবাবু, ঐ বাড়িখানা কি?

—পোষ্ট অফিস? যাবে নাকি?

—পরে বিবেচনা করব। কলকাতার বিখ্যাত চৌধুরী ব্যাঙ্কের একটা শাখা এখানে আছে না?

—হ্যাঁ। সেটি এখানকার প্রধান ব্যাঙ্ক।

—একবার সেই ব্যাঙ্কে যেতে চাই।

—কেন বল দেখি?

—সেখানে গেলেই বুঝতে পারবেন।

চৌধুরী ব্যাঙ্ক। দোতলায় উঠে দেখা গেল, একটি বিলাতী পোষাক পরা যুবক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রবল বাতাসে দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

তাকে দেখে মানিক বিস্মিত স্বরে বলে উঠল, একি, করুণা।

—আরে, মানিক নাকি? এখানে যে?

—এই ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে একটু দরকার।

—আমিই এখানকার ম্যানেজার।

—সে কি হে, কবে থেকে?

—মাস ছয়েক। তুমি তো আমাদের পাড়া আর মাড়াও না, জানবে কেমন করে। এঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও।

—ইনি হচ্ছেন সুন্দরবাবু—ডাকসাইটে পুলিশ কর্মচারী। ইনি হচ্ছেন আমার বন্ধু জয়ন্ত, আমার মুখে এর কথা তুমি অনেকবার শুনেছ। আর জয়ন্ত, এটি হচ্ছে আমার বাল্যবন্ধু করুণা ভট্টাচার্য্য। আমার মামারবাড়ীর পাশেই এঁদের বাড়ী।

করুণা বললে, আপনাদের মত মহাবিখ্যাতরা এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে কেন? আচ্ছা সে কথা পরে হবে, আগে আমার ঘরে এসে বসুন।

পাশেই ম্যানেজারের ঘর। সকলে আসন গ্রহণ করলে পর নিজেও টেবিলের সামনে গিয়ে বসে করুণা বললে, এইবার আপনাদের জন্যে কি করতে পারি আদেশ করুন।

জয়ন্ত সহাস্যে বললে, আদেশ-ফাদেশ কিছুই নয়। প্রথমেই বিনীত নিবেদন আছে। বলতে পারেন, সুলতানপুর ডাকঘরের এলাকার মধ্যে সবচেয়ে ধনী বাঙালী এমন কে আছেন, যিনি আপনাদের মক্কেল?

করুণা বললে, বিচিত্র প্রশ্ন। সুলতানপুর ডাকঘরের এলাকায় কিছু কিছু বাঙালী আছেন বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে একজন ছাড়া আর সকলেই সম্পন্ন গৃহস্থ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক।

—সেই একজন কি খুব ধনী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁকে ধনকুবের বলাও চলে হয়তো।

—তিনি কি আপনাদেরও মক্কেল?

—আমাদের একজন প্রধান মক্কেল।

—তিনি কোথায় থাকেন?

—এখান থেকে তিন মাইল দূরে আছে বেগমপুরা নামে একটি জায়গা। সেখান থেকেও মাইল দুয়েক তফাতে দস্তুরমত গহন বনের ভিতর আছে তাঁর বাংলোর ধরণে তৈরী মস্ত বাড়ী।

—অতবড় ধনী এমন নির্জন জায়গায় থাকেন কেন?

—শুনতে পাই তিনি ভারী খেয়ালী লোক।

—তার নাম কি ডাক্তার মনোহর মিত্র।

—আজ্ঞে না, তার নাম সিদ্ধেশ্বর সেন।

জয়ন্ত চুপ করে রইল গম্ভীর মুখে।

সুন্দরবাবু মুরুব্বিয়ানা চালে ঘাড় নাড়তেনাড়তে গলা-ভরা হাসি হেসে বললেন, তুমি আমার উপর টেক্কা মারবে বলে এখানে এসেছ; কিন্তু দেখছ তো ভায়া, আমি কোন পাথর ওল্টাতেই বাকি রাখিনি।

জয়ন্ত নিরুত্তর মুখে পকেট থেকে মানিকের আঁকা সেই ছবিখানা বার করে ধীরে ধীরে বললে, করুণাবাবু···এই ছবির মানুষটিকে কোন দিন কি আপনি স্বচক্ষে দর্শন করেছেন?

করুণা ছবির উপরে ঝুঁকে পড়ল। এবং তারপরই বিনা দ্বিধায় বলে উঠল, এই ছবির সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরবাবুর প্রতিকৃতি সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই।

জয়ন্ত অপাঙ্গে সুন্দরবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় হেঁট করে ফেললেন সুন্দরবাবু।

চার

কাঁচের কফিন

—করুণাবাবু, আপনাদের এই সিদ্ধেশ্বরবাবুর কথা আরো কিছু বলতে পারেন? জিজ্ঞাসা করল জয়ন্ত।

—একে আপনি মানিকের প্রাণের বন্ধু, তার উপরে আপনার মত লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ করবার সুযোগ পাওয়াও পরম সৌভাগ্য। আপনি কি জানতে চান বলুন।

—সিদ্ধেশ্বরবাবু কবে কত দফায় আপনাদের ব্যাঙ্কে কত টাকা জমা রেখেছেন?

করুণা স্তব্ধ হয়ে রইল অল্পক্ষণ। তারপর মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বললে, দেখুন এ রকম প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমাদের পক্ষে উচিত নয়, কারণ সিদ্ধেশ্বরবাবু হচ্ছেন আমাদের একজন প্রধান মক্কেল। কিন্তু আপনাদের কথা স্বতন্ত্র, বিশেষত সুন্দরবাবু হচ্ছেন একজন বিশিষ্ট রাজকর্মচারী। এক্ষেত্রে আমরা আদেশ পালন করতে বাধ্য। আপাততঃ আমার স্মৃতি থেকেই আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করব। দরকার হলে পরে টাকার পরিমাণ আপনাদের জানাতে পারি। শুনুন। সিদ্ধেশ্বরবাবু তাঁর বাংলো বাড়ি তৈরী হবার পর এ অঞ্চলে প্রথম আসেন প্রায় দুই বছর আগে। সেই সময়েই আমাদের ব্যাঙ্কে তিনি জমা রাখেন ছয় লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় বারে প্রায় বছর দেড়েক আগে তিনি এই ব্যাঙ্কে পনের লক্ষ টাকা জমা দেন। তৃতীয় বারে সেও বোধহয় দেড় বছরের কাছাকাছি,—সিদ্ধেশ্বরবাবুর কাছ থেকে আবার আমরা বারো লক্ষ টাকা পাই। অর্থাৎ মোট তেত্রিশ লক্ষ টাকা।

জয়ন্ত অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সুন্দরবাবুর দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললে,

শুনছেন? দ্বিতীয় আর তৃতীয় বারে সিদ্ধেশ্বরবাবু এখানে জমা দিয়েছেন যথাক্রমে পনেরো আর বারো লক্ষ টাকা। সুশীলা দেবী আর গোবিন্দবাবু কি যথাক্রমে পনেরো আর বারো লক্ষ টাকা নিয়েই নিরুদ্দেশ হননি।

সুন্দরবাবুও মৃদুস্বরে জয়ন্তের কানে কানে বললেন, কিন্তু প্রথম দফায় ছয় লক্ষ টাকা কোথা থেকে এল?

—জোর করে কিছু বলতে চাই না। খুব সম্ভব ওটা হচ্ছে সিদ্ধেশ্বরবাবুর নিজের টাকা।

করুণা বললে, আপনারা আর কিছু জানতে চান?

—সিদ্ধেশ্বরবাবুর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন?

—বিশেষ কিছুই জানিনা।

মানিক সুধালো, আচ্ছা করুণা বছরদেড়েক আগে কোন প্রাচীন মহিলা কি সিদ্ধেশ্বরবাবুর অতিথি হয়েছিলেন?

করুণা একটু ভেবে বললে, দেখ মানিক, বছর-দেড়েক আগেকার কথা আমি ঠিকঠাক জানিনা। তবে একথা শুনেছি বটে, বছর-দেড়েক আগে সিদ্ধেশ্বরবাবু একটি অতি-বৃদ্ধাকে নিয়ে সুলতানপুর ষ্টেশনে এসে নেমেছিলেন।

—তারই কিছুদিন পরে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোকও এখানে এসেছিলেন।

—এও আমার শোনা কথা মানিক, শুনেছি, সে ভদ্রলোকও গিয়েছিলেন সিদ্ধেশ্বরবাবুর বাড়িতে, কিন্তু—

—থামলে কেন, কিন্তু কি?

কিঞ্চিত ইতস্তত ক'রে করুণা বললে, ভাই মানিক, সিদ্ধেশ্বরবাবুর সম্বন্ধে অনেক কাণাঘুষোই শুনতে পাই। কিন্তু শোনা-কথা পরের কাছে প্রকাশ করতে ভয় হয়।

করুণার পৃষ্ঠদেশে একটি সাদরে চপেটাঘাত করে মানিক অতি-

ষোগভরা কণ্ঠে বললে, করুণা আমিও কি তোমার পর? কোন' ভয় নেই, তোমার শোনা-কথাই প্রকাশ কর।

করুণা বললে, শুনেছি, সিদ্ধেশ্বরবাবুর বাংলোয় একটি বৃদ্ধা নারী আর একটি বৃদ্ধা পুরুষ প্রবেশ করেছিলেন বটে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ তাঁদের প্রস্থান করতে দেখেনি। কেবল তাই নয়, তাঁরা যে এখনো ঐ বাংলোর ভিতর আছেন, এমন কোন প্রমাণও নেই।

—এ যে অসম্ভব কথা!

করুণা প্রায় আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠেই বললে, তুমি আমার বাল্যবন্ধু। তুমি জিজ্ঞাসা করেছো ব'লেই বলছি, সিদ্ধেশ্বরবাবুর ঐ রহস্যময় বাংলো সম্বন্ধে আরো যে সবঃকাণাকাণি শুনতে পাই তা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

—তোমার কথার অর্থ বুঝলুম না।

—লোকে বলে, ও বাংলো হচ্ছে ভূতুড়ে!

—কেন?

—ওখানে নাকি কাঁচের তুটো কফিনের মধ্যে···

—কাঁচের কফিন!

—হ্যাঁ। ওখানে নাকি কাঁচের তুটো কফিনের মধ্যে আছে একটি পুরুষ আর একটি নারীর মৃতদেহ।

সুন্দরবাবু চমকে উঠে প্রায় গর্জন করে বললেন, হুম! হুম!

ঠিক সেই সময়ে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল একজন ভৃত্য। সে বললে, সিদ্ধেশ্বরবাবু দেখা করতে এসেছেন।

সচমকে সকলে করলে দৃষ্টি-বিনিময়।

করুণা বললে, বেশ তাঁকে এখানে নিয়ে এস।

মিনিট-তুয়েক পরেই ঘরের দরজার কাছে সিদ্ধেশ্বরবাবুর আবির্ভাব। মানিকের আঁকা ছবির বারো-আনাই মিলে যায় তাঁর চেহারার সঙ্গে। ত্রস্তভাবে সকলের মুখের উপরে একবার বিদ্যুৎবেগে চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, করুণাবাবু, আপনার ঘরে আজ

অনেক অতিথি দেখছি। আমি জানতুম না, মাফ করবেন, আর একদিন আসব। বলতে বলতে সিদ্ধেশ্বরের অন্তর্ধান।

সুন্দরবাবু তাঁর দোদুল্যমান ভুঁড়িকে রীতিমত কাহিল করে তড়াক করে এক সুদীর্ঘ লম্ফ মেরে সচীৎকারে বললেন, পাকড়াও পাকড়াও! মনোহর মিস্তির লম্বা দিচ্ছে! ওকে গ্রেপ্তার কর! ওকে গুলি করে মারো!

জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে সুন্দরবাবুর কাঁধ চেপে ধরে কঠোর কণ্ঠে বললে, শান্ত হোন, সুন্দরবাবু শান্ত হোন! লম্ফঝম্ফ আর চীৎকার করে ভাঁড়ামি করবেন না। আসুন, দেখা যাক্ মনোহরবাবু এর পরে কি করেন!

তারপর ব্যাঙ্কের দরজায় গিয়ে দেখা গেল, রাস্তায় মনোহরবাবু তাঁর মোটর-বাইক চালিয়ে দিয়েছেন সবেগে।

সুন্দরবাবু বললেন, এখন আমরা কি করব? নীচে নেমে গিয়ে মোটরে চড়ে মনোহরের পশ্চাদ্ধাবন করতে পারি বটে, কিন্তু ততক্ষণে আসামী আমাদের নাগালের বাইরে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

করুণার দিকে ফিরে জয়ন্ত বললে, আপনি তো মনোহরবাবুর বাংলোয় যাবার রাস্তা জানেন?

—জানি।

—তাহলে কালবিলম্ব না করে আমাদের সঙ্গে আসুন। মনোহর-বাবু তো বাংলোখানা আরকফিন ছুটো কাঁধে করে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না। আগে দেখা যাক তাঁর বিরুদ্ধে কি কি প্রমাণ আছে, তারপর তাঁকে পুনরাবিষ্কার করতে আমার বেশীক্ষণ লাগবে না।

সকলে পুলিশ-লরির উপরে চড়ে বসল এবং সঙ্গে-সঙ্গে চলল কয়েকজন সামরিক-পুলিশ।

খানিকক্ষণ পরেই পিছনে প'ড়ে রইল সুলতানপুর এবং সামনে এগিয়ে এল ভূস্বর্গের বর্ণোজ্জ্বল দৃশ্য। আকাশ, পাহাড়, কানন, সূর্যকর ও লতা-পাতা-ফুল—এমনকি মৌমাছি, প্রজাপতি ও পতঙ্গ পর্যন্ত যেন চোখের সামনে ধরে রাখবার চেষ্টা করছে রামধনুর সাতটি

বর্ণমালা। ঝর ঝর ঝরণা ঝরছে শ্যামল শৈলের কোলে, সূর্য্যকিরণ তারও মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে রচনা করছে ইন্দ্রধনুর ছন্দ। জীবন প্রকৃতি যে বিচিত্র গীত-কবিতা শোনাতে চায় তার মধ্যেও আছেকত বিভিন্ন সুরের মাধুরিমা-বাতাসের গুঞ্জন, তরুপল্লবের মর্মর, কোকিলের কুহু-কুহু, ভ্রমরের গুণ-গুণ, তটিনীর কুল্ কুল্।

বেগমপুরও পিছনে গিয়ে পড়ল। সামনে এবার দুরারোহ পর্বত-মালার তলায় মাথা তুলে দাঁড়াল দুর্গম অরণ্য এবং তারই বক্ষ ভেদ করে অগ্রসর হয়েছে সর্পিল গতিতে একটি নাতি বৃহৎ পথ। সেই জনহীন পথে নীরবতার তন্দ্রাভঙ্গ করে ছুটে চলল মোটর-লরি।

মাণিক বললে, এমন জায়গাতেও মানুষ থাকে!

সুন্দরবাবু বললেন, মনোহর মানুষ নয়, সে অমানুষ। নিজের যোগ্য জায়গাই বেছে নিয়েছে। কিন্তু আমার খালি খালি এই কথাই মনে হচ্ছে জয়ন্ত কেমন করে সন্দেহ করলে যে সুলতানপুরের চৌধুরী ব্যাঙ্কের সঙ্গে মনোহরের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে?

জয়ন্ত হাসিমুখে বললে, আন্দাজ সুন্দরবাবু, আন্দাজ! আমার বিশেষ অটুট কোন যুক্তি নেই, আন্দাজেই ছুঁড়েছি অন্ধকারে ঢিল।

—হুম, আন্দাজটা কি শুনতে পাই না?

—গোড়া থেকেই আমার দৃঢ় ধারণা ছিল, মনোহরবাবু বাসা বেঁধেছেন সুলতানপুর ডাকঘরের এলাকার মধ্যেই। এও ধরে নিলুম যথাক্রমে পনেরো লক্ষ আর বারো লক্ষ টাকা নিয়ে সুশীলা দেবী আর গোবিন্দবাবু তাঁরই কাছে গিয়ে হয়েছেন নিরুদ্দেশ। সাতাশ লক্ষ টাকা হস্তগত করে নিশ্চয়ই তিনি নির্বোধের মত বাড়ীর ভিতরে রেখে দেবেন না। বাড়ীতে চোর-ডাকাতের ভয়, ওদিকে ব্যাঙ্কেরাখলে টাকা সুদে বাড়ে। তারপর ও টাকার কথা না হয় ছেড়েই দিলুম। মনোহরবাবুকে তিনি লিখেছিলেন, যতদিন না আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ততদিন আমরা এইখানেই বাস করব। কিন্তু মানুষের খাওয়া-পরার জন্যে দরকার হয় টাকার। টাকা আগাছার মতন আপনা-

আপনি মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে ওঠে না। নিজের ভরণপোষণের জন্ম মনোহরবাবু নিশ্চয়ই কিছু টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখবেন। সুতরাং কোন-না কোন দিক দিয়ে তাঁর সঙ্গে যে ব্যাঙ্কের সম্পর্ক আছে, এটা আমি আগে থাকতেই আন্দাজ করতে পেরেছিলুম। অবশ্য আন্দাজমাত্র।

সুন্দরবাবু তারিফ করে বললেন, বা রে আন্দাজ! বলিহারি!

করুণা বললে, ঐ সিদ্ধেশ্বর—অর্থাৎ মনোহরবাবুর বাংলো দেখা যাচ্ছে।

সুন্দরবাবু বললেন, হুঁ. মনোহরহীন মনোহরের বাংলোর ভিতর আছে হয়তো 'এয়ার টাইট' কাঁচের কফিনের মধ্যে দুটো বুড়ো-বুড়ির কতদিনের বাসি শুকনো মড়া! বাবা, একি রকম বাংলো! চারিদিকে ঘন জঙ্গল আর ঝোপঝাড়, উপর থেকে মাথার উপরে ঝাঁপ খাব বলে হুমড়ি খেয়ে আছে প্রকাণ্ড কালো পাহাড়। এ যেন হানাবাড়ী! গা ছম ছম করে ওঠে! মনোহরটা বোধহয় এখানে বসে শবসাধনা করত! সে মন্ত্র পড়ে দিলে রাত্রে মড়া দুটো জ্যান্ত হয়ে উঠত। এত কাঠ-খড় পুড়িয়েও তান্ত্রিক খুনীটাকে ধরতে পারলুম না, আমার এ আফসোস রাখবার ঠাঁই নেই! কপাল!

গাড়ি ফণী-মনসার বেড়া দিয়ে ঘেরা একখানা সুদীর্ঘ একতলা বাড়ির সামনেকার খোলা জমির উপরে গিয়ে দাঁড়াল।

॥ পাঁচ ॥

ষোড়শী ললিতা দেবী

সারি সারি ঘর। সামনে টানা চওড়া দালান। জঙ্গলের ভিতর থেকে ভেসে আসছে ঘুঘুর কান্না-সুর, তা ছাড়া আর কোথাও জন-প্রাণীর সাড়া নেই। এ যেন এক অপরিসীম বিজনতার রাজ্য! স্তব্ধতার মধ্যে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে সত্যসত্যই।

স্বভাবত উচ্চকণ্ঠে সুন্দরবাবুও সেখানে চেঁচিয়ে কথা কইতে

পারলেন না—সেখানে চীৎকার করাও যেন নিয়মবিরুদ্ধ। চুপিচুপি বললেন, মনোহরের লোকজনেরাও কি আমাদের গাড়ির সাড়া পেয়ে চম্পট দিয়েছে?

—অসম্ভব নয়। দেখা যাক্। এই বলে জয়ন্ত অগ্রসর হয়ে দালানে গিয়ে উঠল—তার পিছনে পিছনে চলল আর সকলে। নিজের পায়ের শব্দে তারা নিজেরাই চমকে উঠতে লাগল।

দালানের উপর দাঁড়িয়ে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল জয়ন্ত। তারপর সামনে একটা ঘরের দিকে সোজা এগিয়ে গেল—

এবং সঙ্গে সঙ্গে সুগম্ভীর কণ্ঠে শোনা গেল—ওদিকে নয়, ওদিকে নয়, এদিকে আসুন—আপনাদের বাঁ দিকের শেষ ঘর।

সচকিত প্রাণে সকলে একসঙ্গে ফিরে দাঁড়াল বিদ্যুতের মত।

সুন্দরবাবু এতক্ষণ দেখতে পাননি—বাঁ দিকের শেষ ঘরের পর্দা দেওয়া দরজার দুই পাশে দাঁড় করানো রয়েছে দুটো সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নরকঙ্কাল!

আঁৎকে উঠে অস্ফুট কণ্ঠে তিনি বললেন, আর নয়, এইবেলা স'রে পড়ি এস! মড়ার হাড় এখানে কথা কয়!

সেই কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ভয় নেই! ও দুটো হচ্ছে রক্তমাংস-হীন কঙ্কাল মাত্র। নির্ভয়ে ঘরের ভিতর আসুন। গম্ভীর কণ্ঠস্বর। কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে যেন ব্যঙ্গের আভাস।

আকস্মিক কণ্ঠস্বর শুনে জয়ন্ত কেবল বিস্মিত হয়েছিল, তার মনে কোনদিনই ছিল না ভয়-ডরের বাসা। সে এগিয়ে গেল দৃঢ়পদে।

ঘরের ভিতর থেকে কে বললে, পর্দা ঠেলে প্রবেশ করুন।

দুই হাতে দুই দিকে পর্দা সরিয়ে জয়ন্ত ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল।

সামনেই একখানা ইজি-চেয়ারের উপরে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় স্বয়ং মনোহর মিত্র।

এ দৃশ্য একেবারেই অপ্রত্যাশিত। হতভম্ব হয়ে গেল জয়ন্ত পর্যন্ত।

মনোহরের গম্ভীর মুখের ওষ্ঠাধরের উপরে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল যেন একটুখানি হাসির ঝিলিক। তিনি বললেন, আমি পালাইনি দেখে অবাক হচ্ছেন! অবাক না হলেও চলবে। আপনারা শুভাগমন করবেন জেনেই আমি এখানে আপনাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে অপেক্ষা করছি। আপনারা দয়া করে আসন গ্রহণ করুন, এখানে আসনের অভাব হবে না।

পিছন দিক থেকে সুন্দরবাবু ব'লে উঠলেন, হুম! ছদ্ম-নামের আড়ালে যে লোক তেত্রিশ লাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছে, তার বাড়িতে আসনের অভাব হবে না, আমি তা জানি।

মনোহরের একটুও ভাবান্তর হ'ল না। খুব সহজ, স্থির কণ্ঠে তিনি বললেন, নানা কারণে অনেক সময়ে আত্মগোপন করবার দরকার হয় অনেকেরই—এমন কি আপনাদেরও।

—আমরা মাঝে মাঝে আত্মগোপন অর্থাৎ ছদ্মবেশ ধারণ করি অসাধুদের শাস্তি দেবার জন্যে। কিন্তু তুমি?

কালো চশমার আড়ালে মনোহরের দুই চক্ষু ক্রোধে দীপ্ত হয়ে উঠল কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর হয়ে উঠল অত্যন্ত কঠিন। ধীরে ধীরে তিনি বললেন, আমি মহাশয়ের চেয়ে বয়সেও বড়, বিদ্যা-বুদ্ধি মান-সম্ভ্রমেও বোধহয় ছোট নই। আমাকে 'তুমি' ব'লে সম্বোধন ক'রে ভদ্রতার অপমান না করলেই বাধিত হব। আপনারা অসাধুদের দণ্ড দেবার জন্যে ছদ্মবেশ ধারণ করেন কেমন, তাহ'লে জানবেন, আমি ছদ্মনাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি, মনুষ্যজাতির মঙ্গলের জন্যে।

সুন্দরবাবু টিট্‌কারি দিয়ে বলে উঠলেন, ও হো হো! মনুষ্যজাতির মঙ্গলের জন্যে ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন বিংশ শতাব্দীর অভিনব যীশুখৃষ্ট। তাই তিনি সুশীলাদেবী আর গোবিন্দবাবুকে হত্যা ক'রে কাঁচের কফিনে পুরে রেখে দিয়েছেন। তাই তিনি ঐ দুই হতভাগ্যের

কাছ থেকে সাতাশ লক্ষ টাকা অপহরণ করে ধরা পড়ার ভয়ে ছদ্ম-নামের আশ্রয়ে ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছেন। এরপর কি করা উচিৎ বলুন দেখি? আপনাকে সাধুবাদ দেব না হাতকড়ি আনবার হুকুম দেব?

একটুও বিচলিত না হয়ে স্থির কণ্ঠে মনোহর বললেন, লোকে আমাকে অপবাদ দেয়--আমি নাকি হাসতে জানিনা। কিন্তু আপনার কথা শুনে আজ আমার মনেপ্রাণে অট্টহাস্য করবার ইচ্ছে হচ্ছে। সুশীলাদেবী আর গোবিন্দবাবুকে হত্যা করেছি? কোন প্রত্যক্ষদর্শী আপনার কানে কানে এই অপূর্ব খবরটি দিয়ে গিয়েছেন?

—দেখুন, ধাপ্‌পা দিয়ে আপনি আমাকে গুলোবার চেষ্টা করবেন না। বলতে পারেন সুশীলাদেবী আর গোবিন্দবাবু আজ কোথায়?

—তাঁরা এই বাড়ীতেই আছেন।

—হ্যাঁ, কাঁচের কফিনের ভিতরে!

—বারবার কাঁচের কফিন বলে চীৎকার করবেন না। আমার বাড়ীতে কফিন ব'লে কোন জিনিসই নেই।

—বটে, বটে,—হুম! এখানে কাঁচের কফিন আছে কি না আছে সেটা খানাতল্লাস করলেই জানতে পারা যাবে।

এতক্ষণ পরে মনোহর হঠাৎ সিধে হয়ে উঠে ব'সে বললেন, কাঁচের কফিনের কথা ছেড়ে দিন। আপনি আগে জীবন্ত অবস্থায় কাকে দেখতে চান? সুশীলাদেবীকে না গোবিন্দবাবুকে?

সুন্দরবাবু প্রথমটা থতমত খেয়ে গেলেন। তারপর বাধো-বাধো গলায় বললেন, কোথায় সুশীলাদেবী? আগে তাঁকেই দেখতে চাই।

—উত্তম! বলেই মনোহর গলা চড়িয়ে ডাকলেন, সুশীলা, সুশীলা! বাড়ির ভিতর থেকে গানের মতন একটি আওয়াজ শোনা গেল—

—আজ্ঞে! কি বলছেন?

—তুমি একবার এই ঘরে এস তো মা।

ঘরের ভিতরকার একটি দরজার পর্দা ঠেলে আত্মপ্রকাশ করল যে আশ্চর্য রূপবতী ও মহিমাময়ী মূর্তি, তাকে দেখবার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না। এ মূর্তি যে মাটির পৃথিবীর, স্বচক্ষে দেখে কেউ তা বিশ্বাস করতে পারলে না, মনে হ'ল সে যেন কোন অজানা স্বর্গের অবাস্তব স্বপ্ন। পৌরাণিক কাব্যে যে সব উর্ব্বশী, রম্ভা, মেনকা ও তিলোত্তমা প্রভৃতির কাল্পনিক বর্ণনা পাঠ করা যায়, এই মূর্তির তাজা রূপমাধুরীর কাছে ম্লান হয়ে যায়, সে সব বর্ণনাও! ষোড়শী কি বালিকা, একে দেখলে ভালো ক'রে তাও বোঝা যায় না।

বিপুল বিস্ময়ে জয়ন্ত ব'লে উঠল, উনিই কি সুশীলাদেবী?

মনোহর বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু এখন থেকে ইনি নতুন নামে আত্ম-পরিচয় দেবেন।

—নতুন নাম?

—হ্যাঁ, ললিতা দেবী

॥ ছয় ॥

মাতৃভাষার দৌড়

সুন্দরবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বললে, হুম! উনি ললিতাদেবী বা পলিতা দেবী হ'তে পারেন, কিন্তু ইনি সুশীলাদেবী নন।

—কেন বলুন দেখি?

—সুশীলাদেবীর বয়স প'চাত্তর বৎসর।

—ঠিক। কিন্তু এখন তাঁর বয়স প'চাত্তর না হলেও তিনি আর বৃদ্ধা নন।

—পাগলের মতন কি আবোল-তাবোল বকছেন!

—সুশীলাদেবী নবযৌবন লাভ করেছেন।

—শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা করবেন না মনোহরবাবু!

—কেন, প্রাচীনা কি আবার নবীনা হ'তে পারে না?

—অসম্ভব! জরার পর মৃত্যু, জরার পর আর যৌবন নেই।

—বিজ্ঞানের মহিমায় সবই সম্ভবপর হয়। আমি ভবিষ্যবাণী করছি, বিজ্ঞান একদিন মানুষকে অমর করবে।

—আপনার ঐ নির্বোধের স্বর্গে আমাদের টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না। হয় কাজের কথা বলুন নয়—

—নয়?

—নয় থানায় চলুন।

—বেশ, তবে কাজের কথাই শুনুন। মনোহর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, মা সুশীলা।

—বাবা!

এ কী মানুষের কণ্ঠস্বর, না বীণার ঝঙ্কার!

—তুমি এখন বাড়ীর ভিতরে যাও। এই ভদ্রলোকদের জন্যে একটু চা-টা পাঠিয়ে দাও।

সুন্দরবাবু ব্যস্তভাবে সভয়ে ব'লে উঠলেন, না-না, এখানে আমরা চা-টা খেতে আসিনি।

—ভয় নেই, আপনাদের চা-এ কেউ বিষ মিশিয়ে দেবে না।

—বিষ থাক্ আর না থাক, এখানে চা আর টা কিছুই খাওয়া চলতে পারে না।

—আপনাদের সকলেরই কি এক মত?

জয়ন্ত বললে, আমার অন্য মত। আমি চা-টা সব খাব। কি বল মানিক!

—আমিও তোমার দলে।

—করুণাবাবু কি বলেন?...পরমা সুন্দরী সুশীলা—ওঁকে কি দেবী ব'লে ডাকব মনোহরবাবু!

—ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।

আবার বাজল সেই অমৃতায়মান কণ্ঠস্বরের মোহনীয় বীণারেণু।

—বাবার কাছে আমি সুশীলা॥ কিন্তু আপনারা তো সেই সুশীলাকে দেখেননি, আপনারা আমাকে ললিতা বলেই ডাকুন।

জয়ন্ত বললে, বেশ। করুণাবাবু, এই পরমা সুন্দরী ললিতাদেবী যদি তাঁর সুন্দর হাত দিয়ে সুন্দর চা তৈরী করে দেন, তাহলে সুন্দর-বাবুর মত আপনিও কি তা পান করবেন না?

—করব না, বলেন কি? আমি তো নির্বোধ নই।

—সুন্দরবাবু, আপনি কিএখনো মতবদলাবেন না? মনে রাখবেন চায়ের সঙ্গে আবার 'টা'।

সুন্দরবাবু জুল-জুল ক'রে জয়ন্তের মুখের পানে তাকিয়ে বললেন, কি আর করি বল! তোমরা সবাই যখন রাজি, তখন আমার আর এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় কেন? আমিও রাজি।

ললিতাদেবীর গোলাপ-পেলব ওষ্ঠাধরে ফুটল যে মিষ্টি হাসিটুকু তাও যেন নীরব সঙ্গীতের মত সুন্দর। একটি নমস্কার করে পাশের ঘরে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন জীবন্ত স্বপ্ন-প্রতিমার মত।

মনোহর গম্ভীর স্বরে বললেন, শুনুন সবাই। জরার কারণ কি, মানুষ যে তা জানে না একথা সত্য নয়। বরং এই কথাই সত্য যে, জরার কারণ তার কাছে অজ্ঞাত, এইটুকু জানেনা সে।

সুন্দরবাবু মুখভঙ্গি করে বললেন, বাবা, এ যে হেঁয়ালি!

—এ-সব সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক ব্যাপার আপনাদের যে কেমন করে বোঝাব তা বুঝতে পারছি না। রেডিও এ্যাকটিভ বস্তু কাকে বলে জানেন?

জয়ন্ত বললে, জানি। আমাকেও মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতে হয়, যদিও তা ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়।

সুন্দরবাবু বললেন, বিজ্ঞানেআমি একেবারে মা। বাংলায়বুঝিয়ে দিতে পারেন?

—ইংরাজী তো পদে আছে, বাংলায় শুনলে একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাবেন।

—তাও কখনো হয়? বাংলা আমাদের মাতৃভাষা।

—আমাদের মাতৃভাষার অভিধানে রেডিওএ্যাকটিভ-এর অর্থ এই

ভাবে বোঝান হয়েছে: আশুবিকিরণ দ্বারা বিদ্যুৎমাপক প্রভৃতির উপর ক্রিয়াকরণক্ষম; (রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম, পলানিয়াম প্রভৃতি সম্পর্কে কিরণবিকিরণক্ষম।) কি বুঝলেন বলুন?

সুন্দরবাবু বললেন, ব্যাপার বুঝব কি, আরো গুলিয়ে গেল। মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে! এইজন্যেই কি কবি গান বেঁধেছেন—'আ মরি বাংলা ভাষা'।

—বাংলা ভাষার দোষ নেই সুন্দরবাবু, তবে বাংলা ভাষায় এখনো ভালো করে বিজ্ঞানকে পরিপাক করবার চেষ্টা হয়নি, কারণ দেশ এতদিন স্বাধীন ছিল না। যাক ও কথা। যতটা সংক্ষেপে পারি কিছু কিছু বোঝাবার চেষ্টা করি। অনেক পরীক্ষার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, সারাজীবন ধ'রে আমাদের দেহের ভিতর যে রেডিওএ্যাকটিভ বস্তু জমে ওঠে (অর্থাৎ-যাকে বলে ক্রমিক রেডিয়াম বিশ্বসঞ্চার) জরার করণ হচ্ছে তাই-ই। সূর্যের দ্বারা পৃথিবীর উপরে প্রতিদিনই রেডিয়াম নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। আমরা তা খাচ্ছি, আমরা তা পান করছি, নিশ্বাস দিয়ে বাতাস থেকে তা আকর্ষণ করছি। তারই ফলে প্রত্যেক জীব আর তরুলতাও ধীরে ধীরে জরাগ্রস্ত হয়। সেই জরা-ব্যাধি নিবারণ করবার উপায় আমি আবিষ্কার করেছি!

সুন্দরবাবু দুই চোখ ছানাবড়ার মতন করে বললেন, বলেন কি মশাই!

—আজ্ঞে হ্যাঁ! ক্যালসিয়াম থেকে দেহের হাড় তৈরী হয়। রসায়ন শাস্ত্রের দিক থেকে রেডিয়াম কাজ করে ক্যালসিয়াম-এর মত। গঠন-কার্যে যেখানে ক্যালসিয়াম-এর পরমাণুর দরকার হয়, সেখানে রেডিয়াম পরমাণু ব্যবহার করলে দেহের রক্তস্রোত তা না জেনেই গ্রহণ করে। রেডিয়াম বিষের দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্ষা করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, তাদের দেহের ভিতর থেকে এই রেডিয়াম পরমাণুগুলিকে বিতাড়িত করা।

জয়ন্ত বললে, সেটা কি অসম্ভব ব্যাপার নয়?

—প্রথম দৃষ্টিতে অসম্ভব ব'লে মনে হয় বটে। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা যায়, মোটেই তা নয়। জরাব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের হাড়ের ভিতর থেকে বিপদজনক রেডিয়াম পরমাণুগুলোকে বাইরে বার ক'রে দেওয়া অসম্ভব নয় মোটেই। প্রথমে রোগীকে এমন 'ভিনিগার' ও 'অ্যাসিড' জাতীয় পথ্য দিতে হবে, যাতে করে তার দেহের হাড়-গুলো ক্যালসিয়াম থেকে মুক্ত হয়। এক হপ্তার পর রোগীকে আমি আবার এক হপ্তা ধরে স্বাভাবিক পথ্য দিই বটে কিন্তু সেই সঙ্গে এদিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখি যে, খাদ্যের ভিতর যে খাঁটি ক্যালসিয়াম থাকে তার মধ্যে কিছুমাত্র রেডিওএ্যাকটিভিটি বর্তমান নেই। প্রথমে যে 'ভিনিগার' ও অন্যান্য অ্যাসিডের পথ্য দেওয়া হয়, দেহের ক্ষতি-সাধন করবার ক্ষমতা তাদের অপেক্ষাকৃত কম। ঐ পথ্যের 'পরমাণুর গ্রহণশক্তি' বা ভেলান্স আছে। তাই ঐ পথ্যের আকর্ষণে আসল ক্যালসিয়াম-এর সঙ্গে দেহের ভিতর উড়ে এসে জুড়ে বসা রেডিয়াম ক্রমে ক্রমে বাইরে বেরিয়ে যায়। স্বাভাবিক পথ্যের পর দিই আবার 'অ্যাসিড' জাতীয় পথ্য। তারপর আবার স্বাভাবিক পথ্য। এই ভাবে চিকিৎসা চলে মাসের পর মাস।

জয়ন্ত চমৎকৃত হয়ে বললে, এই চিকিৎসার ফলেই জরাগ্রস্ত রোগী আবার ফিরে পায় তার নবযৌবন?

—প্রায় তাই বললেও চলে। তবে উপসর্গও যে দেখা দেয় না, তা বলা চলে না। যেমন ঐ 'কাঁচের কফিন' ব্যাপারটা। সুন্দরবাবু কাঁচের কফিনের উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু সেটা যে কি পদার্থ আপনারা কেউ তা জানেন না। দেখতে চান তো আমার সঙ্গে আসুন।

সাত

মানুষ-'গুটিপোকা'

মনোহরের সঙ্গে সকলে এসে উপস্থিত হ'ল প্রকাণ্ড একখানা হল-

ঘরে। তার অধিকাংশ জুড়ে বিরাজ করছে নানান রকম যন্ত্রপাতি। যাঁরা কোন কলেজের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার দেখেছেন, তাঁদের কাছে ও-সব যন্ত্রের কয়েকটি পরিচিত বলে মনে হবে।

কোথাও একাধিক বান্‌সেন-এর (অত্যন্ত তপ্ত উত্তাপসঞ্চারক প্রদীপবিশেষ) উপরে টগবগ করে ফুটছে ষ্টিল বা আধোযন্ত্রগুলো কোথাও সারি সারি কীলক থেকে ঝুলছে কন্‌ডেনসার বা সংহিত-যন্ত্র। কিন্তু এখানে-ওখানে-সেখানে আরো যে-সব ছোটবড় বৈদ্যুতিকযন্ত্র রয়েছে, সাধারণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে সেগুলোকে দেখা যায় না।

সুন্দরবাবু আবার 'হুম' শব্দটি উচ্চারণ করে বললেন, মনোহরবাবু এতক্ষণ কানে যা শুনলুম তার একবর্ণও বুঝতে পারলুম না। এখন চোখে যা দেখছি তাও ভাল করে বুঝতে পারছি না। আপনি বোধ-হয় আবার লেকচার সুরু করবেন। কিন্তু তার আগে আমার গোটাকয়েক সহজ প্রশ্নের জবাব দেবেন?

—আজ্ঞা করুন।

—আপনি এইসব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা তো কলকাতায় বসেই করতে পারতেন? মিথ্যে এত লুকোচুরি কেন?

—কলকাতার কৌতুহলী জনতা যদি ঘুণাক্ষরেও আমার পরীক্ষার ব্যাপার টের পেত, তাহলে আমার বাড়িটি পরিণত হ'ত সরকারি বাগানে আর সেখানে উঁকিঝুঁকি মারতে আসত রাম-শ্যাম-যদু-মধু সকলেই। তার পরেও আমি কি আর নির্বিঘ্নে পরীক্ষা চালাবার অবসর পেতাম?

—সে কথা ঠিক। কিন্তু সুশীলাদেবী আর গোবিন্দবাবু, কারুকে কিছু না জানিয়ে আপনার সঙ্গে অমন চোরের মতন পালিয়ে এসে-ছেন কেন?

—তারও প্রথম কারণ হচ্ছে মন্ত্রগুপ্তি। দ্বিতীয় কারণ গুরুতর।

—সুশীলাদেবী আর গোবিন্দবাবু নতুন দেহ লাভ করবার পর ইহজীবনে আর নিজের নিজের বাড়িতে ফিরবেন না বোধহয়।

—সে কি মশাই!

—হ্যাঁ। সেইজন্যই সুশীলা আজ ললিতা নাম ধারণ করেছে।

—কিন্তু কেন, কেন?

—নূতন দেহে অতি-প্রাচীনা সুশীলাকে কেউ কি চিনতে পারত?

—তা তো পারতই না—হুম!

—সুশীলার কথা কেউ কি বিশ্বাস করত?

—তা তো করতোই না—ঠিক!

—তাকে নিয়ে আমরা নানারকম গণ্ডগোল—এমন কি মামলা-মোকদ্দমা হবারও সম্ভাবনা ছিল না কি?

—তা তো ছিলই—হ্যাঁ!

—আরো নানা দিক দিয়ে সুশীলার জীবন হয়ে উঠত ভয়াবহ! সেইজন্যে সে স্থির করেছিল আমার পরীক্ষা সফল হ'লে নতুন দেশে নতুন নামে নতুনভাবে জীবনযাপন করবে। গোবিন্দবাবুর সম্বন্ধেও ঐ এক কথা।

—সুশীলাদেবী আর গোবিন্দবাবু অত টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন কেন? আর সে-সব টাকা আপনার নামেই বা জমা আছে কেন?

—নতুন দেশে নতুন নামে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে হ'লে প্রথমেই দরকার টাকা। সে টাকা আসবে কোথা থেকে? নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্যেই সুশীলাদেবী আর গোবিন্দবাবু উচিতমত টাকা সঙ্গে করেই এখানে এসেছেন। ওঁদের টাকা আমার ছদ্মনামে জমা রেখেছি কেন? আমি জানতুম পুলিশ ওঁদের খোঁজ করবে। ওঁদের নামে টাকা জমা রাখলে পুলিশ ওঁদের সন্ধান পেত। আর কোন প্রশ্ন আছে?

—আর একটি প্রশ্ন। যদিও ললিতাদেবীই সুশীলা কিনা সে

খটকা আমার মন থেকে এখনো দূর হয়নি তবু ওটা আপাতত ধামা-চাপাই থাক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, গোবিন্দবাবু কোথায়?

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মনোহর ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, জয়ন্তবাবু, যে উপসর্গের কথা বলছিলুম এইবারে সেটা দেখবেন আসুন।

মনোহর এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল একখানা খাটের পাশে। সেখানে শয্যার উপরে যে শায়িত মূর্তিটি ছিল তাকে দেখেই সকলের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল পরম বিস্ময়ে।

একটি অতি তরুণ অপূর্ব-সুন্দর মূর্তি—বালক বললেও চলে। সুগঠিত, শুভ্র, নগ্ন দেহ—যেন গ্রীক-ভাস্করের হাতে গড়া। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, সর্বাঙ্গ তার কাঁচ দিয়ে মোড়া এবং সেই কাঁচ যেন কেউ গলিয়ে এমনভাবে মূর্ত্তির উপরে ঢেলে দিয়েছে যে সারা দেহের সঙ্গে তা অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হয়ে আছে।

মনোহর বললেন, সুন্দরবাবু, এই আপনার 'কাঁচের কফিন'।

—হুম! কিন্তু কাঁচের কফিনের ভিতর ওটা কি রয়েছে? রঙিন মোমের পুতুল? না মৃতদেহ?

—আরো কাছে গিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন।

—না, ওটা মোমের পুতুলও নয়, মৃতদেহও নয়। ও যে জীবন্ত; ওর সর্বাঙ্গে যে জীবনের রং, জীবনের আভাস। এমন কি দুই মুদিত চোখের পাতাও থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

মনোহর বললেন ও এখনো ঘুমুচ্ছে, কিন্তু ওর ঘুম ভাঙতে আর বেশী দেরী নেই।

জয়ন্ত শুধোলো, আসল ব্যাপারটা কি মনোহরবাবু?

—আমি নিজেই জানি না। ঐ কাঁচের আবরণী আমার সৃষ্ট নয়! পর্য্যায়ক্রমে ক্যালসিয়াম পথ্য দিয়ে আবার তা বন্ধ ক'রে বেশ কিছুকাল চিকিৎসা চলবার পর রোগী হঠাৎ দীর্ঘকালব্যাপী নিদ্রা-ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আর তার সর্বাঙ্গ ব্যেপে দেখা দেয় ঐ

কাঁচের আবরণ! কিছুকাল পরে আবার রোগীর ঘুম ভাঙে, কাঁচের আবরণ ফেটে যায়, তারপর উঠে বসে তার জাগ্রত মূর্তি! এর অর্থ আমিও জানি না।

সুন্দরবাবু হতভম্বের মত বললেন, বাবা এ যে মানুষ-গুটিপোকা!

মানিক শুধোলো, ও মূর্ত্তিটি কার?

—গোবিন্দবাবুর।

—তার বয়স তো সত্তর বৎসর!

—সুশীলার বয়সও ছিল পঁচাত্তর বৎসর।

সকলে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল।

সুশীলার প্রবেশ। সেই সুমধুর কণ্ঠে সে বললে, বাবা ও ঘরে খাবার দেওয়া হয়েছে।

মনোহর এতক্ষণ পরে একটু হেসে বললেন, চলুন। এই বিজনে বসে আপনারা খাবারের মধ্যে কোন বিশেষত্ব পাবেন না।

সুশীলা বললে, বাড়িতে যা ছিল তাই দিয়েছি। স্যাণ্ডউইচ শিক্‌কাবাব, রুটি-মাখন, চা আর মিষ্টান্ন।

মানিক বললে, ললিতাদেবী, চায়ের বৈঠক যে ভুরি ভোজনের আসরে পরিণত হ'ল। এই বিজন বনে শিক্‌কাবাব বানালেন কি দিয়ে! বাঘের মাংস দিয়ে নয় বোধহয়!

—খেলেই বুঝতে পারবেন।

—আসুন সুন্দরবাবু।

—ভায়া আজকে যা দেখলুম আর শুনলুম, আমার পিলে অত্যন্ত চমকে গিয়েছে। খাওয়ার চিন্তা মোটেই জাগছে না।

—আপনার পিলে নির্বোধ নয়। একখানা স্যাণ্ডউইচ উদরাসাৎ করলেই সে আবার অত্যন্ত শান্ত হয়ে পড়বে। আপনার ধাত জানতে আমার বাকি নেই। চলুন, 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করে আসি। জয় হিন্দ!

—

নেতাজীর ছয় মূর্ত্তি

অসাধারণ পাগলামি

চায়ের পালা শেষ!

জয়ন্ত বললে, মানিক, অতঃপর কিংকর্তব্য? এক চাল দাবাবোড়ে খেলবে নাকি?

—রাজি। মানিক উঠে দাবা-বোড়ের ছক আনতে গেল।

—সুন্দরবাবু কি করবেন? খেলা দেখবেন, না থানায় ফিরবেন?

—ঐ ইজি-চেয়ারে আরাম ক'রে পা ছড়িয়ে শুয়ে আমি একটা গোটা চুরুটকে ভস্মে পরিণত করব।

—হাতে বুঝি নতুন মামলা নেই!

—বিশেষ কিছু নয়।

—তবু শুনি না। ঘুঁটি সাজাতে সাজাতে বলল জয়ন্ত।

—এ একটা নিতান্ত বাজে মামলা ভাই, ল্যাজা কি মুড়ো কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। এ মামলায় গোয়েন্দা না ডেকে ডাক্তার ডাকা উচিত।

—অর্থাৎ?

—পাগলামি আর কি! কিন্তু অদ্ভুত রকম পাগলামি! সুভাষ চন্দ্র বসুকে সারা দেশ ভক্তি করে তো? কিন্তু দেশে এমন লোকও আছে, যে নেতাজীর প্রতিমূর্তি দেখলেই ক্ষেপে গিয়ে আছড়ে চুরমার ক'রে দেয়!

—ধ্যেৎ, ও নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই।—জয়ন্ত একটা বোড়ের চাল দিলে।

—হ্যাঁ, পাগলামি সারাবার জন্যে ডাক্তার ডাকা উচিত। কিন্তু কেউ যদি নেতাজীর উপরে নিজের আক্রোশ মেটাবার জন্যে পরের

বাড়ীতে ঢুকে নেতাজীর প্রতিমূর্তি চুরি করে, তাহ'লে পুলিস না ডেকে উপায় থাকে না।

জয়ন্ত খেলা ভুলে সিধে হয়ে ব'সে বললে, মূর্ত্তি ভাঙার জন্যে মূর্ত্তি চুরি! ব্যাপারটা চিত্তাকর্ষক ব'লে মনে হচ্ছে! বলুন তো খুলে।

—চিৎপুর রোডে 'শিল্পকলা' ব'লে একটা দোকান আছে, তার মালিক হচ্ছেন অনিল বসু। ওখানে বিক্রি হয় নানা রকম ছবি আর মূর্ত্তি। দোকানের এক কর্মচারী সামনের দিক ছেড়ে পিছন দিকে গিয়ে কোন কাজে ব্যস্ত ছিল, হঠাৎ একটা লোক দোকানে ঢুকে কাউণ্টারের উপর থেকে নেতাজীর প্রতিমূর্ত্তি তুলে নিয়ে মাটির উপর আছড়ে ভেঙে টুকরো-টুকরো ক'রে ফেলে। তারপর এত তাড়াতাড়ি সে পালিয়ে যায় যে কেউই তাকে ধরতে পারেনি। এ হচ্ছে চার দিন আগেকার কথা। দোকানের মালিক 'বিটে'র পাহারাওয়ালার কাছে অভিযোগ ক'রেছিলেন বটে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত! প্লাষ্টারে গড়া মূর্ত্তির দাম দশ টাকা মাত্র। তুচ্ছ ব্যাপার!

তারপর দ্বিতীয় ঘটনা। এটা কিঞ্চিৎ গুরুতর, আর অদ্ভুতও বটে। ঘটেছে কাল রাত্রে।

ডাক্তার চারু চক্রবর্তীর নাম শুনেছ তো। তার বাস-ভবন হচ্ছে সিমলায়, আর ডাক্তারখানা কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে। তিনি নেতাজীর গোঁড়া ভক্ত। ঐ 'শিল্পকলা' থেকেই তিনি নেতাজীর দুটি প্রতিমূর্তি কিনেছিলেন। তার একটিকে রেখেছিলেন বসত-বাড়ীতে, আর একটিকে ডাক্তারখানায়। কাল রাত্রে তার বাড়ীতে চোর ঢুকেছিল, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সে নেতাজীর মূর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই চুরি করেনি। বাড়ীর বাইরেকার বাগানে গিয়ে মূর্ত্তিটা দেওয়ালে আছড়ে ভেঙে সে লম্বা দিয়েছে।

জয়ন্ত চমৎকৃত হয়ে বললে, আজব কাণ্ড! তিনটে মূর্ত্তিই কি এক ছাঁচ থেকে গড়া?

—হ্যাঁ। তারপর শোনো। আজ সকালে চারুবাবু ডাক্তারখানায়

ঢুকে দেখেন, সেখানেও কাল রাত্রে কে এসে নেতাজীর মূর্ত্তি নিয়ে ভেঙেছে আর মেঝের উপরে ছড়িয়ে প'ড়ে রয়েছে তার ভাঙা টুকরো-গুলো! এই তো ব্যাপার জয়ন্ত। এ-কি মামলা ভায়া?

—কেবল অদ্ভুত নয়, সৃষ্টিছাড়া বলাও চলে। কিন্তু লোকটা যদি পাগল হয়, তাহ'লে তার পাগলামির ভিতর বেশ একটা পদ্ধতি আছে দেখছি।

—পদ্ধতি?

—হ্যাঁ। চারুবাবুর বাড়ি থেকে মূর্ত্তিটা সে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল, পাছে মূর্ত্তি-ভাঙার শব্দে বাড়ির লোকের ঘুম ভেঙে যায় এই ভয়ে। কিন্তু ডাক্তারখানায় অন্য লোকের ভয় নেই, তাই মূর্ত্তিটা ভাঙা হয়েছে ঘরের ভিতরেই। ঘটনাগুলো আপাতত অকিঞ্চিতকর ব'লেই মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু জানেন তো সুন্দরবাবু, গোয়েন্দার কাছে অকিঞ্চিত-কর নয় কিছুই। আমি একবার ঘটনাস্থলে একগাছা ভাঙা লাঠি পেয়ে হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করেছিলুম। যাক সে কথা। এই পাগল আবার যদি কোন কাণ্ড করে, আমাকে জানাবেন! এখন আপনি খান চুরুট, আমরা খেলি দাবা-বোড়ে।

॥ দুই ॥

হারাধনবাবুর দগ্ধাদৃষ্ট

নতুন ঘটনা ঘটতে দেরি লাগল না।

পরদিন প্রভাত। টেলিফোনের টুংটাং শুনে রিসিভারটা তুলে নিয়ে জয়ন্ত। শুনলে সুন্দরবাবু বলছেন: শীগগির এস। পনের নম্বর পঞ্চানন পাল স্ট্রিটে।

রিসিভারটা যথাস্থানে স্থাপন ক'রে মানিকের দিকে ফিরে জয়ন্ত বললে, চটপট চুমুক দিয়ে চা শেষ কর। সুন্দরবাবুর আমন্ত্রণ এসেছে।

—ব্যাপারটা কি ?

—ঠিক বোঝা গেল না। খুব সম্ভব সেই মূর্ত্তিধ্বংসকারী উন্মাদের নতুন কীর্তি।

পঞ্চানন পাল স্ট্রিটে পনেরো নম্বর হচ্ছে একখানা সাধারণ বাড়ি। দরজার সামনে রাস্তার উপরে কৌতুহলী জনতা।

জয়ন্ত বললে, এত ভিড় কেন ? নিশ্চয়ই যা-তা ব্যাপার নয়! ঐ যে বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন সুন্দরবাবু। কি মশাই খবর কি ?

সুন্দরবাবু গম্ভীর মুখে বললেন, বাড়ির ভিতরে এস।

বৈঠকখানায় ব'সে আছেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাঁর ভাবভঙ্গি অত্যন্ত উত্তেজিত।

সুন্দরবাবু বললেন, ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত রিপোর্টার হারাধনবাবু। তোমাদের পরিচয় আর দিতে হবে না, ইনি তোমাদের চেনেন।

—জরুরি তলব করেছেন কেন ?

—হুম ; আবার সেই নেতাজী-মূর্ত্তি মামলা।

—আবার নতুন কোন মূর্ত্তিভঙ্গ হয়েছে ?

—এবার মুর্ত্তিভঙ্গের উপর হত্যাকাণ্ডও! হারাধনবাবু, ব্যাপারটা খুলে বলুন তো!

বিরসবদনে হারাধনবাবু বললেন, এ যেন প্রকৃতির নির্দয় পরিহাস! পরের খবর সংগ্রহ করতে করতে সারা জীবন কাটিয়ে দিলুম, আর আজ আমার নিজের বাড়ির এতবড় খবরটা নিয়ে কাগজে পাঠাতে পারছি না, আমার মাথা এমন ভয়ানক গুলিয়ে গিয়েছে! বাইরের রিপোর্টারের মতন আমি যদি এখানে আসতুম প্রত্যেক কাগজের জন্যে অন্ততঃ দু-কলম ক'রে খবর পাঠাতে পারতুম। তা তো হ'লই না, উল্টে এর-ওর-তার কাছে বারবার ব'লে ব'লে খবর ক্রমেই বাসি ক'রে ফেলেছি। তবে আপনার কথা আলাদা জয়ন্তবাবু। আপনি যদি সব শুনে এই অদ্ভুত রহস্যের কোন হদিস করতে পারেন তবে আমার মস্ত লাভ হতে পারে।

জয়ন্ত চুপ করে শুনলে, কিছু বললে না।

হারাধনবাবু বললেন, মাস-চারেক আগে শ্যামবাজারের 'লক্ষ্মী ভাণ্ডার' থেকে আমি নেতাজীর একটি প্রতিমূর্তি কিনেছিলুম। মনে হচ্ছে সেই মূর্তির জন্যেই এই অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা। বাড়ির সব উপরকার ঘরে বসে অনেক রাত পর্যন্ত আমাকে কাজ করতে হয়, কালও করেছিলুম।

গভীর রাতে বাড়ীর একতলায় একটা যেন শব্দ হল। খানিকক্ষণ কান পেতে রইলুম, কিন্তু আর কিছু শুনতে না পেয়ে ভাবলুম, শব্দটা এসেছে বাড়ির বাইরে থেকেই। মিনিট-পাঁচেক কাটল। তারপরই বিষম এক আর্তনাদ! জয়ন্তবাবু, অমন ভয়াবহ আর্তনাদ আমি জীবনে আর কখনও শুনিনি। তার স্মৃতি জীবনে আর কোনদিন ভুলতে পারব না। ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে দু'এক মিনিট চুপ করে বসে রইলুম। তারপর একগাছা লাঠি নিয়ে নীচে নেমে এলুম। বৈঠকখানায় অর্থাৎ এই ঘরে ঢুকে দেখি, টেবিলের উপর থেকে অদৃশ্য হয়েছে নেতাজীর প্রতিমূর্তিটা! সব ফেলে এই কম দামী জিনিসটা নিয়ে গিয়ে চোরের কি লাভ হবে, কিছুই বুঝতে পারলুম না।

এমন সময় নজর পড়ল, বৈঠকখানা থেকে রাস্তার দিকে যাবার দরজাটা রয়েছে খোলা। এই পথ দিয়েই চোর পালিয়েছে বুঝে আমি অগ্রসর হলুম। বাইরে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার, হঠাৎ একটা দেহের উপরে ঠোক্কর খেয়ে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিলুম কোন-গতিকে। দেহটার অস্বাভাবিক স্পর্শ পেয়েই বুঝলুম, সেটা হচ্ছে মৃতদেহ

দৌড়ে বাড়িতে এসে একটা লণ্ঠন নিয়ে ফিরে গিয়ে দেখি যেন রক্ত-নদীর ভিতরে ভাসছে একটা মানুষের মৃতদেহ, গলার উপরে তার প্রচণ্ড অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন! চিৎ হয়ে সে পড়ে আছে, হাঁটু দুটো গুটানো, মুখটা বিশ্রীভাবে হাঁ করা! মশাই, এবার থেকে রোজ সে বোধহয় স্বপ্নে আমাকে দেখা দেবে! 'পুলিস পুলিস!' করে বারকয়েক চীৎকার করে আমি তখনই অজ্ঞান হয়ে গেলুম। তারপর কি হয়েছিল

জানি না, পরে জ্ঞান হলে দেখলুম আমার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে আছে এক পাহারাওয়ালা।

সব শুনে জয়ন্ত বললে, কিন্তু মৃতদেহটা কার?

সুন্দরবাবু বললেন, হুম, সেইটাই হচ্ছে প্রশ্ন! লাশটা শবাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে গেলেই দেখতে পাবে। এখন পর্যন্ত আমরা কিছুই ঠিক করতে পারিনি। লোকটা বেশ ঢ্যাঙা-ঢোঙা, গায়ের রং রোদে-পোড়া, দেখতে রীতিমত জোয়ান, বয়স ত্রিশের বেশী নয়। পরণে তার গরীবের কাপড়, কিন্তু তাকে শ্রমিক বলে মনে হয় না। তার পাশে রক্তের ভিতরে পড়েছিল একখানা চাকু-ছুরি—সেখানা তার নিজের না হত্যাকারীর, জানবার উপায় নেই। তার জামার পকেটের ভিতরে পাওয়া গিয়েছে সস্তায় তোলা একখানা ফটোগ্রাফ। এই দেখ!

মর্কটের মতন একটা মূর্ত্তির ছবি, চেহারা দেখলে কার্তিক বলে ভ্রম হয় না—মুখ যেন বেবুনের মত। পুরু পুরু ভুরু!

ফোটোখানা ভালো করে পরীক্ষা করে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, নেতাজীর মূর্ত্তির খবর কি?

—তোমার আসার খানিক আগে সে খবরও পেয়েছি। এখান থেকে খানিক তফাতে মনোহর মল্লিক রোডে একখানা খালি বাড়ীর সামনেকার বাগানে খণ্ড-বিখণ্ড অবস্থায় মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। আমি সেখানে যাচ্ছি তুমিও আসবে না কি?

—নিশ্চয়! হারাধনবাবু কি তাঁর সম্পত্তির ভগ্নাবশেষ দেখতে চান?

হারাধনবাবু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, সময় নেই মশাই, সময় নেই! এই হত্যাকাণ্ডের খবর এতক্ষণে নিশ্চয় অন্য অন্য রিপোর্টারদের হাতে গিয়ে পড়ছে, অথচ আমার বাড়ীতে খুন, আর আমিই কিছু লিখতে পারলুম না। হায়রে, এমনি আমার দগ্ধাদৃষ্ট! আরে মশাই সেদিন ফুটবল খেলার মাঠে গ্যালারি ভেঙে প'ড়ে কি বিষম কাণ্ড হয়েছে শুনেছেন তো? সেই সর্বনেশে গ্যালারিতে ছিলুম আমি স্বয়ং।

সব কাগজেই রিপোর্টারেরা সেইখবর নিয়ে দস্তুরমত হুলুস্থূল বাধিয়ে দিলে, কেবল আমার কাগজ চুপচাপ। কারণ আমি তখনও চোট্ খেয়ে কাৎ। বরাত আর কাকে বলে। যাই, আজকের কাণ্ড নিয়ে কতটা লিখতে পারি চেষ্টা করে দেখি। যেমন করে হোক মুখ বাঁচাতে হবে তো।

।। তিন ।।

হীরালাল

যে মহামানুষকে নিয়ে ভারতের এবং ভারতের বাইরে বিস্ময়কর আন্দোলনের সাড়াপ'ড়ে গিয়েছিল, যাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েহিন্দু ও মুসলমান পরস্পরকে সত্যিকারের ভাই ব'লে নেনে নিয়েছিলএবং যাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে বাধা দিতে গিয়ে মহাত্ম গান্ধীকে পর্যন্ত প্রকাশ্যে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল, তাঁরই প্রতিমূর্ত্তির অভাবিত পরিণাম দেখে জয়ন্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর ভগ্ন মূর্ত্তির এক-একটা টুকরো একে একে কুড়িয়ে নিয়ে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করতে লাগল।

তার মুখ দেখেই মানিক বুঝতে পারল যে, এতক্ষণ পরে জয়ন্ত একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছে।

জয়ন্ত বললে, স্পষ্ট গন্ধ পেতে এখনো দেরী আছে। কিন্তু তবু— তবু—তবু হ্যাঁ, একটু-আধটু আলোর আভাস পাচ্ছি ব'লে মনে হচ্ছে যেন! যে অদ্ভুত অপরাধীটি এই মামলার সঙ্গে জড়িত, তার কাছে এই যৎসামান্য পুতুলের মূল্যযে কোন মানুষের প্রাণের চেয়েও বেশী। অথচ পুতুলটা হস্তগত করেই সে ভেঙে ফেলে!

—পাগলের পাগলামী আর কাকে বলে?

—না, তা নয় সুন্দরবাবু। একটা মস্ত কথা ভেবে দেখুন। মূর্ত্তিটা সে হারাধনবাবুর বাড়ীরভিতরেও ভাঙেনি, বাইরেওভাঙেনি, ভেঙেছে

এত দূরে এসে—অথচ তার উদ্দেশ্য ছিল, মূর্ত্তিটা হাতে পেয়েই ভেঙে ফেলা।

—যে লোকটা খুন হয়েছে সে হঠাৎ এসে পড়াতেই হয়তো মূর্ত্তিটাকে ঘটনাস্থলে ভেঙে ফেলা সম্ভবপর হয়নি।

—হ'তে পারে। কিন্তু বাগানের ভিতরে এই বাড়ীর অবস্থানের দিকে আপনি ভালো ক'রে লক্ষ্য করেছেন কি?

সুন্দরবাবু চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, আরে লক্ষ্য আবার করব কি! এটা হচ্ছে খালি বাড়ি, আসামী তাই বুঝে ছিল যে, কেউ তার কার্য্যকলাপের দিকে দৃষ্টি রাখতে পারবে না।

—আপনি হয়তো দেখেননি, কিন্তু আমি দেখেছি যে হারাধন-বাবুর বাড়ীথেকে এখানে আসবার আগেই পাওয়াযায় আর একখানা খালি বাড়ী। আসামী সেখানেই মূর্ত্তিটা ভাঙেনি কেন? সে কেবল মূর্ত্তি চুরি করেনি, একটা হত্যাও করেছে, যত দূরে মূর্ত্তিটা বহন ক'রে নিয়ে আসবে তার পক্ষে ততই বেশী বিপদের সম্ভাবনা। তবু কেন সে গ্রহণ করেনি মূর্ত্তি ভাঙবার প্রথম সুযোগ?

সুন্দরবাবু হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, তোমার প্রশ্নেরউত্তর আমার কাছে নেই।

মাথার উপরকার গ্যাস-পোষ্টের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে জয়ন্ত বললে, আগেকারখালি বাড়িতে আলো ছিল'না, কিন্তু এখানে আলো আছে। আসামী অন্ধের মত মূর্ত্তি ভাঙতে রাজী নয়, মূর্ত্তির ভাঙা টুকরোগুলো ভাল করে স্বচক্ষে দেখতে চায়।

—এথেকে কি বুঝব?

—আপাতত কিছুই বোঝবার দরকার নেই। পরে হয়তো এটা বড় সূত্র ব'লে গণ্য হবে। যাক্, এখন আপনি কি করতে চান সুন্দরবাবু?

—আমি? আমি আগে দেখব, মৃতদেহটা কেউ সনাক্ত করতে পারে কি না! সে কে, আর তার বন্ধুবান্ধবই বা কারা, এটা জানতে

পারলে মামলাটার কিনারা করা কিছুই কঠিন হবে না। তাই নয় কি ?

—খুব সম্ভব তাই। আমি কিন্তু অন্যভাবে মামলাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে চাই ?

—কি রকম ?

—আপাতত আমার মত আপনার ঘাড়ে চাপাতে আমি রাজি নই। আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করি আসুন। খানিকটা অগ্রসর হবার পর আবার দুজনে মিলে পরামর্শ করা যাবে, কি বলেন।

—বহুৎ আচ্ছা।

—মৃতের পকেট থেকে যে ফটোখানা পাওয়া গেছে সেখানা আমায় দিতে পারেন।

—এই নাও, কিন্তু ছবিখানা কালকেই ফিরিয়ে দিও।

—উত্তম। এখন বিদায় নিলুম।

খানিক দূর এসে জয়ন্ত ডাকল, মানিক।

—উঁ।

—হারাধনবাবু নেতাজীর মূর্ত্তিটা কিনেছেন 'লক্ষ্মী ভাণ্ডার' থেকে। চল' সেখানে যাই।

শ্যামবাজারের লক্ষ্মী ভাণ্ডারে গিয়ে শোনা গেল দোকানের মালিক অনুপস্থিত। বিকেলের আগে ফিরবেন না।

জয়ন্ত বললে, আপাতত 'লক্ষ্মী ভাণ্ডারে' আমাদের ঠাঁই হ'ল না। অতঃপর হাঁড়ির অন্য ভাত টিপে দেখতে হবে। চল মানিক, চিৎপুর রোডের 'শিল্পকলা'য়।

'শিল্পকলা'র মালিক অনিলবাবু জয়ন্তের প্রশ্ন শুনে বললেন, হ্যাঁ মশাই। ঐ কাউন্টারের উপরেই ছিল নেতাজীর মূর্ত্তিটা। যদি যে কোন বদমাইস যখন খুসি যেখানে-সেখানে ঢুকে যা ইচ্ছা তাই করে লম্বা দিতে পারে, তাহ'লে মিথ্যে আমরা টেক্সো দিয়ে মরি কেন।

—ডাক্তার চারু চক্রবর্তী তো আপনার কাছ থেকে নেতাজীর আর দুটো মূর্তি কিনেছিলেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু সেখানেও তো শুনেছি এই কাণ্ড হয়েছে ! এ সব আর কিছু নয়, বদমায়েশদের কীর্তি !

—আপনার এখানে নেতাজীর আর কোন মূর্তি আছে ?

—না মশাই, আর নেই।

—ঐ মূর্তি তিনটি আপনি কোথা থেকে কিনেছিলেন ?

—বড়বাজারের 'আগরওয়াল এণ্ড সন্স' থেকে। ওঁদের অনেক দিনের মস্ত বড় কারবার।

– এই ফটোখানা কার বলতে পারেন ?

—উঁহু। না, না চিনেছি ! হীরালাল।

—হীরালাল কে ?

—পাথরের কারিগর। অল্পস্বল্প মূর্তি গড়তে আর ছবির ফ্রেম গিলটি করতে পারে। গেল হপ্তাতে সে এখানে কাজ করে গেছে, তার ঠিকানা আমি জানি না। সে চলে যাবার ঠিক দু'দিন পরেই আমার দোকানের মূর্তিটা কে ভেঙে দিয়ে পালিয়ে যায় !

'শিল্পকলা'র বাইরে এসে মানিক বললে, তুমি কোন তালে আছ কিছুই বুঝছি না জয়ন্ত ! এইবার কোন দিকে যাত্রা ?

—বড়বাজারে। আগরওয়ালা এণ্ড সন্সের কারখানায়।

বড়বাজার—অন্ধকার ও দুর্গন্ধের মল্লুক। সংকীর্ণ অলি-গলির অশান্ত জনস্রোত ভেদ করে জয়ন্ত ও মানিক যথাস্থানে এসে হাজির হ'ল। ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে একটা দ্বারপথ দিয়ে তারা দেখতে পেল, উঠানে বসে কারিগরদের কেউ পাথর কাটছে, কেউ ছাঁচ থেকে মূর্তি গড়ছে।

ম্যানেজার মারোয়াড়ী। জয়ন্তের জিজ্ঞাসার জবাবে পুরাতন খাতা খুলে দেখে বললেন, আমরা নেতাজীর অনেক মূর্তি গড়েছি। বছরখানেক আগে একই ছাঁচ থেকে নেতাজীর যে মূর্তি গড়া হয় তার

মধ্যে তিনটি গিয়েছে 'শিল্পকলা'য় আর বাকি তিনটি পাঠানো হয়েছে 'লক্ষ্মী ভাণ্ডারে'। পরে ঐ ছাঁচ থেকে অনেক মূর্তি গড়া হয়েছে বটে, কিন্তু সেগুলি পাঠানো হয়েছে কলকাতার বাইরে।

—মূর্তিগুলি কেমন করে তৈরী করা হয়?

—মুখের দুই ধার থেকে নেওয়া হয় দুটো ছাঁচ। তারপর ছাঁচ দুটো একসঙ্গে যুক্ত করে মূর্তি গড়া হয়। ভিতরটা থাকে ফাঁপা। ভিজে 'প্লাষ্টার' শুকিয়ে গেলে গুদামজাত করা হয় মূর্তিগুলো।

জয়ন্ত ফটোখানা বার ক'রে বললে, একে চেনেন কি?

ম্যানেজারের মুখে চোখে ফুটে উঠল ক্রোধের চিহ্ন। উত্তপ্তভাবে তিনি বললেন, সেই বদমাইস হীরালাল!, ওকে আবার চিনি না, খুব চিনি। ওরই জন্যে আমাদের কারখানায় হাঙ্গামা হয়।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ মশাই হ্যাঁ! হীরালাল জয়পুরের লোক। সে আর এক জয়পুরিয়াকে ছোরা মেরে এসে ভালমানুষের মত কারখানায় ব'সে কাজ করছিল, তারপর পুলিশ আমাদের কারখানায় ঢুকে তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, আর আমাদেরও ছোটাছুটি ক'রে মরতে হয় থানায় আর আদালতে। ও রকম বাঁদরমুখো মানুষকে কাজ দিয়ে আমরাই অন্যায় করেছিলুম। কিন্তু মশাই, সে খুব পাকা কারিগর!

—বিচারে তার শাস্তি হয়?

—হ্যাঁ। যাকে ছোরা মেরেছিল সে মরেনি বলে হীরালাল সে যাত্রা বেঁচে যায়। মাত্র এক বছর জেল খেটে এখন সে বোধহয় মুক্তি পেয়েছে; কিন্তু সে আর এ-মুখো হবার ভরসা করবে না। তার এক সম্পর্কীয় ভাই এখানে কাজ করে, তারও সঙ্গে কথা কইবেন নাকি?

জয়ন্ত ব্যস্তভাবে বলে উঠল, না, না, তাকে ডাকবার দরকার নেই। অনুগ্রহ ক'রে তাকে আমাদের কোন কথাই জানাবেন না।

—ব্যাপারটা কি গোপনীয়?

—হ্যাঁ, অত্যন্ত। তারপর আর একটি জিজ্ঞাস্য আছে। পাকা খাতা দেখে আপনি তো বললেন যে, নেতাজীর ঐ ছয়টি মূর্তি গেল বছরের ৩-রা জুন তারিখে এখান থেকে বাইরে গিয়েছে। আচ্ছা, হীরালাল গ্রেপ্তার হয় কোন তারিখে বলতে পারেন?

—ঠিক তারিখ মনে নেই। তবে সে কোন তারিখে শেষ মাইনে নিয়েছে খাতা দেখে তা বলতে পারি।

—বেশ, তাহলেই আমার চলবে।

খাতার পাতা উল্টে ম্যানেজার বললেন, হীরালাল শেষ মাইনে নিয়েছে গেল বছরের ২০শে মে তারিখে। সে প্রায় ঐ সময়েই গ্রেপ্তার হয়।

—ধন্যবাদ। আর আপনাকে জ্বালাতন করব না। এস মানিক!

বৈকাল বেলায় জয়ন্ত ও মানিকের আবির্ভাব হ'ল শ্যামবাজারের 'লক্ষ্মী ভাণ্ডারে'। মস্তবড় দোকান—অনেকগুলো বিভাগ। তারা একেবারে ম্যানেজারের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে।

তাদের পরিচয় পেয়ে ম্যানেজার বললেন, হ্যাঁ মশাই, হারাধন-বাবুর বাড়ীর খবর আমরা পেয়েছি। তিনি আমাদের পুরানো খরিদ্দার। নেতাজীর মূর্তিটি তিনি আমাদের এখান থেকেই কিনে-ছিলেন বটে।

জয়ন্ত সুধোলো, আপনাদের এখানে আরো দুটি নেতাজীর মূর্তি আছে।

—না মশাই নেই। বিক্রী হয়ে গিয়েছে। যাঁরা কিনেছেন তাঁরাও আমাদের চেনা খরিদ্দার! খাতায় তাঁদের নাম আর ঠিকানা আছে।

—তাই আমি চাই।

খাতা দেখে ম্যানেজার বললেন, একজনের নাম প্রফেসার সুরেশচন্দ্র বসু। ঠিকানা—চার নম্বর রাজেন রক্ষিত লেন, কলিকাতা। আর একজন হচ্ছেন শ্যামাপ্রসাদ সেন। ঠিকানা—সাত নম্বর চন্দ্রকান্ত রোড, শ্রীরামপুর।

—আপনাদের কর্মচারীরা ইচ্ছা করলেই ঐ খাতার উপরে চোখ বুলোতে পারে তো?

—তা পারবে না কেন? এ খাতা তো গোপনীয় নয়।

—ফোটোর এই লোকটাকে কখনও দেখেছেন?

—জীবনে নয়। অমন বাঁদুরে চেহারা একবার দেখলে ভোলা অসম্ভব।

—হ্যাঁ, আর একটা প্রশ্ন। আপনার এখানে জয়পুরের কোন লোক কাজ করে?

—করে বৈ কি। একজন নয়, তিনজন।

—আচ্ছা মশাই, নমস্কার।

॥ চার ॥

খুসি মুখ আরো খুসি

সান্ধ্য চায়ের বৈঠক।

মানিক বললে, তোমার মুখ যে আজ ভারি খুসি-খুসি দেখাচ্ছে জয়ন্ত।

—বুঝতে পেরেছ ?

—তোমাকে দেখে আমি বুঝতে পারব না। তোমার মুখ যে আমার কাছে দশবার-পড়া কেতাবের মত পুরানো।

—উপমায় তুমি দেখছি কালিদাস!

—খুসি হবার কারণটা কি বল দেখি ?

—সবুর কর, সবুরে মেওয়া ফলে। আমি এখন সুন্দরবাবুর জন্য অপেক্ষা করছি।···না, না, আর অপেক্ষা করতে হবে না···সিঁড়ির উপরে ঐ যে তাঁর পায়ের শব্দ!

মানিক চেঁচিয়ে বললে, ইংরেজীতে প্রবাদ আছে যে, স্মরণ করলেই শয়তান দেখা দেয়। তুমি সুন্দরবাবুকে স্মরণ করেছ, সুতরাং···

ঘরের ভিতরে প্রবেশ ক'রে সুন্দরবাবু বললেন, তোমার কথা আমি শুনতে পেয়েছি মানিক। আমাকে কার সঙ্গে তুলনা ক'রছ ?

—তুলনা নয়, আমি একটা প্রবাদের কথা বলছিলুম।

—চুলোয় যাক তোমার প্রবাদ। ওসব ছেঁড়া কথায় কান দেবার সময় আমার নেই। হ্যাঁ হে জয়ন্ত, তোমার খবর কি ?

—ভালো। নেতাজীর মূর্তি নিয়ে আজ যথেষ্ট গবেষণা করা গিয়াছে।

—নেতাজীর মূর্তির পিছনে এখনো তুমি লেগে আছ? বেশ, বেশ, যার যা পদ্ধতি, আমি আপত্তি করব না। আমি কিন্তু এবারে তোমাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছি।

—অ্যাঁ, তাই নাকি?

—যে লোকটি খুন হয়েছে তাকে সনাক্ত করতে পেরেছি।

—বলেন কি!

—খুনের কারণও অবিষ্কার ক'রে ফেলেছি।

—সাধু, সাধু!

—অবনীবাবুকে জানো তো?—ড়িটেক্‌টিভ ডিপার্টমেণ্টের। যত মেড়ুয়াবাদীর নাম ধাম-চেহারা তাঁর নখদর্পণে। লাসটা দেখেই তিনি চিনে ফেলেছেন। যার লাস তার নাম হচ্ছে রাধাকিষণ, দেশ জয়পুরে! লোকটা নাকি পয়লা নম্বরের গুণ্ডা, একটা মস্ত দলের সর্দার। অথচ সে হচ্ছে ভদ্রবংশের ছেলে। দেশে সুমিত্রা নামে তার এক ভগ্নী আছে,সেও একবার একটা চুরির মামলায় জড়িত হয়েপড়ে, কিন্তু প্রমাণ অভাবে খালাস পায়। তাহলেই ব্যাপারখানা কতটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে বুঝেই দেখ। আমার কি আন্দাজ জানো! যে তাকে খুন করেছে সেও তার দলের লোক। যে কোন কারণে রাধা-কিষাণ তাকে পথ থেকে সরাতে চেয়েছিল। ঘটনার রাত্রে হঠাৎ তাকে হারাধনবাবুর বাড়ীতে ঢুকতে দেখে সে তার অপেক্ষায় পথের উপরে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর সে বেরিয়ে এলে তাকে আক্রমণ করতে গিয়ে রাধাকিষণ নিজেই পটল তুলতে বাধ্য হয়। কি বল জয়ন্ত, আমার আন্দাজ কি ভুল?

—জয়ন্ত হাততালি দিয়ে ব'লে উঠল, খাসা সুন্দরবাবু খাসা! কিন্তু এক কোঁটা চোনা র'য়ে গেল না নাকি?

—কেন?

—খুনী নেতাজীর মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলে কেন?

—আরে, রেখে দাও নেতাজীর মূর্তি! ও-কথা কি তুমি কিছুতেই

ভুলতে পারবে না? তুচ্ছ পুতুল চুরি, বড় জোর ছয় মাস জেল। কিন্তু আসলে এটা খুনের মামলা, আর সেইটাই হচ্ছে ধর্তব্য।

—এর পর আপনার কি কর্তব্য হবে?

—খুব সোজা। অবনীবাবুকে নিয়ে যাব বড়বাজারের বস্তিতে। খুব সম্ভব ফটোর লোকটাকে তা'হলে আজকেই গ্রেপ্তার করতে পারব। তুমি কি আমাদের সঙ্গে আসবে?

—উঁহু। আমার বিশ্বাস আরো সহজে আসামীর দেখা পেতে পারি। অবশ্য আমি জোর ক'রে কিছুই বলতে চাই না। আপনি যদি আজ রাত্রে আমাদের সঙ্গে আসেন, আর দৈব যদি সহায় হয়, তা'হলে হত্যাকারী নিজেই আপনার হাতে মুঠোর ভেতরে এসে পড়বে।

—কোথায় যেতে হবে শুনি। বড়বাজারে?

—না, চার নম্বর রাজেন রক্ষিত লেনে। আমি অঙ্গীকার করছি সুন্দরবাবু, আমার আন্দাজ ভুল হ'লে কাল আমি আপনাদের সঙ্গে বড়বাজার বস্তীতে ভ্রমণ করতে যাব। কি বলেন, রাজি?

—হুম্!

মানিক সকৌতুকে বললে, হুম্? এখানে 'হুম' মানে কি দাদা? হুঁ?

—তাই ধরে নাও।

জয়ন্ত টেবিলের সামনে গিয়ে একখানা কাগজে তাড়াতাড়ি কি লিখে সেখানা খামের ভিতরে ভরলে। তারপর খামের উপরে ঠিকানা লিখতে লিখতে চেঁচিয়ে ডাকল, মধু! ওরে অ মধু! শ্রীমধুসূদন।

পুরাতন ভৃত্য মধু এসে হাজির।—আজ্ঞে বাবু।

—যাও তো বাপু এই চিঠিখানা নিয়ে। তুমি তো পড়তে জানো, খামের উপরে ঠিকানা লেখা আছে। পার তো দৌড়ে যাও—বড্ড জরুরি চিঠি।

মধুর প্রস্থান। জয়ন্তের গাত্রোত্থান। সে বললে, সুন্দরবাবু, তাড়াতাড়ি বাড়ীতে গিয়ে খেয়ে-দেয়ে খানিকটা গড়িয়ে নিন। রাত

সাড়ে দশটার সময় আবার এখানে পদার্পণ করলেই চলবে। আমরা সাড়ে এগারোটার ভিতর যাত্রা করব।

সুন্দরবাবুর প্রস্থান। জয়ন্ত বললে, মানিক আমাকে এখন পাশের ঘরে গিয়ে পুরনো খবরের কাগজের 'ফাইল' ঘাঁটতে হবে। আজ রাত্রে বোধহয় অনিদ্রাই ব্যবস্থা। তুমি ইচ্ছা করলে অল্পবিস্তর বিশ্রাম করতে পারো।

রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে পাশের ঘর থেকে জয়ন্ত বেরিয়ে এল ধূলি ধূসরিত হস্তে।

সোফার উপরে লম্বা হয়ে শুয়েছিল মানিক। বললে, কি বন্ধু, তোমার খুশি মুখ যে আরও খুশি হয়ে উঠেছে ব'লে মনে হচ্ছে!

দুই ভুরু নাচিয়ে জয়ন্ত বললে, আমি যা খুঁজছিলুম তা পেয়েছি।

পাঁচ

হীরালাল কুপোকাৎ

রাত সাড়ে এগারোটা। সদর দরজায় অপেক্ষা করছিল জয়ন্তের মোটর। সুন্দরবাবুও মানিকের সঙ্গে সে মোটরে গিয়ে উঠল।

—সুন্দরবাবু যে সশস্ত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। মানিক, তুমিও রিভলবার এনেছ তো?—জয়ন্ত বললে।

—সে কথা আবার বলতে! —মানিকের উত্তর।

গাড়ি ছুটল। এ-রাস্তা ও-রাস্তা মাড়িয়ে গাড়ি যখন একটা চৌমাথায় গিয়ে হাজির হ'ল কলকাতা সহর তখন যেন ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে!

জয়ন্ত চালককে ডেকে বললে, গুট্টা সিং, গাড়ি থামাও। এইখানেই তুমি আমাদের জন্য অপেক্ষা কর। আমাদের এখন শ্রীচরণই ভরসা!

নামো মানিক, নামুন সুন্দরবাবু!···আরে মশাই, আপনার নাসাযন্ত্র যে সঙ্গীত সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে! বলি ঘুমোলেন নাকি?

সুন্দরবাবু ধড়মড় করে সোজা হয়ে ব'সে প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে বললেন, ঘুমোইনি হে, ঘুমোইনি। এই বিষম গরমে শীতল সমীরণ সেবন ক'রে কিঞ্চিত তন্দ্রাতুর হয়েছিলুম আর কি! আমি এখন সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত। কি বলবে বল, হুম!

—এইবার গাড়ি থেকে অবতরণ করবার সময় এসেছে।

—এসেছে নাকি? এই আমি নেমে পড়লুম।

—গাড়ি নিয়ে বেশি দূর যাওয়া সঙ্গত নয়। এইবার পদব্রজে মিনিট পাঁচেক অগ্রসর হ'তে হবে।

—হুম্—যো হুকুম! আমি এখন প্রাচীন সৈনিক, যা বল তাতেই রাজি। এই আমি সবেগে পদচালনা করলুম!

পথে আর লোক চলাচল নেই বললেই চলে। গোটা কয়েক কুকুর সহরের মৌনব্রত ভাঙবার চেষ্টা করছে এবং রাস্তার এখানে-ওখানে দুই-তিনটি বা ততোধিক ষাঁড় গা এলিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে নির্বিকার ভাবে করছে রোমন্থন।

চার নম্বর রাজেন রক্ষিত লেন। রেলিং ঘেরা জমির ভিতর একখানা মাঝারি আকারের বাড়ি। তার গায়ে কোথাও নেই আলোর রেখা। বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। রাস্তার গ্যাস-পোষ্টের আলোয় সুন্দরবাবু নামটা পাঠ করলেন—প্রফেসর সুরেশচন্দ্র বসু!

জয়ন্ত বললে, রাত্রেও এ বাড়ির ফটক বন্ধ হয় না দেখছি। চলুন সুন্দরবাবু, বাগানে ঐ হাস্নুহানার ঝোপের আড়ালে গিয়ে আমরা লুকিয়ে থাকি। হয়তো অনেক রাত পর্যন্ত আমাদের মশক-দংশন সহ্য করতে হবে। হয়তো সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করেও আমাদের ভাগ্যে লাভ হবে প্রকাণ্ড একটি অশ্বডিম্ব। উপায় কি, যে পূজার যে মন্ত্র!

কিন্তু জয়ন্তের আশঙ্কা সফল হ'ল না। আধ ঘণ্টা কাটতে না-কাটতেই কোথা থেকে আচমকা দেখা দিল একটা ছোট্ট কালো মূর্তি, তীরের মতন বাগানের মধ্যে ছুটে এসেই সে বাড়ীর ছায়ার ভিতর কোথায় হারিয়ে গেল! ঠিক যেন একটা বানর। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল নীরবে। তারপর একটা মৃদু শব্দ—কে যেন একটা জানালা খুলছে ধীরে ধীরে! তারপর সব আবার চুপচাপ।

জয়ন্ত বললে, এস মানিক, আমরা জানলার নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। চোর বাইরে বেরুলেই গ্রেপ্তার করব।

কিন্তু তারা দুই-এক পা এগুবার আগেই বাড়ীর ভিতর থেকে আবার আবির্ভাব হ'ল সেই মূর্তিটার। তার হাতের তলায় রয়েছে সাদা মতন কি একটা জিনিস। সে চারিদিকটা একবার চটপট দেখে নিলে, এখানকার নীরবতায় ও নির্জনতায় বোধহয় আশ্বস্ত হ'ল। হাতের জিনিসটা মাটির উপরে নামিয়ে রাখলে। তারপরই জেগে উঠল ফটাফট শব্দ!

জয়ন্ত সঙ্গীদের নিয়ে বেগে ছুটে এল তার কাছে। লোকটা তখন হেঁট হয়ে এমন একাগ্র মনে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে যে কিছুই বুঝতে পারলে না। তার পিঠের উপরে বাঘের মতন লাফিয়ে পড়ল জয়ন্ত। এবং সে কোন বাধা দেবার আগেই মানিকের সাহায্যে সুন্দরবাবু হাতকড়া দিয়ে তার দুই হাত করলেন বন্দী। তাকে চিৎ ক'রে ফেলতেই দেখা গেল তার হাড়-কুৎসিৎ বেবুনের মত মুখখানা—অবিকল সেই ফটোগ্রাফের প্রতিচ্ছবি!

জয়ন্ত মাটির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল—সেখানে ইতস্তত বিকীর্ণ হয়ে আছে নেতাজীর আর এক মূর্তির ভাঙা টুকরো। সে একে একে টুকরোগুলো তুলে নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে লাগল।

এমন সময় বাড়ীর ভিতর জ্বলে উঠল আলো এবং দরজা খুলে বেরিয়ে বাগানের উপরে এসে দাঁড়াল আর এক মূর্তি।

জয়ন্ত মুখ তুলে সুধালো, আপনিই বোধহয় প্রফেসর সুরেশচন্দ্র বসু ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আর আপনি নিশ্চয়ই জয়ন্তবাবু। আপনার পত্র আমি যথাসময়েই পেয়েছি আর কাজ করেছি আপনার উপদেশ মতই। যাক, বদমাইসটা ধরা পড়েছে দেখে খুসি হলুম। আসুন, একটু চা-টা খেয়ে যান।

সুন্দরবাবু বললেন, এই কি চা খাবার সময় মশাই! এই পরম-সুন্দর মানুষটিকে 'লক-আপে' পুরতে না পারলে আমি ঘুমোবারও সময় পাব না। দেখি সোনার চাঁদ, তোমার পকেটে কি সম্পত্তি আছে!

বন্দী কোন কথা বললো না। কিন্তু সুন্দরবাবু তার দিকে হাত বাড়াতেই সে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে খ্যাঁক ক'রে তার হাত কামড়ে দিতে এল!

সুন্দরবাবু চট্ ক'রে নিজের হাতখানা সরিয়ে নিয়ে ব'লে উঠলেন, ওরে বাবা, হয়েছিল আর কি! তুই ব্যাটা মানুষের ছদ্মবেশে বুনো জন্তু নাকি! হুম্, এর মুণ্ডুটা দুই হাতে আচ্ছা করে চেপে ধর তো মানিক। সাবধান যেন কামড়ে না দেয়? এর পকেটগুলো হাতড়ে না দেখলে চলবে না।

আসামীর পকেট হাতড়ে পাওয়া গেল কেবল তিন টাকা দশ পয়সা আর একখানা ছোরা।

জয়ন্ত ছোরাখানা আলোতে পরীক্ষা ক'রে বললে, হুঁ এর হাতলে এখনো রক্তের দাগ লেগে রয়েছে দেখছি! নিশ্চয়ই গুণ্ডা রাধা-কিষণের রক্ত!

সুন্দরবাবু বললেন, ওহে রূপবান পুরুষ, কোন্ নাম ধরে তোমাকে সম্বোধন করব বাপু?

বন্দী নিরুত্তর।

—নাম বলবে না? জীতা রহো বেটা! কিন্তু তুমি তো জানো না

ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের অবনীবাবুর কাছে গেলে তোমার নাম ধাম আর যাবতীয় গুণাবলী কিছুই আর ধামাচাপা থাকবে না।

জয়ন্ত বললে, রাত বাড়ছে সুন্দরবাবু।

—হ্যাঁ, আমরাও এবার গা তুলব। কিন্তু ভাই জয়ন্ত, তুমি যে কেমন করে জানতে পারলে এই খুনেটা আজ এখানে আসবে, কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।

—আপাতত বুঝে কাজ নেই, কারণ আমার কাছেও এখনো সব রহস্য পরিষ্কার হয়নি। এ লোকটা নেতাজীর মূর্তি ভাঙে কেন?

—আরে থো কর ও কথা! এটা হচ্ছে খুনের মামলা, খুনী গ্রেপ্তার হয়েছে, এখনও তুমি নেতাজীর মূর্তি নিয়ে মস্তক ঘর্মাক্ত ক'রছ কেন?

—না সুন্দরবাবু, এটা খুনের মামলা নয়, এটা হচ্ছে নেতাজীর মূর্তির মামলা। আমার ধারণা, খুনোখুনির কারণই হচ্ছে নেতাজীর মূর্তি! সে কারণটা আবিষ্কার করতে না পারলে আদালতে আপনার খুনের মামলা ফেঁসে যাবে।

—অত বাক্যব্যয় কেন, কারণটা ব্যক্তই কর না বাপু!

—কারণটা অনুমান করেছি বটে, কিন্তু সে অনুমান সত্য বলে প্রমাণ করবার উপায় আমার হাতে নেই। তবে আসছে পরশুদিন বৈকালে আপনি যদি আমার বাড়িতে শুভাগমন করেন, তা'হলে মেঘ সরিয়ে আপনাকে সূর্য্যালোক দেখাবার আশা করলেও করতে পারি।

সুন্দরবাবু বললেন, তুমি কবিতা লেখো না কেন জয়ন্ত?

—হঠাৎ একি প্রশ্ন?

—কবিদের মত তোমার সব কথাই হেঁয়ালি! শুনি বটে, কিন্তু ধরা-ছোঁয়া বোঝা যায় না।

মানিক বললে, জয়ন্ত কোন দুঃখে যে কবিতা লেখে না, আমি তা জানি। সে প্রতিজ্ঞা করেছে, সুন্দরবাবুর চেয়ে বুদ্ধিমান পাঠক না পেলে কোন দিনই কবিতা রচনার জন্যে লেখনী ধারণ করবে না।

সুন্দরবাবু চোখ রাঙিয়ে বললেন, থামো তুমি ঢাকের পিটে ট্যামটেমি! তোমার ঘ্যানঘ্যানানী অসহনীয়!

॥ ছয় ॥

মমতাজ বেগমের কালো মুক্তা

নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে সুন্দরবাবু দেখা দিলেন জয়ন্তের বৈঠকখানায়।

জয়ন্ত বললে, খবর শুভ তো?

সুন্দরবাবু গর্বিতভাবে বললেন, তোমার আগেই আমি সূর্যালোক দেখতে পেয়েছি জয়ন্ত।

—আপনি ভাগ্যবান!

—না, ঠাট্টা নয়! অবনীবাবু খোঁজ-খবর নিয়ে এর মধ্যেই আসামীর সব গুপ্ত কথা জানতে পেরেছেন। তার নাম হীরালাল। বাড়ী জয়পুরে। আগে তার স্বভাব ভালোই ছিল, সৎপথে থেকে মূর্তি গড়ে বেশ দু-পয়সা রোজগার করত। তারপর কু-সংসর্গে মিশে সে গোল্লায় যায়। দু-বার জেল খাটে—একবার চুরি করে, আর একবার ছোরা মেরে। নেতাজীর মূর্তিগুলো কেন ভাঙত, এখনো তা জানা যায়নি, কারণ হীরালাল ও সম্বন্ধে কোন কথাই বলতে নারাজ। কিন্তু আমরা সন্ধান নিয়ে এইটুকু জানতে পেরেছি যে, ঐ মূর্তিগুলো তার নিজের হাতেই গড়া। সুন্দরবাবু নিজের মনেই গড় গড় করে বলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু জয়ন্ত বোধহয় মন দিয়ে তাঁর কথা শুনছিল না। থেকে থেকে সে যেন কান পেতে কি শোনে, মাঝে মাঝে উঠে জানালার ধারে যায়, তারপর আবার আসনে এসে বসে পড়ে।

সুন্দরবাবু সুধোলেন, তোমার আজ কি হয়েছে জয়ন্ত? তুমি এমন অন্যমনস্ক কেন?

—বোধহয় আমার হিসাবে ভুল হয়েছে। এখন আপনার কাছে কেমন করে মুখ রক্ষা ক'রব জানি না।

—এ আবার কি কথা ?

—আজ এখানে আসবার জন্যে গেল-কাল একজনকে টেলিগ্রাম করেছিলুম। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় উৎরে গেল, তিনি এলেন না।

—কে তিনি ?

—শ্যামাপ্রসাদ সেন, থাকেন শ্রীরামপুর।

—তাঁকে কি দরকার ?

—খুনী কেন যে নেতাজীর মূর্তিগুলো ভাঙত, হয়ত এর উত্তর পাওয়া যেতে পারে তাঁর কাছেই !

—প্রশ্নের উৎপত্তি কলকাতায়, আর উত্তর আসবে শ্রীরামপুর থেকে !

জয়ন্ত সচমকে বললে, মানিক, দরজায় একখানা গাড়ী এসে থামল না ? একবার দেখে এস তো !

মানিক ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল এক প্রাচীন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে। তাঁর ডান হাতে খবরের কাগজ দিয়ে মোড়া একটা জিনিস।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, আপনিই কি শ্রীরামপুরের শ্যামাপ্রসাদবাবু ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু ঠিক সময়ে আসতে পারিনি ব'লে মাপ করবেন। আজকাল ট্রেনের ধরণ-ধারণ জানেন তো ?

—বসুন। নেতাজীর মূর্তিটা এনেছেন তো ?

—হ্যাঁ, এই যে আমার হাতে।

—উত্তম। তাহলে কাজের কথা হোক

—জয়ন্তবাবু, আপনি কি সত্যসত্যই মূর্তিটি তিনশো টাকা দিয়ে কিনতে চান ?

—নিশ্চয়ই।

—কেমন ক'রে জানলেন ঐ মূর্তিটি আমার কাছে আছে ?

—লক্ষ্মী ভাণ্ডারের ম্যানেজার আমাকে বলেছেন।

—তা'হলে এ-কথাও শুনেছেন তো মূর্তিটা আমি কিনেছি কত টাকা দিয়ে ?

—না।

—মশাই, আমি মস্ত ধনী নই বটে, কিন্তু ঠক-জুয়াচোরও নই। আগে থাকতেই আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই, মূর্তিটির দাম দশ টাকা মাত্র।

—শ্যামাপ্রসাদবাবু, আপনার সততা দেখে খুশিও হচ্ছি, বিস্মিতও হচ্ছি! মূর্তিটির আসল দাম যাই-হোক, আমি তিনশো টাকা দিয়েই ওটি আপনার কাছ থেকে কিনতে চাই।

শ্যামাপ্রসাদ কাগজের মোড়ক খুলে মূর্তিটি টেবিলের উপরে রাখলেন।

পকেট থেকে তিনখানা একশো টাকার নোট বার ক'রে জয়ন্ত বললে, শ্যামাপ্রসাদবাবু, টেবিলের উপরে কাগজ-কলম আছে। এই দুইজন সাক্ষীর সামনে আপনি অনুগ্রহ ক'রে লিখে দিন যে, তিনশো টাকার বিনিময়ে মূর্তিটি আমার কাছে বিক্রয় করলেন, ওর উপরে ভবিষ্যতে আপনার কোন দাবি-দাওয়া রইল না।

জয়ন্তর কথামত কাজ ক'রে তিনশত টাকা নিয়ে প্রস্থান করলেন শ্যামাপ্রসাদবাবু।

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, হুম্, জয়ন্তর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, জেনে-শুনেও ঠকলে—আরে ছ্যাঃ!

জয়ন্ত মুখ টিপে একটু হেসে উঠে দাঁড়াল। একখানা নূতন 'টেবিল-ক্লথ' বিছিয়ে নেতাজীর মূর্তি তার মাঝখানে স্থাপন ক'রে বললে, সুন্দরবাবু, এইবার আমি একটি অপকর্ম করব—মহা অপকর্ম!

—দশ টাকার মাল তিনশো টাকায় কিনেই তো অপকর্ম করেছ! তারও উপরে আবার কি অপকর্ম আছে?

একটা হাতুড়ী নিয়ে জয়ন্ত বললে, আজ আমিও বরেণ্য নেতাজীর ঐ প্রতিমূর্ত্তিটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করব।

—তুমি যে হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়েছ, সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নেই। মানিক তোমার বন্ধুটিকে সামলাও, সে যেন আমার মাথায় হাতুড়ীর এক ঘা না দেয়!

জয়ন্ত মূর্ত্তির উপরে হাতুড়ীর দ্বারা আঘাত করলে এবং মূর্ত্তিটি সশব্দে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

জয়ন্ত সাগ্রহে টেবিলের উপরে হেঁট হয়ে পড়ল এবং একটা ভাঙা টুকরো তুলে সানন্দে বলে উঠল, দেখুন সুন্দরবাবু! দেখ মানিক, আমার হাতে রয়েছে মমতাজ বেগমের বিখ্যাত কালো মুক্তা।

সাত

এক ঢিলে দুই পাখী

জয়ন্ত বলতে লাগল, মমতাজ বেগমকে সম্রাট সাজাহান যে মহামূল্য কালো মুক্তা উপহার দিয়েছিলেন, তার খ্যাতি পৃথিবীর দেশে দেশে।

নাদির শাহের ভারত আক্রমণের সময় এই মুক্তাটি কোথায় হারিয়ে যায় কেউ তা জানে না। অনেক কাল পরে মুক্তাটি কেমন করে মধ্য ভারতের প্রতাপপুরের মহারাজার হস্তগত হয়। তারপর সেদিন পর্য্যন্ত বংশানুক্রমে মুক্তার মালিক হতেন প্রতাপপুরের মহারাজারাই।

তারপর বর্তমান মহারাণীর শয়নগৃহ থেকে আবার মুক্তোটি হয় অদৃশ্য। তাই নিয়ে চারিদিকে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, সুন্দরবাবুর সে কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। পুলিশ সে মামলার কিনারা করতে পারেনি। মহারাণীর এক পরিচারিকা ছিল, সে জয়পুরের মেয়ে, নাম সুমিত্রা। তারই উপরে সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সুন্দরবাবু, চমকে উঠলেন যে বড়! আপনার মুখেই

তো শুনেছি, হারাধনবাবু বাড়ীর সামনে নিহত রাধাকিষাণের এক ভগ্নী আছে, তার নাম সুমিত্রা, আর সে জয়পুরের মেয়ে।

—হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ! এই দুই সুমিত্রা যে একই ব্যক্তি, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।

—পুরাতন খবরের কাগজে 'ফাইল ঘেঁটে আমি'আর একটি তথ্য আবিষ্কার করেছি। কাকে ছোরা মেরে হীরালাল সেদিন ধরা পড়ে, প্রতাপপুরের মহারাণীর শয়নগৃহ থেকে কালো মুক্তাটি অদৃশ্য হয় ঠিক তারই চার দিন আগে। কল্পনায় ঘটনাগুলো পর পর এইভাবে সাজানো যেতে পারে।

সুমিত্রা মুক্তা চুরি ক'রে ভাই রাধাকিষাণের কাছে গোপনে পাঠিয়ে দিলে। হীরালাল হচ্ছে রাধাকিষাণের দুষ্কর্মের সহকারী। সে হয় মুক্তাটি তার বন্ধুর কাছ থেকে চুরি করলে, কিংবা নিজে পুলিশের দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে রাধাকিষণই তার কাছে মুক্তাটি জিম্মা রাখলে। তারপর হঠাৎ একজন লোককে ছোরা মেরে হীরালাল আগরওয়ালার কারখানায় পালিয়ে এল। তারপর সে যখন ব'সে ব'সে 'প্লাষ্টারে'র মূর্ত্তি গড়ছে,সেইসময় সেখানে পুলিশের আবির্ভাব। সে বুঝলে পুলিশ তার কাপড় জামা তল্লাশ করবে। তার সামনে ছিল সবে গড়া ভিজে প্লাষ্টারের মূর্ত্তি। সে তাড়াতাড়ি একটা মূর্তির মাথায় ছ্যাঁদা ক'রে মুক্তাটি ভিতরে নিক্ষেপ ক'রে ছিদ্রটি আবার বন্ধ ক'রে দিলে—দক্ষ কারিগরের পক্ষে এটা খুবই সহজ কাজ। তারপর সে এক বৎসর জেল খাটতে গেল। ইতিমধ্যে নেতাজীর ছয়টি মূর্তি কারখানার বাইরে এখানে-ওখানে চ'লে গেল। তাদের কোনটির মধ্যে যে মুক্তা আছে বাহির থেকে দেখে কেউ তা বলতে পারবে না। মূর্তি নাড়ালেও মুক্তার অস্তিত্ব জানা যাবে না, কারণ কাঁচা প্লাষ্টার শুকিয়ে গিয়ে মুক্তাটিকে কামড়ে ধরেছে। মূর্তি ভাঙা ছাড়া মুক্তা আবিষ্কারের আর কোন উপায় রইল না।

তারপর হীরালালের মেয়াদ ফুরুলো। কিছুমাত্র হতাশ না হয়ে

দস্তুরমত মাথা খাটিয়ে ভিতরে ভিতরে খোঁজ নিয়ে সে জানতে পারলে, কোন্ কোন্ মূর্তি কোন্ কোন্ ঠিকানায় গিয়েছে। তারপর আরম্ভ হ'ল নেতাজীর মূর্তির উপরে আক্রমণ। চতুর্থ মূর্তি চুরি করতে গিয়ে হারাধনবাবুর বাড়ীর সামনে হীরালালের সঙ্গে দেখা হয় রাধাকিষাণের। হীরালাল জেল থেকে বেরিয়েছে শুনে রাধাকিষণ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু এই সাক্ষাৎকারের ফল হয় রাধা-কিষণের পক্ষে মারাত্মক।

সুন্দরবাবু বললেন, হীরালাল যদি তাঁর দুষ্কর্মের সহকারীই হয়, তবে রাধাকিষণ তার ফটো নিয়ে বেড়াত কেন?

—খুব সম্ভব তৃতীয় ব্যক্তির কাছে হীরালালের খোঁজ নেবার সময়ে এই ফটো তার কাজে লাগত। থাক সে কথা। আমি বেশ আন্দাজ করলুম খুনের পরে হীরালাল আরো তাড়াতাড়ি কাজ হাঁসিল করবার চেষ্টা করবে, কারণ পুলিশ তাকে খুঁজছে, এখন যথা-শীঘ্র সম্ভব কলকাতা থেকে তার অদৃশ্য হওয়া উচিত।

হীরালাল যে মূর্তির ভিতরে কালো মুক্তা লুকিয়ে রেখেছিল, তখনো পর্য্যন্ত এ সন্দেহ আমার হয়নি। কিন্তু খালি বাড়ীর সামনে ঠিক আলোর নীচে হীরালাল মূর্তিটা ভেঙেছিল ব'লে এ সন্দেহ আমার হয়েছিল যে, ফাঁপা মূর্তিগুলোর মধ্যে এমন কোন মূল্যবান জিনিস আছে, যার লোভে চোর এই সব কাণ্ড করে।

সন্ধান নিয়ে জানলুম, ছয়টার মধ্যে দুটো মূর্তি আছে যথাক্রমে প্রফেসর সুরেন্দ্রনাথ বসু আর শ্যামাপ্রসাদ সেনের কাছে। একজন থাকেন এই সহরেই, আর একজন শ্রীরামপুরে। আন্দাজ করলুম, সহরের মূর্তিটাকে চুরি না করে কলকাতার বাইরে যাওয়া হীরালালের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। আমার আন্দাজ ভুল হয়নি। তারপর সুরেশ-বাবুর বাড়ীতে স্বচক্ষে দেখলুম, হীরালাল কি যেন খুঁজছে মূর্তির ভাঙা টুকরোগুলোর মধ্যে। কিন্তু তখন পুরানো খবরের কাগজের 'ফাইল' থেকে বিখ্যাত কালো মুক্তোর ইতিহাস আমি উদ্ধার করেছি

আর রাধাকিষণের সঙ্গে এই মুক্তো চুরির যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতে পারে, এমন সন্দেহও আমার মনে ঠাঁই পেয়েছে! এও জেনেছি যে রাধাকিষণ আর হীরালাল পরস্পরের পরিচিত আর একই লোক। মনে খট্‌কা লাগল, হীরালাল কি ফাঁপা মূর্তির ভিতরে খুঁজছে কালো মুক্তোকেই?

কিন্তু তখনো পর্য্যন্ত হীরালালের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়নি। আমার মন বললে, তা'হলে মুক্তা আছে ঐ শেষ—বা ষষ্ঠ মূর্তির মধ্যেই। সুন্দরবাবু, কপাল ঠুকে আপনার সামনেই তিনশো টাকা দিয়ে আমি ঐ ষষ্ঠ মূর্তিটাকে কিনে ফেললুম, দেখলেন তো।

সুন্দরবাবু তারিফ করে বললেন, ধন্যি ভায়া, ধন্যি! একটি মাত্র ইষ্টকখণ্ড দিয়ে আজ তুমি একজোড়া পক্ষী বধ করেছ। একসঙ্গে দু-দুটো মামলার কিনারা করে ফেলল হে—ওদিকে মুক্তা-চুরির আর এদিকে মূর্তি চুরির মামলা। হুম্ হুম্!

মানিক বললে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবন হচ্ছে বিচিত্র 'অ্যাডভেঞ্চারে' পরিপূর্ণ। তাঁর প্রতিমূর্তিও বড় কম 'অ্যাডভেঞ্চার' সৃষ্টি করলে না—নেতাজীর সবকিছুরই সঙ্গেই আছে অসাধারণতার সম্পর্ক!

'জয় হিন্দ!'*

* একটি বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে।

অলৌকিক

ইনস্পেক্টর সুন্দরবাবু। নতুন নতুন খাবারের দিকে বরাবরই তাঁর প্রচণ্ড লোভ। আজ বৈকালী চায়ের আসরে পদার্পণ করেই বলে উঠলেন, জয়ন্ত ও-বেলা কি বলেছিলে, মনে আছে তো?

জয়ন্ত হেসে বললে, মনে না থাকে, মনে করিয়ে দিন।

—নতুন ধরণের খাবার খাওয়াবে বলেছিলে—

—ও, এই কথা! খাবার তো প্রস্তুত।

—খাবারের নাম শুনতে পাই না!

—মাছের প্যাটি আর অ্যাস্‌প্যারাগাস ওমলেট।

—রেঁধেছে কে?

—আমাদের মধু।

—মধু একটি জিনিয়াস! আনতে বল, আনতে বল।

চা পর্ব শেষ হ'ল যথাসময়ে। অনেকগুলো প্যাটি আর ওমলেট উড়িয়ে সুন্দরবাবুর আনন্দ আর ধরে না।

পরিতৃপ্ত ভুঁড়ির উপরে সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে তিনি বললেন, মনের মত পানাহারের মত সুখ দুনিয়ায় আর কিছু নেই, কি বল মানিক?

মানিক বললে, কিন্তু অত সুখের ভিতরও কি একটি ট্র্যাজেডি নেই!

—কি রকম?

—খেলেই খাবার ফুরিয়ে যায়।

—তা যা বলেছ।

—আবার অনেক সময় খাবার ফুরোবার আগে পেটই ভরে যায়।

—হ্যাঁ ভায়া, ওটা আবার খাবার ফুরোনোর চেয়েও দুঃখজনক ব্যাপার! খাবার আছে, পেট কিন্তু গ্রহণ করতে নারাজ। অসহনীয় দুঃখ!

ঠিক এমন সময়ে একটি লোক ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রল।

তাকে দেখেই জয়ন্ত বলে উঠল, আরে হরেন যে! বোস ভাই, বোস! সুন্দরবাবু, হরেন হচ্ছে আমার আর মানিকের বাল্যবন্ধু।

মানিক বললে, হরেন, ইনি হচ্ছেন, সুন্দরবাবু। বিখ্যাত পুলিশ ইন্সপেক্টর আর প্রখ্যাত ঔদরিক।

—হুম, ঔদরিক মানে কি মানিক? সুধোলেন সুন্দরবাবু।

—ঔদরিক, অর্থাৎ উদরপরায়ণ।

—অর্থাৎ পেটুক। বেশ ভাই বেশ, যা খুসি বল, তোমার কথায় রাগ করে আজকের এমন খাওয়ার আনন্দটা মাটি ক'রব না!

জয়ন্ত বললে, তারপর হরেন, তুমি কি এখন কলকাতাতেই আছ।

—না, কাল এসেছি। আজই দেশে ফিরব। কিন্তু যাবার আগে তোমাদের একটা খবর দিয়ে যেতে চাই।

—কি রকম খবর?

—যে রকম খবর তোমরা ভালোবাসো।

—কোন অসাধারণ ঘটনা!

—তাই।

—তাহলে আমরা শুনতে প্রস্তুত। সম্প্রতি অসাধারণ ঘটনার অভাবে আমরা কিঞ্চিৎ ম্রিয়মান হয়ে আছি। ছাড়ো তোমার খবরের ঝুলি।

। দুই ।

হরেন বললে, সুন্দরবাবু, জয়ন্ত আর মানিক আমাদের দেশে গিয়েছে, কিন্তু আপনার কাছে আগে তার কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার। আমাদের দেশ হচ্ছে একটি ছোট সহর, কলকাতা থেকে মাইল ত্রিশ দূরে, সেখানে পনেরো-ষোল হাজার লোকের বাস। অনেক ডেলি-প্যাসেঞ্জার কলকাতায় চাকরি করতে আসেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বড় অফিসারও আছেন। ষ্টেশন থেকে সহরের দূরত্ব প্রায় দেড় মাইল। এই পথটা বেশীর ভাগ লোকই পায়ে হেঁটে পার হয়, যাদের সঙ্গতি আছে তারা ছ্যাকড়া গাড়ী কি সাইকেল-রিক্সার সাহায্য নেন।

মাসখানেক—অর্থাৎ গেল মাসের প্রথম দিনে সুরথনাথবাবু

আর অবিনাশবাবু সাইকেল-রিক্সায় চ'ড়ে ষ্টেশন থেকে বাড়ীর দিকে ফিরছিলেন। তাঁরা দু'জনেই বড় অফিসার, একজন মাহিনা পান হাজার টাকা, আর একজন আটশত টাকা। সেই দিনই তাঁরা মাহিনা পেয়েছেন। ষ্টেশন থেকে মাইলখানেক পথ এগিয়ে এসে একটা জঙ্গলের কাছে তাঁরা দেখতে পেলেন আজব এক মূর্ত্তি। তখন রাত হয়েছে, আকাশেও ছিল সামান্য একটু চাঁদের আলো, স্পষ্ট করে কিছুই চোখে পড়ে না। তবু বোঝা গেল, মূর্ত্তিটা অসম্ভব ঢ্যাঙা, মাথায় অন্তত নয় ফুটের কম উঁচু হবে না। প্রথমে তাদের মনে হয়েছিল সেটা কোন নারীর মূর্ত্তি, কারণ তার দেহের নীচের দিকে ছিল ঘাঘরার মত কাপড়। কিন্তু তার কাছে গিয়েই বোঝা গেল সে নারী নয়, পুরুষ; ভীষণ কালো মুখখানা, সম্পূর্ণ অমানুষিক। তার হাতে ছিল লাঠির বদলে লম্বা একগাছা বাঁশ। পথের ঠিক মাঝখানে একেবারে নিশ্চল হয়ে সে দাঁড়িয়েছিল।

রিক্সাখানা কাছে গিয়ে, তাকে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই সে বিষম চীৎকার করে ধমকে বলে উঠল, এই উল্লুক, গাড়ী থামা! তারপরেই সে রিভলবার বার করে ঘোড়া টিপে দিলে। ক্রম করে শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রিক্সার চালক গাড়ী ফেলে পলায়ন করলে। সুরথবাবু আর অবিনাশবাবুও গাড়ী থেকে নেমে পড়বার উপক্রম করতেই মূর্ত্তিটা তাঁদের দিকে রিভলবার তুলে কর্কশ স্বরে বললে, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, সঙ্গে যা আছে সব রিক্সার উপরে রেখে এখান থেকে সরে পড়।

তাঁরা প্রাণে বাঁচতেই চাইলেন। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সঙ্গের সমস্ত টাকা, হাতঘড়ি, আংটি এমনকি ফাউনটেন পেনটি পর্যন্ত সেইখানে ফেলে রেখে তাঁরা তাড়াতাড়ি চম্পট দিলেন। পরে পুলিস এসে ঘটনাস্থলে রিক্সার পাশে কুড়িয়ে পায় কেবল সেই লম্বা বাঁশটাকে।

প্রথম ঘটনার সাতদিন পরে ঘটে দ্বিতীয় ঘটনা। মৃণালবাবু আমাদের দেশের লোক। মেয়ের বিয়ের জন্য তিনি কলকাতায় গহনা গড়াতে দিয়েছিলেন। ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময়ে ট্রেন থেকে নেমে

পাঁচ হাজার টাকার গহনা নিয়ে পদব্রজেই আসছিলেন। তিনিও একটা জঙ্গলের পাশে সেই সুদীর্ঘ ভয়াবহ মূর্ত্তিটিকে অস্পষ্টভাবে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। সেদিন কতকটা স্পষ্ট চাঁদের আলো ছিল বটে কিন্তু জঙ্গলের ছায়া ঘেঁসে মূর্ত্তিটা এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল যে ভালো করে কিছুই দেখবার যো ছিল না। সেদিনও মূর্ত্তিটা রিভলবার ছুঁড়ে ভয় দেখিয়ে মৃণালবাবুর গহনাগুলো কেড়ে নিয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দেয়। সেবারেও পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে পাওয়া যায় কেবল একগাছা লম্বা বাঁশ।

এইবার তৃতীয় ঘটনা। শশীপদ আমার প্রতিবেশী। কলকাতার বড়বাজারে তার কাপড়ের দোকান। ফি শনিবার সে দেশে আসে—গেল শনিবারেও আসছিল। তখন সন্ধ্যা উৎরে গিয়েছিল, কিন্তু চাঁদ ওঠেনি। ষ্টেশন থেকে সহরে আসতে আসতে পথের একটা মোড় ফিরেই শশীপদ সভয়ে দেখতে পায় সেই অসম্ভব ঢ্যাঙা বীভৎস মূর্ত্তি-টাকে। অবশ্য ভালো করে সে কিছুই দেখতে পায়নি, কেবল এইটুকুই বুঝেছিল যে মূর্ত্তিটা সাধারণ মানুষের চেয়ে প্রায় দুইগুণ উঁচু। সেদিনও সে রিভলবার ছুঁড়ে শশীপদর কাছ থেকে সাত হাজার টাকা হস্তগত করে। শশীপদ দৌড়ে একটা জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ে। তারপর সেইখানে বসেই শুনতে পায় খটাখট খটাখট করে কিসের শব্দ। ক্রমেই দূরে গিয়ে সে শব্দ মিলিয়ে যায়। শশীপদ ভয়ে সারা রাত বসেছিল জঙ্গলের ভিতরেই। সকালে বাইরে এসে পথের উপরে দেখতে পায় একগাছা বাঁশ।

জয়ন্ত, এই তো ব্যাপার। পরপর তিন তিনটে অদ্ভুত ঘটনা ঘটায় আমাদের শহর রীতিমত আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার পর দলে খুব ভারি না হলে পথিকেরা ষ্টেশন থেকে ও পথ দিয়ে শহরে আসতে চায় না। অনেকেই মূর্ত্তিটাকে অলৌকিক বলেই ধরে নিয়েছে। এখন তোমার মত কি?

জয়ন্ত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কয়েক মিনিট। তারপর ধীরে ধীরে বললে, ঘটনাগুলোর মধ্যে কি-কি লক্ষ্য করবার আছে, তা দেখ। বাংলাদেশে নয় ফুট উঁচু মানুষ থাকলে এতদিনে সে সুবিখ্যাত হয়ে

পড়ত। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে অপরাধী নয় ফুট উঁচু নয়। সে দেহের নীচের দিকটা ঘাঘরায় বা ঘেরাটোপে ঢেকে রাখে কেন? তার মুখ অমানুষিক বলে মনে হয় কেন? সে একটা লম্বা বাঁশ হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকে, আবার বাঁশটাকে ঘটনাস্থলে ফেলে রেখে যায় কেন? সে প্রত্যেকবারেই চেষ্টা করে, তার চেহারা কেউ যেন স্পষ্ট করে দেখতে না পায়।—কেন? শশীপদ শুনেছে, খটাখট্ খটাখট্ করে একটা শব্দ ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে।—কিসের শব্দ?

সুন্দরবাবু বললেন, তুমি কিছু অনুমান করতে পারছ?

—কিছু কিছু পারছি বৈকি। হরেন, ঐ তিনটে ঘটনায় যাঁদের টাকা খোয়া গিয়েছে, তাঁরা কি সহরের বিভিন্ন পল্লীর লোক?

—না, তাঁরা সকলেই প্রায় এক পাড়াতেই বাস করেন।

—তবে তোমাদের পাড়ায় বা পাড়ার কাছাকাছি কোথাও বাস করে এই অপরাধী।

—কেমন করে জানলে?

—নইলে ঠিক কোন্ দিনে কোন সময়ে কোন ব্যক্তি প্রচুর টাকা নিয়ে দেশে ফিরে আসবে, অপরাধী নিশ্চয়ই সে খবর রাখতে পারত না।

—না জয়ন্ত, আমাদের পাড়ায় কেন, আমাদের সহরেও নয় ফুট উঁচু লোক নেই।

—আমিও ও-কথা জানি। আপাতত বেশী কিছু বুঝেও কাজ নেই। আমাকে কিঞ্চিত চিন্তা করবার সময় দাও। তুমি আজই দেশে ফিরে যাচ্ছ তো?

—হ্যাঁ।

—পরশুদিনই আমার কাছ থেকে একখানা জরুরি চিঠি পাবে। আমার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। তার ঠিক এক সপ্তাহ পরে তুমি কলকাতায় এসে আমাদের নিয়ে যাবে।

হরেন চলে গেল। জয়ন্ত যেন নিজের মনেই গুনগুন করে বলল, খটাখট্। মূল্যবান সূত্র।

॥ তিন ॥

নির্দিষ্ট দিনে দুপুরবেলায় হরেন এসে হাজির।

জয়ন্ত সুধালো, চিঠিতে যা যা বলেছি ঠিক সেই মত কাজ করেছ তো?

—অবিকল।

—মানিক, সুন্দরবাবুকে ফোন করে জানাও, আজ সাড়ে পাঁচটার ট্রেনে যাত্রা করব।

প্রায় সাড়ে সাতটার সময় তারা হরেনদের দেশে এসে নামল।

আকাশ সেদিন নিশ্চন্দ্র। ষ্টেশন থেকে সহরে যাবার রাস্তায় সরকারি তেলের আলোগুলো অনেক তফাতে থেকে মিট-মিট করে জ্বলে যেন অন্ধকারের নিবিড়তাকে আরো ভালো করে দেখবার চেষ্টা করছিল। নির্জন পথ, আশেপাশের ঝোপ-ঝাড়ের বাসিন্দা কেবল মুখর ঝিল্লির দল। দুইখানা সাইকেল-রিক্সায় চড়ে তারা যাচ্ছিল। প্রথম গাড়ীতে বসেছিল হরেন ও মানিক। দ্বিতীয় গাড়ীতে জয়ন্ত ও সুন্দরবাবু।

সুন্দরবাবু বললেন, তুমি কি যে বুঝেছ তা তুমিই জানো, আমি ছাই এ ব্যাপারটার ল্যাজামুড়ো কিছুতেই ধরতে পারছি না!

জয়ন্ত বললে, ঘটনাগুলো আমিও শুনেছি, আপনিও শুনেছেন। তারপর প্রধান প্রধান সূত্রের দিকে আপনার দৃষ্টিও আকর্ষণ করতে ছাড়িনি। মাথা খাটালে আপনি অনেকখানিই আন্দাজ করতে পারতেন।

—মস্তক যথেষ্ট ঘর্মাক্ত করবার চেষ্টা করেছি ভায়া কিন্তু খানিকটা ধোঁয়া (তাও গাঁজার ধোঁয়া) ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনি।

—মুটেরাও মস্তককে যথেষ্ট ঘর্মাক্ত করে, কিন্তু তারা উপলব্ধি করে কতটুকু। সুন্দরবাবু, আমি আপনাকে মস্তক ঘর্মাক্ত করতে বলছি না, মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে বলছি।

—একটা শক্ত রকম গালাগালি দিলে বটে, কিন্তু তোমার কি বিশ্বাস, আজকেই তুমি এই মামলাটার কিনারা করতে পারবে?

—হয়তো পারবো, কারণ অপরাধীরা প্রায়ই নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করে বিপদে পড়ে। হয়তো পারব না, কারণ কোন কোন অপরাধী নিজের নির্দিষ্ট পদ্ধতি ত্যাগ করতেও পারে। কিন্তু হুঁসিয়ার! পথের মাঝখানে আবছায়া গোছের কি-একটা দেখা যাচ্ছে না।

—হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে বটে। মুক্ত আকাশের স্বাভাবিক আলো দেখিয়ে দিলে, অন্ধকারের মধ্যে একটা অচঞ্চল, নিশ্চল ও সুদীর্ঘ ছায়ামূর্তি। বাতাসে ন'ড়ে চ'ড়ে উঠছে কেবল তার পরণের জামা-কাপড়গুলো।

আচম্বিতে একটা অত্যন্ত কর্কশ ও হিংস্র চীৎকার চারদিকের নিস্তব্ধতাকে চমকে দিয়ে জেগে উঠল—'এই! থামাও গাড়ী, থামাও গাড়ী।' সঙ্গে সঙ্গে রিভলবারের শব্দ!

কিন্তু তার আগেই অতি সতর্ক জয়ন্ত ছুটন্ত গাড়ী থেকে বাঘের মত লাফিয়ে পড়েছে এবং গর্জন করে উঠেছে তারও হাতের রিভলবার।

গুলী গিয়ে বিদ্ধ করল মূর্তির ডান হাতখানা, তার রিভলবারটা খসে পড়ল মাটির উপরে সশব্দে। কেবল রিভলবার নয়, আর একটাও কি মাটিতে পড়ার শব্দ হল—বোধহয় বংশদণ্ড! অস্ফুট আর্তনাদ করে মূর্তিটা ফিরে দাঁড়িয়ে পালাবার উপক্রম করলে; কিন্তু পালাতে পারল না; এক সেকেণ্ড টলটলায়মান হয়েই হুড়মুড় করে লম্বমান হ'ল একেবারে পথের উপর।

দপ্ দপিয়ে জ্বলে উঠল চার-চারটে টর্চের বিদ্যুৎ-বহ্নি!

জয়ন্ত ক্ষিপ্র হস্তে ভূপতিত মূর্তিটার গা থেকে কাপড়-চোপড়গুলো টান মেরে খুলে দিলে। দেখা গেল, তার দুই পদের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে আছে দুইখানা সুদীর্ঘ যষ্টি—ইংরিজিতে যাকে বলে ষ্টিল এবং বাংলায় যাকে বলে 'রণ-পা'।

জয়ন্ত বললে, দেখছি এর মুখে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড মুখোস—কাফ্রির মুখোস। এখন মুখোসের তলায় আছে কার শ্রীমুখ, সেটাও দেখা যেতে পারে। আর একটানে খসে পড়ল মুখোসও।

হরেন সবিস্ময়ে বলে উঠল, আরে এ যে দেখছি আমাদের পাড়ার

বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো রামধন মুখুয্যে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ও কুপথে যায়, কু-সঙ্গীদের দলে মেশে, নেশাখোর হয়, জুয়া খেলে, পাড়ার লোকদের উপরে অত্যাচার করে ; এর জন্যে সবাই ত্রস্ত, ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু এর পেটে পেটে যে এমন শয়তানী এটা তো আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

॥ চার ॥

জয়ন্ত বললে, সুন্দরবাবু, প্রধান প্রধান সূত্রের কথা আগেই বলেছি, এখন সব কথা আবার নতুন করে বলবার দরকার নেই। কেবল দু'তিনটি ইঙ্গিত দিলেই যথেষ্ট হবে। গোড়া থেকেই আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, অপরাধী হরেনেরই পাড়ার লোক। সে পাড়ায়—এমন কি সে সহরেও নয় ফুট উঁচু কোন লোকই নেই। সুতরাং ধরে নিলুম সে উঁচু হয়েছিল কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে। অপরাধের সময় সে আবছায়ায় অবস্থান করে—পাছে কেউ তার কৃত্রিম উপায়টা আবিষ্কার করে ফেলে ; তাতেই আমার ধারণা হ'ল দৃঢ়মূল। এখন সেই কৃত্রিম উপায়টা কি হতে পারে। শশীপদ শুনেছিল খটাখট্ খটাখট্ করে কি একটা শব্দ ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে। এই নিয়ে ভাবতে ভাবতে ধাঁ করে আমার মাথায় আসে 'রণ-পা'র কথা। 'রণ-পা'র উপরে আরোহণ করলে মানুষ কেবল উঁচু হয়ে উঠে না, খুব দ্রুত-বেগে চলাচলও করতে পারে। সেকালে বাংলাদেশের ডাকাতরা এই রণ-পায় চড়ে এক এক রাতেই পঞ্চাশ-ষাট মাইল পার হয়ে যেতে পারত। পদক্ষেপের সময়ে রণ-পা যখন মাটির উপরে পড়ে, তখন খটাখট্ শব্দ হয়। কিন্তু রণ-পায় উঠে কেউ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, টাল সামলাবার জন্যে চলাফেরা করতে হয়। অপরাধী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্যে একগাছা বাঁশের সাহায্য গ্রহণ করত। কার্যসিদ্ধির পর বাঁশটাকে সে ঘটনাস্থলেই পরিত্যাগ করে যেত, কারণ রণ-পায় চড়ে দৌড়বার সময় এতবড় একটা বাঁশ হয়ে ওঠে উপসর্গ মত।

সুন্দরবাবু বললেন, হুম্, এ সব তো বুঝলুম, কিন্তু আসামী এমন

বোকার মত আমাদের হাতে ধরা দিল কেন, সেটাতো বোঝা যাচ্ছে না।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, ওটা আমার কল্পনাশক্তির মহিমা। আগেই বলেছি তো, অপরাধীরা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করতে গিয়েই বিপদে পড়ে। 'অপরাধী সর্বদাই খবর রাখতো, পাড়ার কোন ব্যক্তি কবে কি করবে বা কি করবে না। আমার নির্দেশ অনুসারে হরেন রটিয়ে দিয়েছিল, কলকাতায় ব্যাঙ্কের পর ব্যাঙ্ক ফেল হচ্ছে, সে ব্যাঙ্কে আর নিজের টাকা রাখবে না। অমুক তারিখে কলকাতায় গিয়ে সব টাকা তুলে নিয়ে আসবে। অপরাধী এ টোপ না গিলে পারেনি।

সুন্দরবাবু বললেন, একেই বলে, ফাঁকতালে কিস্তিমাত।

ছত্রপতির ছোরা

সুন্দরবাবুর শাস্তিভোগ

—আজ সাতদিন আপনার দেখা নেই। আজ সাতদিন চায়ের আসরে আপনার আসন খালি প'ড়ে আছে। সুন্দরবাবু, এজন্যে আপনাকে শাস্তি নিতে হবে।

—কি শাস্তি দিতে চাও জয়ন্ত?

—সুকঠোর শাস্তি। আজ একাসনে ব'সে গলধঃকরণ করতে হবে সাত পেয়ালা চা, সাতখানা টোষ্ট, আর সাতটা এগ্‌পোচ্‌।

—ওঃ! তাহলে তো সুন্দরবাবু আনন্দের সপ্তমস্বর্গে আরোহণ করবেন। ভারি কঠিন শাস্তি দিতে চাও তো জয়ন্ত। মানিক বললে হাসতে হাসতে।

সুন্দরবাবু বললেন, মানিকের ছেঁড়া কথায় কান পেতো না জয়ন্ত। তোমার শাস্তি যে অত্যন্ত কঠোর শাস্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখো, দস্তুরমত ম্লানমুখে আর দুঃখিতভাবেই ঐ

শাস্তি আমি গ্রহণ করব। আনন্দিত হব কি, মুখ টিপে একটুখানি হাসব না পর্যন্ত।

জয়ন্ত বললে, বেশ, তাহ'লে চেয়ারে বসে পড়ুন। শাস্তির জন্যে প্রস্তুত হোন।

—হুম্! আমি প্রস্তুত।

—এতদিন আসেন নি কেন?

—পরে বলবো। আগে শাস্তি দাও। সাত পেয়ালা চা, সাতখানা টোষ্ট, সাতটা এগ্-পোচ্। উঃ, কল্পনাতীত শাস্তি!

মিনিট সাতেকের মধ্যে নস্যাৎ করে দিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, এই-বার তোমাদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে সপ্তপেয়ালা চায়ের সদ্ব্যবহার করব। বলো কি জানতে চাও?

—এতদিন কি করছিলেন?

—তদন্ত।

—নতুন মামলা বুঝি?

—হুম্! এমন মামলা যে সামলানো দায়।

—কি রকম?

—খুনের মামলা কিন্তু একেবারে সূত্রহীন—অর্থাৎ খুনী কুত্রাপি সূত্র-টুত্র কিছুই রেখে যায়নি। অগাধ জলে সাঁতার কাটতে কাটতে হাঁফিয়ে উঠেছি ভায়া।

—মামলাটার বিবরণ শুনতে পাই না?

—শুনবে বৈকি, শুনবে বৈকি! শোনাবার জন্যেই তো আমার শুভাগমন। আচ্ছা, একটু সবুর কর। আর মোটে দু' পেয়ালা চা বাকি আছে। বোসো, এক এক চুমুকে সেটুকু সাবাড় করে দি। হুম্ এখন তোমার মত কি মানিক? আমি কি রীতিমত হর্ষহীন বিমর্ষ মুখে জয়ন্তর দেওয়া কঠোর শাস্তি ভোগ করলুম না? আমি কি একবারও হেসেছি—একবারও আনন্দ প্রকাশ করেছি? অতএব সাবধান, ভবিষ্যতে আর কখনো আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দিও না।

মানিক বললে, আজ একটা ব্যাপার আপনি প্রমাণ করলেন বটে।

—কি ?

—পুলিশ কেবল জবরদস্তী করতেই জানে না, খাসা অভিনয় করতেও জানে।

—অভিনয় ?

—হ্যাঁ, প্রথম শ্রেণীর অভিনয়। আপনি ইচ্ছা করলে শিশির ভাদুড়ীর অন্নও মারতে পারেন।

—জয়ন্ত, তোমার স্যাঙাতটি হচ্ছে অতিশয় হাড়-ট্যাঁটা! ও আমাকে আবার নতুন দিক দিয়ে আক্রমণ করতে চায়। এবার কিন্তু আমি ক্রুদ্ধ হবার চেষ্টা করব।

মানিক কৃত্রিম অনুনয়ের স্বরে বললে, দোহাই সুন্দরবাবু, আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক—আপনি দয়া করে একটিবার ক্রুদ্ধ হোন।

সুন্দরবাবু থতমত খেয়ে বললেন, মানে ?

—মানে হচ্ছে এই যে আপনি ক্রুদ্ধ হ'লেই আপনাকে নিয়ে বেশী মজা করা যায়।

—আমাকে নিয়ে মজা ?

—হ্যাঁ দাদা!

—আমাকে নিয়ে মজা করতে চাও ?

—তা ছাড়া আর কি!

—তাহলে আমি কিছুতেই ক্রুদ্ধ হব না।

—তবে হাস্য করুন।

—না, আমি আর ক্ষুব্ধ কি ক্রুদ্ধও হব না, হাস্যও করব না।

—তবে মুখটি বুঁজে চুপটি করে বসে থাকুন।

—না, আমি মুখটি বুঁজে চুপটি করে বসেও থাকব না। আমি এখন জয়ন্তের কাছে আমার মামলার কথা বলব।

মানিক নাচারভাবে বললে, তথাস্তু।

॥ দুই ॥

হত্যানাট্যের পাত্র-পাত্রী

সুন্দরবাবু বললেন, জয়ন্ত তুমি বসন্তপুরের স্বর্গীয় জমিদার রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের নাম শুনেছ ?

—শুনেছি। তিনি দানশীল ব্যক্তি ছিলেন।

—হ্যাঁ, তাঁর দুই পুত্র—হীরেন্দ্রনারায়ণ, দীনেন্দ্রনারায়ণ। এক কন্যা সৌদামিনী দেবী। জ্যেষ্ঠ পুত্র হীরেন্দ্র চিরকুমার, কনিষ্ঠ দীনেন্দ্র পিতার জীবদ্দশাতেই বিপত্নীক হয়ে এক পুত্র রেখে মারা পড়েন, ছেলেটির নাম দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ নানাদিক দিয়ে গুণী হয়েও অত্যন্ত একরোখা ও কৃপণস্বভাব ছিলেন, ছেলেদের সঙ্গে তাঁর বনিবনাও হ'ত না। ব্যাপার ক্রমে এমন চরমে ওঠে যে, হীরেন্দ্র ও দীনেন্দ্র পিতৃগৃহ ত্যাগ ক'রে চ'লে যান। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ উইল ক'রে সমস্ত সম্পত্তি দান করেন কন্যা সৌদামিনীদেবীকে। সৌদামিনীর বিবাহ হয়। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ হঠাৎ সন্ন্যাস-রোগে মারা পড়েন। তারপর জননী হবার আগেই বছর ঘুরতে না ঘুরতে সৌদামিনী হন বিধবা।

জয়ন্ত বললে, এ যে দেখছি দুর্ভাগ্যের ইতিহাস।

—হ্যাঁ, এর সমাপ্তিও বিয়োগান্ত। কলকাতার উপকণ্ঠে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের একখানা অট্টালিকা আছে। বিধবা হবার পর থেকে সৌদামিনী সেইখানেই বাস ক'রে আসছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হীরেন্দ্র তাঁর কাছ থেকে মাসিক হাজার টাকা ক'রে সাহায্য পেতেন। তিনি মাঝে মাঝে ভগ্নীর সঙ্গে দেখা ক'রেও যেতেন। কনিষ্ঠ দীনেন্দ্রর পুত্র দ্বিজেন্দ্র পিতার মৃত্যুর পর পিতামহের বাড়ীতেই বাস করেন, বলা বাহুল্য যে সৌদামিনীর ইচ্ছানুসারেই। সৌদামিনীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে এই ভ্রাতুষ্পুত্রই। এখন আমার সঙ্গে ব্যাপারটার সম্পর্ক কি শোন : আজ আটদিন হ'ল, সৌদামিনীদেবী হঠাৎ মারা পড়েছেন। স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, অপঘাত-মৃত্যু।

—হত্যাকাণ্ড?

—হ্যাঁ। একদিন সকালে দাসী ঘরে ঢুকে দেখে, বিছানার উপরে প'ড়ে রয়েছে সৌদামিনীর মৃতদেহ—বক্ষে তাঁর অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। হত্যাকারী যে কে—ধরবার কোন উপায়ই নেই। ঘটনাস্থলে গিয়ে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে আমি একটিমাত্র সূত্রও আবিষ্কার করতে পারি নি। কেবল এইটুকু আন্দাজ করতে পেরেছি, হত্যাকারী বাড়ীর বাইরে থেকে আসেনি।

—এমন আন্দাজের কারণ?

—সৌদামিনীর শয়ন-গৃহের প্রত্যেক জানালা ছিল ভিতর থেকে বন্ধ। ঘরের দরজা রাত্রে অর্গলবদ্ধ থাকত না বটে, কিন্তু সেই দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে হ'লে আরো দুটি এমন ঘরের ভিতর দিয়ে আসতে হয়, যার প্রত্যেকটিতেই থাকে অন্য অন্য লোক।

—আপনি কি সন্দেহ করেন বাড়ীর কোন লোকই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী।

—বাড়ীর সব লোককেই প্রশ্ন ক'রে বুঝেছি, তারা প্রত্যেকেই সন্দেহের অতীত।

—বাড়ীর লোকদের কথা বলুন।

—প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়েও সৌদামিনী একান্ত সাধারণ-ভাবেই জীবন-যাপন করতেন। অট্টালিকার মধ্যে বাসিন্দা আছে মাত্র গুটিকয়। তিন-মহলা বাড়ী। প্রথম দুটো মহল এক-রকম তালাবন্ধ থাকে বললেই চলে। একটিমাত্র মহলই ব্যবহার করতেন সৌদামিনী। যে ঘরের ভিতর দিয়ে সৌদামিনীর ঘরে ঢোকা যায়, সেখানে থাকে তাঁর নিজস্ব পুরাতন দাসী। বয়স পঞ্চাশ, নাম উমাতারা। সে সাধারণ দাসী নয়, গরীব কায়স্থের মেয়ে, বিধবা। ঘটনার দিন সে পাড়ার এক বিয়ে বাড়ীতে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল। রাত একটার সময়ে ফিরে আসে। সৌদামিনীদেবী তখন জীবিত ছিলেন কিনা সে বলতে পারে না, কারণ নিজের ঘরে ফিরে এসেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। সে-ই সকালে উঠে প্রথমে সৌদামিনীকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়।

তার ঘরের দরজা দিয়েই আসা যায় পবিত্রবাবুর ঘরে। তাঁর বয়স পঞ্চাশ বছর—এই পরিবারের কাজ করছেন দীর্ঘ পঁচিশ বছর। এখন নায়েবের পদে মোতায়েন। একরকম ঘরেরই লোক আর অত্যন্ত বিশ্বাসী। নিঃসন্তান। সহধর্ম্মিণী সুরবালার সঙ্গে এই বাড়ীতেই বাস করেন। কথায়-বার্তায়, হাব-ভাব, ব্যবহারে অতিশয় অমায়িক। তিনিও পাড়ার ঐ বাড়ীতে গিয়ে খানিকক্ষণ থিয়েটার দেখে রাত এগারোটার সময় বাড়ীতে আসেন। সুরবালার বয়স বিয়াল্লিশ। তিনি হাঁপানি রোগে প্রায় শয্যাশায়িনী। ঘটনার দিন বাড়ীতেই ছিলেন না, পিত্রালয়ে গিয়েছিলেন।

এই ঘরের পাশেই একখানা ছোট ঘর। সেখানে থাকে এক প্রৌঢ়া ব্রাহ্মণী বিধবা। রান্নাঘরের ভার তার উপরেই। নাম বিন্দুবালা সঙ্গে থাকে তার অবিবাহিতা কন্যা সিন্দুবালা। বয়স পনেরো, রান্নাঘরের কাজে মাকে সাহায্য করে।

মহলের একদিকে তিনখানা ঘর নিয়ে বাস করে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ। বয়স পঁচিশ। সুশিক্ষিত। কলেজের পড়া সাঙ্গ করেছে। কাব্যব্যধিগ্রস্থ, মাসিক পত্রিকায় কবিতা লেখে। খবর নিয়ে জেনেছি সচ্চরিত্র। স্বভাব কিঞ্চিৎ 'রোমান্টিক'। মাসে দুশো টাকা হাত-খরচা পায়। পান সিগারেট পর্যন্ত খায় না।

বাকি রইল আর একজনের কথা। তার নাম মানসী। বয়স বিশ বছর, পরমা সুন্দরী। সুমধুর প্রকৃতি, সুশিক্ষিতা। সৌদামিনীর স্বামীর দূর-সম্পর্কের আত্মীয়া। পিতামাতার মৃত্যুর পর সে একান্ত অসহায় হয়ে পড়াতে সৌদামিনী তাকে নিজের কাছে এনে রেখেছেন। আজ দুই বছর সে এখানেই বাস করছে। উঠতে-বসতে তাকে ছাড়া সৌদামিনীর একদণ্ডও চলে না। আগে নায়েব পবিত্রবাবুই ছিলেন সৌদামিনীর ডানহাতের মত, মানসী আসবার পর থেকেই তাঁর প্রভুত্ব ধীরে ধীরে ক'মে এসেছে। পবিত্রবাবুর কথাবার্তা শুনে ধারণা হ'ল এজন্যে তিনি মনে মনে মানসীর উপরে বিশেষ খুশী নন। তা এটা স্বাভাবিক।

বাড়ীর ভিতরে বাস করে এই কয়জন লোক। আর আছে দু'জন দ্বারবান, তিনজন বেয়ারা, দুজন মালী। সকলেই পরীক্ষিত, পুরাতন লোক। তারা রাত্রে বাড়ীর ভিতরেও থাকে না। তাদের জন্যে বাড়ীর বাইরে বাগানের ভিতর আলাদা ঘর আছে। আর তারা কিসের লোভে নরহত্যা করবে? সৌদামিনীর ঘর থেকে মূল্যবান কোন জিনিসই চুরি যায় নি। একজন ঠিকে ঝি আছে, বাসন-কোসন মেজে দিয়ে চলে যায়।

যে-সব বাড়ীর লোকের কথা বললুম, সৌদামিনীর জীবনের সঙ্গে প্রত্যেকেরই স্বার্থ জড়িত। সৌদামিনী বেঁচে থাকলেই লাভ। সৌদামিনীর মৃত্যুর পর তাদের চাকরি যাবার সম্ভাবনা। সম্পত্তি পেয়ে দ্বিজেন কি করবে, না করবে কে বলতেপারে? মানসী চাকরী করে না বটে কিন্তু সৌদামিনীর মৃত্যুর পর আবার তার অবস্থা হয়েছে অসহায়। সে দ্বিজেনদের কেউ নয়। দ্বিজেন তাকে গ্রহণ করবে কিনা সন্দেহ।

মানিক বললে, কিন্তু সৌদামিনীর মৃত্যুতে দ্বিজেন কি লাভবান হবে না?

— মানিক, অপরাধীদের নিয়ে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললুম, দুষ্ট লোক কি আমার চোখে ধুলো দিতে পারে! অপরাধীদের টাইপ'ই আলাদা। দ্বিজেনের সম্বন্ধে নানা জনের কাছ থেকে খবরাখবর নিয়ে আমি তার কোন দোষই আবিষ্কার করতে পারিনি। বিশেষ করে দ্বিজেনের মুখের উপরেই আছে তার মনের উজ্জ্বল পরিচয়। এমন শিশুর মত সরল পবিত্র মুখ সচরাচর চোখে পড়ে না।

জয়ন্ত সুধোলে, সৌদামিনীর দাদা হীরেন্দ্রনারায়ণ কি রকম লোক?

—খোঁজ নিয়েছি। সুবিধের লোক নয়, মাতাল, জুয়াড়ী। একা থাকে, অথচ হাজর টাকা মাসোহারা পেয়েও নিজের খরচ কুলোতে পারে না। সৌদামিনীর মৃত্যুর হপ্তাখানেক আগেও সে বোনের কাছে আরো টাকা চাইতে এসেছিল, কিন্তু টাকা পায়নি। তাই ভাই-বোনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। হীরেন রাগ করে চলে যায়। কিন্তু তবু তাকে সন্দেহ করবার উপায় নেই।

—কেন ?

—প্রথমত, খুনী বাইরে থেকে এসেছে এমন কোন প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়ত, ভগ্নীহত্যা করে হীরেন নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারতে যাবে কেন ? সৌদামিনীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তার হাজার টাকা মাসোহরা বন্ধ হবার সম্ভাবনা।

—এখন সৌদামিনীর সম্বন্ধে আরো কিছু বলতে পারেন ?

—পারি। মৃত্যুকালে সৌদামিনীর বয়স হয়েছিল পঁয়ষট্টি। একহারা, শুখ্‌নো চেহারা, কিন্তু খুব শক্ত। আরো পনের-বিশ বছর অনায়াসে যমকে কলা দেখাতে পারতেন। বাপের মতন তিনিও ছিলেন বিষম একরোখা, কৃপণ-প্রকৃতি। ভালো-মন্দ যা কিছু স্থির করতেন, তার আর নড়চড় হবার যো ছিল না। বাড়ীর লোকের কারুর তুচ্ছ ত্রুটি-বিচ্যুতিও সহ্য করতে পারতেন না, একেবারে আগুন হয়ে উঠতেন। তার উপরে ছিলেন বেজায় রাশভারি মানুষ। মানসী আর পবিত্রবাবু ছাড়া আর কেউ সহজে তাঁর কাছে ঘেঁষতে সাহস করত না। প্রত্যেকেই তাঁকে ভয় করত, কেউ ভালোবাসত বলে মনে হয় না।

—এতদিনে নিশ্চয়ই শব-ব্যবচ্ছেদ হয়েছে ?

—তা হয়েছে বৈকি।

—হত্যাকারী কি রকম অস্ত্র ব্যবহার করেছে ?

—ডাক্তারের মতে, ছোরা। কিন্তু ঘটনাস্থলে ছোরা-টোরা কিছুই পাওয়া যায় নি।

—পদচিহ্ন, আঙুলের ছাপ ?

—কিছু না, কিছু না।

—ডাক্তারের মতে সৌদামিনী মারা পড়েছেন কখন ?

—আন্দাজ রাত এগারোটা কি বারোটা।

জয়ন্ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল। তারপর বললে, সুন্দরবাবু মামলাটা বেশ অসাধারণ। বুড়ি মেরে অকারণে কেউ খুনের দায়ে পড়তে চায় কেন ?

—হুম, আমারও ঐ প্রশ্ন।

—কিন্তু বুড়িকে নিশ্চয়ই কেউ অকারণে খুন করেনি। তলে তলে

মস্ত একটা রহস্য আছে। আমি এইরকম রহস্যময় মামলাই পছন্দ করি।

সুন্দরবাবু জোরে মস্তকান্দোলন করে বললেন, আমি কিন্তু মোটেই পছন্দ করি না। সূত্রহীন মামলা ঘাড়ে পড়লে পুলিশকে কেবল নাকানি-চোবানি খেয়ে মরতে হয়।

—সূত্রহীন মামলা প্রমাণিত করে অপরাধীর চাতুর্য্য। কিন্তু কে বললে এ মামলাটা সূত্রহীন?

—সূত্র আছে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের বাড়ির ভিতরে।

—কি যে ছাই বল! আজ ক'দিন ধরে বাড়ীর ভিতরটা কী আমি খুঁজতে বাকি রেখেছি! সেখানে সূত্রের নামগন্ধও নেই!

—তাহলে হত্যাকারী বাইরের লোক।

—অসম্ভব!

—দেখা যাক! আপনি এক কাজ করতে পারেন?

—বল।

—আপনি বললেন, নরেন্দ্রনারায়ণের বাড়ীর দুটো মহলে কেউ বাস করে না। আমি আর মানিক ওই দুটো মহলের কোন একটায় সপ্তাহখানেক থাকতে পারি, এমন ব্যবস্থা কি হয় না?

—খুব সহজেই হয়, ধরতে গেলে দ্বিজেনই এখন বাড়ীর মালিক। আমি প্রস্তাব করলে নিশ্চয়ই সে নারাজ হবে না।

—তবে তাই করুন।

—ওখানে গিয়ে থাকলেই কি সূত্র বেরিয়ে পড়বে মাটি ফুঁড়ে?

—মাটি ফুঁড়ে না বেরুক, মানুষের মন ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়তে পারে তো! অপরাধী যদি বাড়ীর ভিতরে থাকে তাহলে আমি তাকে আবিষ্কার করতে পারব।

॥ তিন ॥

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের প্রবেশ।

কলকাতার উপকণ্ঠ বটে, কিন্তু জায়গাটার মধ্যে পল্লীগ্রামের ছাপ।

একখানা প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা, তার চারধারে বাগান। ফটক দিয়ে জয়ন্তদের মোটর বাগানের ভিতর প্রবেশ করল।

সুন্দরবাবু বললে, এই হচ্ছে নরেন্দ্রনারায়ণের শহরতলীর প্রাসাদ।

মানিক বললে, এক সময়ে হয়তো এটা প্রাসাদই ছিল, কিন্তু এখন ওর মধ্যে প্রাসাদত্ব কিছুই নজরে পড়ে না। কত বছর সংস্কার হয়নি কে জানে। বাগানেও নেই বাগানত্ব।

সুন্দরবাবু বললেন, হুঁ, সৌদামিনী দেবী ও-সব বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন। কেবল যে মহলে নিজে বাস করতেন, একটু-আধটু নজর দিতেন তার দিকেই। ঐ যে আমাদের মোটরের শব্দ পেয়ে দ্বিজেন নিজেই নীচে নেমে আসছে।

গাড়ী এসে থামল গাড়ী-বারান্দার তলায়। একটি তরুণ যুবক এসে নমস্কার করে বলল, সুন্দরবাবু, এঁরাই কি দয়া করে আমাদের এখানে অতিথি হবেন?

সুন্দরবাবু বললেন, হ্যাঁ, এঁদেরই নাম জয়ন্তবাবু আর মাণিক-বাবু। জয়ন্ত, ইনি হচ্ছেন, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায়।

দ্বিজেন বললে, দুনিয়ার ভালো মন্দ কিছুই ব্যর্থ হয় না। আমার দুর্ভাগ্যের জন্যেই এদের মত' বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হবার সৌভাগ্য অর্জন করলুম।

জয়ন্ত বললে, কিন্তু আমি হয়তো আবার এখানকার কারুর না কারুর দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়াব।

দ্বিজেনের মুখের উপর ঘনিয়ে উঠল একটা ছায়া। তাড়াতাড়ি সে হাসবার চেষ্টা করলে, কিন্তু হাসিটা ভাল করে জমল না।

সুন্দরবাবু সুধোলেন, দ্বিজেনবাবু, আমার বন্ধুরা ঠাঁই পাবেন কোন মহলে?

দ্বিজেন বললে, সদর মহলে। ঠাকুরদার আমলে এখানে অনেক অতিথি অভ্যাগতদের আগমন হ'ত। অনেকেই পাঁচ-দশদিন থেকে যেতেন, তাঁদের জন্যে যে ঘরগুলো নির্দিষ্ট ছিল। তারই দু'খানা ঘর ওঁদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি। একেবারে সেইখানেই চলুন।

গোড়া থেকেই জয়ন্ত লক্ষ্য করছিল দ্বিজেনের চেহারা, ভাবভঙ্গি সাজসজ্জা। সুন্দর সুমিষ্ট মুখশ্রী, ছিপছিপে সুগঠিত দেহ, পরিচ্ছন্ন সাজসজ্জায় সৌখীনতা নেই, আছে সুরুচির পরিচয়। মৌখিকভাবে শিশুসুলভ সরলতা থাকলেও চিন্তাশীলতার অভাব নেই। কণ্ঠস্বরও মার্জিত। অপরাধীদের মধ্যে এ-শ্রেণীর লোক দেখা যায় না।

কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা বিশেষত্ব আকৃষ্ট করলে জয়ন্তর দৃষ্টিকে। দ্বিজেনের ভাবভঙ্গি কেমন সঙ্কুচিত এবং তার চক্ষে কেমন একটা সন্দেহের ছাপ! জয়ন্তের মনে বারংবার প্রশ্ন জাগতে লাগল—কেন? কেন? কেন?

সুন্দরবাবু বললেন, সৌদামিনীদেবী পিতার সম্পত্তির মালিক হয়েও তার সদ্ব্যবহার করেন নি কেন?

দ্বিজেন বললে, বিধবা হবার পর থেকেই আমার পিসিমা সংসারের উপরে সমস্ত আস্থাই যেন হারিয়ে ফেলেছিলেন।

—কিন্তু আপনি আছেন তো?

—পিসিমা বলতেন, আমি বেঁচে থাকতে কেউ আমার বাবার সখের জিনিস হাত না দেয়। তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধে যাবার সাহস ছিল না।

—অথচ আপনিই তাঁর উত্তরাধিকারী।

দ্বিজেন শুষ্ক মৃদু স্বরে বললে, না, আমি তাঁর উত্তরাধিকারী নই।

সচমকে ফিরে দাঁড়িয়ে সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, সেকি!

—আমি আগে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিলুম বটে, কিন্তু এখন আর নই।

—আপনার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না।

দ্বিজেন ম্লান হাসি হেসে বললে, মৃত্যুর তিন দিন আগে পিসিমা এক নতুন উইল করে সমস্ত সম্পত্তি জ্যাঠামশাইকে দিয়ে গিয়েছেন।

—হীরেন্দ্রনারায়ণ রায়কে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এ কথা এতদিন আমাকে বলেননি কেন?

—আমি নিজেই সঠিক খবর জানতুম না। দিন তিনেকের জন্যে

আমি কলকাতার বাইরে গিয়েছিলুম—নতুন উইল হয় সেই সময়ে, আমার অজ্ঞাতসারেই। তারপর কাল আমাদের এ্যাটর্ণিবাবু হরিদাস চৌধুরীর মুখে এই খবরটা জানতে পেরেছি।

—তাহলে সৌদামিনীদেবী যখন মারা পড়েন, তখনও আপনি এ খবর জানতেন না?

—না।

সুন্দরবাবু নিজের মনে মনেই কি যেন ভেবে মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, আপনার জ্যাঠামশাই নতুন উইলের কথা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন?

—না।

—কেন?

—শুনেছেন তো পিসিমার সঙ্গে জ্যাঠামশাইয়ের টাকা নিয়ে মনান্তর হয়েছিল। তার দুই-একদিন পরেই জ্যাঠামশাই কাউকে কিছু না জানিয়েই কলকাতার বাইরে কোথায় গিয়েছেন; কবে ফিরবেন তা কেউ বলতে পারছে না। কাজেই নতুন উইল বা পিসিমার মৃত্যুর খবর এখনো তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছায়নি।

—আপনাদের এ্যাটর্ণির ঠিকানা কি?

দ্বিজেন ঠিকানা দিলে।

ঠিকানা টুকে নিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, আজ আসি জয়ন্ত। একটা জরুরি তদন্ত আছে। কাল আবার আসব।

॥ চার ॥
কায়ার ছায়া

দু'খানি পাশাপাশি মাঝারি আকারের ঘর জয়ন্ত ও মানিকের জন্যে নির্বাচিত হয়েছিল। প্রত্যেক ঘরের দু'দিকেই বারান্দা—একটি ভিতরকার আঙিনার দিকে, আর একটি বাইরেকার বাগানের দিকে।

দ্বিজেন বললে, এ ঘর দু'খানার পরিষ্কার—পরিচ্ছন্নতা দেখে আপনারা অবাক হবেন না। বাসপোযোগী ক'রে তোলবার ভার

গিয়েছিলেন নায়েবমশাই নিজেই। আপনারা আসছেন শুনে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন।

জয়ন্ত শুধোলে, কেন?

—নায়েবমশাইয়ের মতে সরকারি পুলিশ কোনই কর্মের নয়। আপনারা একটু চেষ্টা করলেই নাকি খুনীর ধরা পড়তে বিলম্ব হবে না।

—আপনিও কি এ কথা বিশ্বাস করেন?

—করি।

—আপনার বিশ্বাস হয়তো ভ্রান্ত।

—না জয়ন্তবাবু, আপনার অদ্ভুত শক্তির কথা কে না জানে! অসাধারণ আপনার প্রতিভা। কিন্তু সে কথা এখন থাক। আপনাদের ঘর পছন্দ হয়েছে তো?

—হয়েছে।

ঠিক এই সময়েই ঘরের ভিতরে আর এক ব্যক্তির আবির্ভাব। হৃষ্টপুষ্ট দোহারা চেহারা। শ্যাম বর্ণ। মিষ্ট স্মিত মুখ। সমুজ্জ্বল দৃষ্টি। নিরহঙ্কার ভাবভঙ্গি। বয়সে প্রৌঢ়ত্ব ও বৃদ্ধত্বের সীমারেখায় এসে উপস্থিত হয়েছে বটে কিন্তু মাথার চুলে ও দাড়ী-গোঁফে দেখা দেয়নি এখনো শুভ্রতার চিহ্ন।

তিনি ঘরে ঢুকেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, স্বাগত জয়ন্তবাবু! স্বাগত মানিকবাবু! আমাদের কি সৌভাগ্য! নমস্কার!

জয়ন্ত প্রতি-নমস্কার করে বললেন, আসুন পবিত্রবাবু!

ভদ্রলোক বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, আপনি আমাকে চিনলেন আর নাম জানলেন কেমন করে?

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে পবিত্রবাবু বললেন, অপরং বা কিং ভবিষ্যতি! মশাই আপনি যাদুকর!

জয়ন্ত সবিনয়ে বললে, না মশাই, আমি একান্ত সাধারণ ব্যক্তি।

—না, না, আপনি অসাধারণ মানুষ, তৃতীয় নেত্রের অধিকারী।

—চোখ আমার দুটির বেশী নয়, তবে দুটো চোখকেই সর্বদা আমি সজাগ রাখি বটে। শুনুন তবে। আমি জানি, এ বাড়ীতে দু'জন মাত্র

ভদ্রলোক থাকেন—দ্বিজেনবাবু আর আপনি। কাজেই আপনিই যে পবিত্রবাবু, সেটা বোঝা একটুও কঠিন নয়।

—ঠিক, ঠিক। কিন্তু—

এই বলে পবিত্রবাবু যেমন দ্রুতপদে এসেছিলেন, চলে গেলেন তেমনি দ্রুতপদেই।

জয়ন্ত একটা গোল টেবিলের সামনে বসে পড়ে সামনের আসনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে গম্ভীর স্বরে বললে, বসুন দ্বিজেনবাবু, আপনার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে।

জয়ন্তর কণ্ঠস্বর শুনে দ্বিজেন একটু বিস্মিতভাবে তাকালে তার মুখের পানে। তারপর টেবিলের ওধারে নির্দেশমত চেয়ারে গিয়ে উপবেশন করলে বিনাবাক্যব্যয়ে।

দ্বিজেনের মুখের উপরে স্থির দৃষ্টি রেখে জয়ন্ত বললে, সুন্দরবাবুর কাছে আপনি বললেন, সৌদামিনীদেবী যে নতুন উইল করেছেন, তিনি মারা যাবার পরেও তার সঠিক খবর আপনার জানা ছিল না।

—আজ্ঞে হঁ্যা।

—সঠিক খবর মানে নিশ্চিত খবর তো?

—আজ্ঞে হঁ্যা।

—কিন্তু অনিশ্চিত অর্থাৎ ভাসা ভাসা কোন খবর কি আপনি পেয়েছিলেন?

দ্বিজেন প্রথমটা ইতস্তত করে তারপর বললে, নিশ্চিত কোন খবরই আমি পাইনি। তবে নতুন উইল যে হবে এটুকু আন্দাজ করেছিলুম।

—কেন? স্পষ্টাস্পষ্টি বলুন, কেন?

অতিশয় অসহায়ের মত দ্বিজেন নতমুখে স্তব্ধ হয়ে রইল।

জয়ন্ত বললে, দ্বিজেনবাবু, কিছু লুকোবার চেষ্টা করলে আপনি নিজেই বিপদে পড়বেন, এটা বলে রাখা উচিত মনে করছি। একটু চেষ্টা করলেই অন্য উপায়ে আপনার গুপ্তকথা আমি জানতে পারব।

আবার কিছুক্ষণের স্তব্ধতা। তারপর নিতান্ত নাচারের মত দ্বিজেন বললে, ব্যাপারটা একেবারেই ঘরোয়া। এর সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের কোন

সম্পর্কই আপনি আবিষ্কার করতে পারবেন না।

—তবু আমি শুনতে চাই।

দ্বিজেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, শুনুন, সুন্দরবাবুর মুখে মানসীর পরিচয় নিশ্চয়ই পেয়েছেন ?

—হ্যাঁ। শুনেছি তিনি সুরূপা আর সুশিক্ষতা।

—কিন্তু ও তো বাইরের পরিচয়, মানসীর মনের পরিচয় পেলে আপনি তাকে দেবী বলে শ্রদ্ধা না করে পারবেন না।

—বেশ মানলুম।

—মানসী আজ দুই বছর আমাদের এখানে বাস করছে। পিসিমাকে দেখাশোনা করবার সমস্ত ভারই থাকত তার উপরে। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, বাড়ীর সবাই জানে পিসিমার প্রকৃতি ছিল রুক্ষ, মুখ ছিল অতিশয় তিক্ত। অনাথা মানসীকে কেবল আশ্রয় দিয়েই তিনি তাঁর উচ্চমানের পরিচয় দেন নি, মানসীর ভবিষ্যতের সম্বলের জন্যে পুরাতন উইলে পঞ্চাশ হাজার টাকাও ব্যবস্থা করে-ছিলেন। কিন্তু তবু তাঁর কটু কথায়, রূঢ় ব্যবহারে মানসীকে বড়ই মানসিক অশান্তি ভোগ করতে হ'ত—এমন কি প্রায়ই সে গোপনে না কেঁদেও থাকতে পারত না। এ বাড়ীতে তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করবার লোকও আর কেউ ছিল না। দুদিনের মধ্যেই সে পিসিমার পক্ষে অপরিহার্য্য হয়ে উঠল, এজন্যে সবাই তাকে হিংসা ক'রত। নায়েবমশায়ের মত অমায়িক লোকও নিজের প্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়াতে তার প্রতি বিশেষ সদয় ছিলেন না। সে সহানুভূতি পেত কেবল আমার কাছ থেকেই। সে নিজের মন খোলবার আর সান্ত্বনার কথা শোনবার সুযোগ লাভ করত আমার কাছেই।

আমারও অবস্থা কল্পনা করতে পারছেন তো! ছেলেবেলাতেই হারিয়েছি পিতা-মাতাকে। সংসারে আত্মীয় বলে জেনেছি কেবল পিসিমাকেই। কিন্তু তিনি আমাকে ভালবাসতেন তাঁর নিজের প্রকৃতি অনুসারেই—যা নয় মোহনীয়, নয় সহনীয়। কখনো শুনিনি তাঁর মুখ থেকে আদরের কথা। আমিও সন্তর্পণে তাঁর কাছ থেকে থাকতুম দূরে দূরে। এ সংসারে আমার মনের মানুষ বলতে কেউ ছিল না—

আমি সাবালক হয়ে উঠেছি দাসদাসী-কর্ম্মচারীদের প্রতিবেশ-প্রভাবের মধ্যেই। আমার অভাব-অভিযোগ শুনতেন কেবল নায়েব-মশাই-ই। তাঁর স্ত্রী সুরবালাদেবীও আমাকে ভালোবাসতেন, ছেলে-বেলায় তাঁর কোলেও চড়েছি। কিন্তু তাঁরাও কেউ আমার আত্মীয় নন।

অনাথা মানসী আর অনাদৃত আমি—আমরা দুজনেই যে পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হব, এটা খুবই স্বাভাবিক। আমাদের দুজনের মন বুঝতুম কেবল আমরা দুজনেই। নিজেদের সুখ-দুঃখ, ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করতুম সুবিধা পেলেই। ক্রমে আমাদের সম্পর্ক এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল যে আমরা স্থির করলুম, পরস্পরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হব। জয়ন্তবাবু, এইখান থেকে আমাদের দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত।

পিসিমার কাছে যেদিন আমাদের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করলুম, তিনি বিষম, রেগে একেবারে আগুন হয়ে উঠলেন। চীৎকার করে বললেন, এ বিবাহ হতে পারে না, হতে পারে না।

আমি যতই বোঝাই, তিনি ততই বেঁকে দাঁড়ান। এইটেই ছিল তাঁর চিরকেলে স্বভাব—তাঁর সংকল্প থেকে কেউ তাঁকে টলাতে পারত না। কেবল তাঁর কেন, আমাদের বংশের প্রত্যেকেই নাকি প্রকাশ করেছেন ঐ রকম স্বভাব। হয়ত ওটা আমাদেরই রক্তের গুণ বা দোষ। কাজেই আমিও বংশছাড়া নই! পিসিমা যত বেঁকে দাঁড়ান, আমার সংকল্প তত দৃঢ় হয়ে ওঠে।

পিসিমার আপত্তির প্রধান কারণ মানসী অনাথা, গরীব, বংশ-গৌরব থেকে বঞ্চিত—রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের পৌত্রের সঙ্গে তার বিবাহ অসম্ভব। সেই সেকেলে যুক্তি—খাপ খায় না যা নব্যযুগের সাম্যবাদের সঙ্গে। আমি বললুম, ও যুক্তি আমি মানি না। মানসী ছাড়া আর কারুকেই বিবাহ করব না।

পিসিমা বললেন, তাহলে তোমাকে আমি সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করব। আমি বললুম, তাই সই। তার কয়েকদিন পরে পিসিমার মৃত্যু।

জয়ন্তবাবু, আপনি জানতে চেয়েছেন, আমাকে সম্পত্তি থেকে

বঞ্চিত করে যে নতুন উইল হবার সম্ভাবনা আছে, এটা আমি আন্দাজ করতে পেয়েছিলুম কিনা ? তা পেরেছিলুম বৈকি। পিসিমা ছিলেন ভীষণ একগুঁয়ে মানুষ ; যা ধরতেন তা আর ছাড়তেন না। আপনি আর কিছু জানতে চান ?

জয়ন্ত ভাবতে ভাবতে বললে, আপাতত আর কিছু জানতে চাই না। হ্যাঁ একটা কথা। মানসীদেবী কি পর্দ্দানসিন মহিলা ?

—মানে ?

—তিনি কি আমার সঙ্গে দেখা আর ব্যাক্যলাপ করতে পারবেন ?

—অনায়াসে। কিন্তু মানসীর সঙ্গে আপনার কি দরকার ?

—এ প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছে না দিলেও চলবে।

—সে বেচারীর সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের কোন সম্পর্ক নেই।

জয়ন্ত বিরক্ত স্বরে বললে, সে বিচার করব আমি। জানেন দ্বিজেনবাবু, গোয়েন্দার প্রথম কর্ত্তব্য সকলকেই সন্দেহ করা। আপনাদের দাস-দাসী দ্বারবানরা পর্য্যন্ত সন্দেহ থেকে মুক্ত নয়।

দ্বিজেন চেয়ার ত্যাগ করে বললে, বেশ আপনার যা ইচ্ছা। মানসীকে কি এখনি পাঠিয়ে দেব এখানে ?

—না। আজ আপনার মুখে যা শুনলুম আগে তাই পরিপাক করি। মানসীদেবীর সঙ্গে আলাপ করব কাল সকালে।

দ্বিজেন নমস্কার করে চলে গেল। তার মুখে দুশ্চিন্তার চিহ্ন।

মাণিক বললে, ভাই জয়ন্ত, এতদিনেও সুন্দরবাবু যা করতে পারেননি, তুমি একবেলাতেই তা পেরেছ।

—কি রকম ?

—অন্ধকার ভেদ করে বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে পেরেছ।

—পেরেছি কি ? আমার তো তা মনে হয় না। এই তো সবে গৌরচন্দ্রিকা, আসল উপন্যাস এখনো শুরুই হয়নি।

—কিন্তু তুমি একটা মস্ত আবিষ্কার করেছ।

—কি আবিষ্কার ?

—এতদিন হত্যাকাণ্ডটা ছিল উদ্দেশ্যহীন। এইবারে উদ্দেশ্যের

কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

—যথা ?

—ঠিক স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারব না। তবে সন্দেহ হচ্ছে যেন, ঐ নতুন উইলের সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের একটা যোগাযোগ আছে।

—হয়তো আছে। হয়তো নেই। আমার পরিকল্পনা এখনো নির্দিষ্ট আকার পায় নি।

—মানুষ হিসাবে দ্বিজেন সম্বন্ধে কোন ধারণা করতে পারলে।

—এক আঁচড়েই মানুষ চেনা যায় না ভাই! মোটামুটি দ্বিজেনকে আমার ভালই লাগল। সরল, উদার, ভদ্র। যে স্বীকারোক্তি করলে তার মধ্যে কোন মার-প্যাঁচ নেই। কিন্তু আমি এখন ভাবছি আর একটা কথা। ঐ জানলাটার পর্দ্দার ওপাশে দাঁড়িয়ে গোপনে কে এতক্ষণ আমাদের কথোপকথন শ্রবণ করছিল ?

মাণিক সবিস্ময়ে বলে উঠল, তাই নাকি ? পুরুষ না স্ত্রীলোক!

—বোঝা গেল না। পর্দ্দাটা পুরু আর গাঢ় রঙের। কিন্তু বাইরের আলো আর জানালার-পর্দ্দাটার মাঝখানে আমি কোন মানুষের স্পষ্ট ছায়া দেখেছি। দ্বিজেনের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই ছায়াটাও সরে গেল। কার কায়া থেকে এই ছায়ার জন্ম ? আমি জানতে চাই! আমি জানতে চাই!

পাঁচ

ছত্রপতির ছোরা

পরদিন। প্রভাতী চায়ের আসরে জয়ন্ত আছে, মাণিক আছে, আর আছেন সুন্দরবাবু আর পবিত্রবাবু। দ্বিজেনও হয়ত সেখানে হাজির থাকত, কিন্তু বাড়ীর বাইরে গিয়েছে কোন জরুরী কাজে।

কথায় কথায় পবিত্রবাবু বললেন, জয়ন্তবাবু, আপনি রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের লাইব্রেরী দেখেছেন ?

—না।

—আপনি বই পড়তে ভালবাসেন ?

—অত্যন্ত।

—রাজার লাইব্রেরীতে অনেক দামী দামী কেতাব আছে। মস্ত লাইব্রেরী। দেখবেন তো চলুন।

সুন্দরবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, ধেৎ, লাইব্রেরী দেখে কি লাভ? এখন কেউ যদি খুনীকে দেখাতে পারে তবেই আমি খুশী হই।

পবিত্রবাবু হেসে বললেন, খুনীকে দেখাবার ভার তো আপনারই উপরে!

লাইব্রেরী ঘরটা প্রকাণ্ড। তার চারদিকেরই দেওয়ালের অনেকখানি পর্য্যন্ত ঢেকে দাঁড় করানো আছে সারি সারি আলমারি এবং আলমারির থাকগুলো রোগা আর মোটা কেতাবে ঠাসা।

জয়ন্ত বইগুলো পরীক্ষা করতে করতে বললে, দেখছি এখানে কোন হালের বই নেই।

পবিত্রবাবু বললেন, রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই লাইব্রেরীর জন্যে বই কেনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সে তো আজকের কথা নয়, আমিই তখন এ বাড়ীতে আসেনি!

ঘরের মাঝখানে রয়েছে লম্বা একটা ডালাওয়ালা কাষ্ঠাধার। সেইদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে জয়ন্ত সুধোলে, ওটা কি?

—'শো-কেস'।

—কি আছে ওর মধ্যে?

—সেকেলে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার সখও ছিল রাজার। ওর মধ্যে সেইগুলোই সাজানো আছে।

—বড় চিত্তাকর্ষক তো! জয়ন্ত কৌতুহলী হয়ে কাষ্ঠাধারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হেঁট হয়ে পরীক্ষা করতে লাগল।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের হরেক রকম অস্ত্র—ধনুক-তীর, তরবারি, ছোরা-ছুরি, খড়্গ, কুঠার, বর্শা প্রভৃতি আরো কত কি! প্রত্যেক অস্ত্রের গায়ে রঙীন গোলাপী ফিতার সঙ্গে সংলগ্ন এক-একখানা কার্ড —তার উপরে দুই-এক লাইনে লেখা অস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

জয়ন্ত লক্ষ্য করলে, এক জায়গায় ফিতার সংলগ্ন কার্ডের উপরে

লেখা রয়েছে—'ছত্রপতির ছোরা', কিন্তু তার সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই। সে পবিত্রবাবুর দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট করলে।

আকাশ থেকে পড়লেন পবিত্রবাবু। বিস্ফারিত চক্ষে সবিস্ময়ে বললে, একি ব্যাপার! বাড়ীতে হত্যাকাণ্ডের আগের দিনেও যে ছোরাখানাকে দেখেছি যথাস্থানে। কোথায় গেল সেখানা? কে চুরি করলে?

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'ছত্রপতির ছোরা' ব্যাপারটা কি?

—ছত্রপতি শিবাজী নাকি এই ছোরা ব্যবহার করতেন। তাই ঐ নাম।

এতক্ষণে সুন্দরবাবু জাগ্রত হয়ে উঠলেন, বললেন, হুম হুম। বড়ই সন্দেহজনক, বড়ই সন্দেহজনক। আপনি ঠিক বলছেন, হত্যাকাণ্ডের আগের দিনও ছোরাখানা এইখানেই ছিল?

পবিত্রবাবু বললেন, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। আমার বেশ মনে আছে। সৌদামিনী দেবীর হুকুম ছিল, তাঁর পিতার বহু যত্নে সংগ্রহ করা বইগুলি যেন কীটপতঙ্গের অত্যাচারে নষ্ট না হয়ে যায়, বেয়ারাদের সাহায্যে আমি যেন হপ্তায় একবার করে লাইব্রেরী ঘর পরিষ্কার করি। দেখছেন না, এ-মহলের অন্যান্য ঘরের মত এ ঘরখানাও দুর্দশাগ্রস্থ নয়?

—হুম। তোমার মত কি জয়ন্ত?

—আনারও ওই মত। ছোরা চুরি হওয়া সন্দেহজনক।

—সৌদামিনীদেবী মারাও পড়েছেন ছোরার আঘাতেই।

—হ্যাঁ সুন্দরবাবু। বাইরের কোন চোর এ ছোরা চুরি করেনি।

পবিত্রবাবু সভয়ে বলে উঠলেন, আপনারা কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না। এ বাড়ীতে সৌদামিনীদেবীকে হত্যা করতে পারে কে? আর কেনই বা করবে? আমরা যে সকলে তারই আশ্রিত। যে ডালে বসে, সে ডাল কেউ কাটে! না জয়ন্তবাবু, আমাকে ক্ষমা করবেন।—আমার মাথা ঘুরছে, আমার পা অবশ হয়ে আসছে, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, আমি চললুম—আমি চললুম। মাতালের মত টলতে টলতে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

জয়ন্ত করুণভাবে মাথা নাড়লে। সুন্দরবাবুর মুখও অত্যন্ত গম্ভীর।

মাণিক বললে, এতদিন পরে পাওয়া গেল একটা নিরেট প্রমাণ। অপরাধী তাহলে এই বাড়ির ভিতরেই আছে। চল জয়ন্ত, আমাদের ঘরে গিয়ে বসি।

ঘরে ফিরে এসে তিনজনেই খানিকক্ষণ বসে রইল বোবার মত।

সর্ব প্রথমে কথা কইলেন সুন্দরবাবু। বললেন, আমার কি বিশ্বাস জানো জয়ন্ত?

—বলুন।

—আসল হত্যাকারী বাড়ীর লোক না হতেও পারে।

—এমন কথা কেন বলছেন?

—আসল হত্যাকারী হয়তো বাইরে থেকেই এসেছে, কিন্তু তাকে সাহায্য করেছে বাড়ীর কোন লোক।

—বুঝেছি। আপনি বোধহয় আসল হত্যাকারী বলে সন্দেহ করছেন হীরেন্দ্রনারায়ণবাবুকেই।

—তাছাড়া আর কে? সে লোক ভাল নয়। হত্যাকাণ্ডের সাত দিন আগে টাকার জন্যে সে সৌদামিনীদেবীর সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। সে নিরুদ্দেশ হয়ে আছে। আমার তো তার উপরেই সন্দেহ হয়। বাড়ীর কোন' লোক যে কারণেই হোক তাকে সাহায্য করেছে। রাত্রে গোপনে দরজা খুলে দিয়েছে। অস্ত্র পাওয়া যাবে কোন ঘরে হীরেন তা জানত'। ছত্রপতির ছোরার দ্বারা কাজ হাসিল করে এখন সে গা-ঢাকা দিয়ে আছে।

মাণিক বললে, সুন্দরবাবুর অনুমান সঠিক হ'লে বলতে হবে যে, হীরেন নিজেরপায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছে। সে তখনও আন্দাজ করতে পারেনি যে, সৌদামিনীদেবী তাকেই দান করেছেন সমস্ত সম্পত্তি।

জয়ন্ত বললে, সুন্দরবাবুর অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নয়।

সুন্দরবাবু উৎসাহিত হয়ে গাত্রোত্থান ক'রে বললেন, তাহলে এখন আমি উঠলুম। দেখি,এই নতুন সূত্রটা ধ'রে কতদূর অগ্রসর হতে পারি।

জয়ন্ত বললে, আর আমরাও দেখি বাড়ীর ভিতরে হীরেনের কোন সহকারীকে আবিষ্কার করতে পারি কিনা।

সুন্দরবাবুর প্রস্থান। জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ। সে বললে, বাবুজী, দিদিমণি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

—কে দিদিমণি? মানসীদেবী?

—আজ্ঞে।

—তাঁকে আসতে বল।

ভৃত্যের প্রস্থান। অনতিবিলম্বে মানসীর প্রবেশ।

রূপসী বটে। চোখ-ভুরু-নাক যেন সুপটু শিল্পীর লিখন। রং যেন গোলাপী স্বপ্ন। দেহের গঠনে শ্রেষ্ঠ ভাস্করের আদর্শ। কে বলবে একে দরিদ্রা অনাথা, বংশগৌরবহীনা? ভাবভঙ্গির ভিতর থেকে ফুটে উঠছে পরম আভিজাত্য। মহিমাময়ী।

জয়ন্ত এতটা আশা করেনি। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বললে, দয়া ক'রে আসন গ্রহণ করুন।

মানসী বললে, আমাকে এখানে আসতে বলেছেন?

জয়ন্ত বাধো বাধো গলায় বললে, ঠিক আপনাকে এখানে আসতে বলিনি। আমরাই আপনার কাছে যেতে পারতুম। জানেন তো, অপ্রীতিকর কর্ত্তব্যপালন করবার জন্যে এখানে এসেছি। আপনার কাছ থেকে কেবল দু-চারটে কথা জানতে চাই।

মানসী ম্লান হেসে হেসে বললে, আপনি না ডাকলেও আমাকে কিন্তু আজ আপনার কাছে আসতেই হ'ত।

জয়ন্ত বিস্মিত কণ্ঠে বললে, কেন?

—সে কথা পরে বলব। আমি আগে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই।

। ছয় ।

রুমাল, রক্ত-সায়া

জয়ন্ত বললে, মানসীদেবী, হত্যার রাত্রের কথা আপনি যা জানেন বলুন।

মানসী বললে, আমি যেটুকু জানি সুন্দরবাবুকে সব খুলে বলেছি। আপনি কি তা শোনেননি?

—শুনেছি। কিন্তু পরের মুখে শোনা আর নিজের কানে শোনা এক কথা নয়।

—বেশ, শুনুন। সৌদামিনীদেবী অন্যান্য দিনের মতন সেদিনও রাত ন'টার সময় ঘুমোতে যান। তাঁর পাশের ঘরে থাকে উমাতারা আর তার পরের ঘরখানিতে থাকেন পবিত্রবাবু আর তাঁর স্ত্রী সুরবালাদেবী। কিন্তু সেদিন প্রথম রাত্রে দু'খানা ঘরই খালি ছিল। এ পাড়ার কোন বিয়েবাড়ীতে থিয়েটার ছিল, পবিত্রবাবু আর উমাতারা তাই দেখতে গিয়েছিলেন আর সুরবালাদেবী গিয়েছিলেন বাপের বাড়ীতে।

মাঝে মাঝে আমাকে অনিদ্রা রোগে ধরে। সে রাত্রেও কিছুতেই আমার ঘুম আসছিল না। রাত প্রায় এগারোটা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করবার পর উঠে পড়লুম। ভাবলুম, ও-মহলের লাইব্রেরীতে গিয়ে খানিকক্ষণ পড়াশুনো করে আসি। ঘুম না হলে আমি প্রায়ই তাই করতুম, এটা ছিল আমার অনিদ্রা-রোগের চিকিৎসার মত। ঘর থেকে বেরিয়ে ও-মহলের দিকে অগ্রসর হ'তে দেখি, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছেন পবিত্রবাবু।

জিজ্ঞাসা করলুম, থিয়েটার ভেঙ্গে গেল? তিনি বললেন, 'রাত একটার আগে ভাঙবে বলে তো মনে হয় না। আমার ভালো লাগল না, তাই চলে এলুম, উমাতারা শেষপর্যন্ত না দেখে ছাড়বে না। তুমি যে এখনো ঘুমোওনি?' আমি বললুম, 'অনিদ্রাকে ছাড়াবার জন্যে লাইব্রেরীতে যাচ্ছি। তিনি আমার অভ্যাস জানতেন। একটু হেসে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

লাইব্রেরীতে ছিলুম ঘণ্টাখানেক। চিকিৎসা ব্যর্থ হল না, ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলে ফিরলুম নিজের ঘরের দিকে। আসতে আসতে দূর থেকেই মনে হ'ল, এ-মহলের বারান্দা দিয়ে ছায়ামূর্ত্তির মত কি যেন একটা সাঁত করে চ'লে গেল। কিন্তু কাছে এসে কাউকেই দেখতে পেলুম না। ভাবলুম আমারই চোখের ভ্রম।

দ্বিজেনবাবুর ঘরের কাছ পর্যন্ত আসতেই ঘরের ভিতর থেকে তিনি বললেন, 'কে যায়?' আমি সাড়া দিলুম। তিনি বললে, 'এত রাত্রে তুমি বাইরে?' বললুম, অনিদ্রা-ব্যধির ওষুধ খোঁজবার জন্যে লাইব্রেরীতে গিয়েছিলুম। তিনি হেসে উঠে বললেন, 'ওষুধ পেলে?' আমি বললুম, 'পেয়েছি, আমার ঘুম এসেছে।' তিনি বললেন, 'তা হলে তাড়াতাড়ি ঘরে যাও। আর পার'তো ঘুমকে বলে দিও সে যেন আমার কাছেও আসে। কারণ আমারও তোমার দশা।' তারপর আমি ঘরে এসেই ঘুমিয়ে পড়লুম। সে রাত্রের আর কোন কথাই জানিনা।

জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, সৌদামিনীদেবীর সঙ্গে আপনার কি রকম সম্পর্ক?

—সম্পর্ক একটা ছিল, তবে নামমাত্র। কিন্তু তাঁর পক্ষে যতটা সম্ভবপর, তিনি আমাকে ভালবাসতেন। অবশ্য তার কারণও ছিল। আমার মতন একটি লোক না হলে তাঁর চ'লত না। আমার আগেও আরও কয়েকজনকে তিনি সঙ্গিনীরূপে থাকবার জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন বটে কিন্তু কেউ তাঁকে দু-তিন মাসের বেশী সহ্য করতে পারেনি। আমি যে তা পেরেছি তার প্রধান কারণ হচ্ছে, সহ্য করা ছাড়া আমার আর অন্য উপায় ছিল না, আমি অনাথা। তবু তিনি যে এক সময়ে আমার জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা থেকেই প্রমাণিত হয় মনে মনে তিনি অসাড় ছিলেন না। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে পরে তাঁর দান থেকে আমি হয়েছি বঞ্চিত। তার কারণও আপনি দ্বিজেনবাবুর মুখে শুনেছেন।

—দেখুন মানসীদেবী, আমরা এমন প্রমাণ পেয়েছি যার উপরে নির্ভর ক'রে বলা চলে যে, হত্যাকারী বা তার সহকারী আছে এই

বাড়ীর ভিতরেই। এ সম্বন্ধে আপনার কোন মতামত আছে?

মানসীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। থেমে থেমে বললে, আমার মতামত! আমার কি মতামত থাকতে পারে! এ-সব আমার ধারণাতেও আসে না। এ বাড়ীতে এমন ভয়ানক মানুষ আছে বলে আমি বিশ্বাসই করি না।

জয়ন্ত বললে, দ্বিজেনবাবু কি রকম লোক?

মানসীর দুই ভ্রূ সঙ্কুচিত হ'ল—কেঁপে উঠল তার ওষ্ঠাধর। অভিভূত কণ্ঠে সে বললে, আপনারা কি তাকেই সন্দেহ করেন?

—যদি বলি, করি!

—তাহ'লে মস্ত ভ্রম করবেন।

—কেন?

—দ্বিজেনবাবু হচ্ছেন দেবতা।

—হ্যাঁ, আপনার কাছে।

—না, যাকে জিজ্ঞাসা করবেন সেই-ই ঐ কথা বলবে। প্রাণীহত্যার বিরোধী বলে তিনি আমিষ পর্যন্ত খেতে পারেন না। তিনি করবেন নরহত্যা! এমন কথা শুনলে পাপ হয়। আপনার আর জিজ্ঞাস্য আছে?

—না। কিন্তু বললেন যে, আমি না ডাকলেও আপনাকে আজ আমার কাছে আসতে হ'ত। কেন?

—আজ এমন একটা ব্যাপার হয়েছে যার কোন অর্থই আমি খুঁজে পাচ্ছি না!

—ব্যাপারটা কি?

—আমার একটা দেওয়াল-আলমারি আছে। তার ভিতরে আটপৌড়ে কাপড়-চোপড় রাখি। আজ সকালে খানকয়েক কাপড়ের ভিতর থেকে এই রুমালখানা পেয়েছি। মানসী একখানা রুমাল বার করে এগিয়ে ধরল।

জয়ন্ত রুমালখানা নিয়ে তার উপর চোখ বুলিয়েই সোজা হয়ে বসল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে বললে, মানিক, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক রুমাল।

মানিক হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলে রুমালখানা। বললে, এর উপরে

যে রক্তের দাগ আছে।

—হুঁ, কয়েকটা রক্তের ছোপ্ আর একটা আঙুলের ছাপ।

মানসী চিন্তিতভাবে বললে, এখন বলুন জয়ন্তবাবু, আমার জামা-কাপড়ের আলমারিতে ঐ রক্তমাখা রুমালখানা কোত্থেকে এল? ও রুমাল তো আমার নয়!

—রুমালের কোণে ঐ ধোপার চিহ্ন?

—চিহ্ন আমাদেরই ধোপার।

—তাহলে এখানা বাড়ীর কোন লোকেরই সম্পত্তি। কিন্তু এর মালিক যে কে, সেটা বিশেষ করে বোঝবার উপায়ই নেই। এ-রকম সাধারণ রুমাল রাম-শ্যাম সবাই ব্যবহার করে।

মানিক বললে, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, রাম-শ্যামের রুমাল নিজে মানসী-দেবীর আলমারির ভিতরে বেড়াতে আসেনি, কে ওটা রাখবে ওখানে?

জয়ন্ত বললে, তার পরের প্রশ্ন, কেনই বা ওখানে রাখবে?

মানিক বললে, আরও একটা প্রশ্ন, রুমালখানা রক্তাক্ত কেন?

জয়ন্ত বললে, আচ্ছা, পরে এসব প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করলেও চলবে। আপাতত এই অদ্ভুত আবিষ্কারের জন্যে মানসীদেবীকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কে বলতে পারে, ভবিষ্যতে এই রুমালখানাই আমাদের মামলার একটা প্রধান সূত্র হয়ে উঠবে না।

মানসী সভয়ে বলে উঠল, আপনি কি বলছেন? আপনি কি বলতে চান সৌদামিনীদেবীর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এই রুমালের সম্পর্ক আছে?

—থাকা অসম্ভব নয়।

—কেউ কি আমাকে বিপদে ফেলবার জন্যে ওখানা আমার আলমারির ভিতরে রেখে দিয়েছে?

—তাও অসম্ভব নয়।

—তবে আমি কি করব?

—আপনি কিছুই করবেন না, একেবারে চুপ মেরে যান। রুমাল-খানা কখনো যে চোখেও দেখেছেন সে কথা পর্যন্ত ভুলে যান।

—আর কাউকে ওর কথা বলব না?

—কাউকে না, কাউকে না। এমন কি দ্বিজেনবাবুকেও না।

—তাঁর কোন বিপদ হবে না তো ?

—মনে তো হয় না। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, তিনি ব্যবহার করেন রঙিন রুমাল।

—হ্যাঁ জয়ন্তবাবু, তিনি বরাবরই রঙিন রুমাল ব্যবহার করে থাকেন।

—তাহলে এইখানেই সাঙ্গ হোক রুমাল-পর্ব। এইবারে মানসী-দেবী, ভালো করে মনে করে দেখুন দেখি, সেই হত্যাকাণ্ডের পর আপনার ঘরে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে কিনা।

—না।

—মনে করে দেখুন, মনে করে দেখুন। ঘটনা যতই তুচ্ছ হোক, আমার কাজে লাগতে পারে।

অল্পক্ষণ নীরবে ভাবতে ভাবতে মানসীর দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বললে, আপনার কথায় আর একটা ছোট ব্যাপার মনে পড়ছে। হত্যাকাণ্ডের পরের দিন সকালবেলায় ঐ জামা-কাপড়ের আলমারির ঠিক তলাতেই মেঝের উপরে দেখেছিলুম তিন ফোঁটা-রক্ত।

—তিন ফোঁটা রক্ত।

—হ্যাঁ, ঠিক তিন ফোঁটা।

—তারপর ?

—কিন্তু সেজন্যে আমি বিস্মিত হইনি। আমার বিশ্বাস, কোন আহত ইঁদুর কি বিড়ালের গা থেকেই রক্তবিন্দুর সৃষ্টি হয়েছিল। তাই আমি জল ঢেলে দাগগুলো তুলে ফেলেছিলুম। ঐ তিন ফোঁটা রক্তের কথা নিশ্চয়ই আপনার কাজে লাগবে না জয়ন্তবাবু।

—নিশ্চয়ই লাগবে। তিন ফোঁটা কেন ; মাত্র এক ফোঁটা রক্তই আমার কাছে মহামূল্যবান। আলমারির ভিতরে রক্তাক্ত রুমাল, আলমারির বাইরে তিন ফোঁটা রক্ত। এই দুই রক্তচিহ্নের মধ্যে কি যোগাযোগ নেই ? থাকা উচিত, থাকা উচিত।

মানসী অস্বস্তি-ভরা কণ্ঠে বললে, আপনার সব কথাই হেঁয়ালী

বলে মনে হচ্ছে।

—হোক। তা নিয়ে আপনি একটুও মাথা ঘামাবেন না মানসী-দেবী। আপনি কেবল মাথা ঘামিয়ে দেখুন, আর কোন তুচ্ছ ঘটনার কথা আমাকে বলতে পারেন কিনা।

—উঁহু, আর কিছুই ঘটেনি।

—ভাবুন, ভাবুন, ভাবুন।

—না জয়ন্তবাবু। হ্যাঁ, একটা ব্যাপার—না, না সেটা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার।

—তবু আমি শুনতে চাই।

—আমার একটা সায়া খুঁজে পাচ্ছি না।

—সায়াটা কোথায় রেখেছিলেন?

—ঘরের আলনায়।

—কবে রেখেছিলেন?

—হত্যাকাণ্ডের দিনে। বৈকালে।

—কবে খুঁজেছিলেন?

—হত্যাকাণ্ডের পরের দিনেই।

—সকালে না বিকালে?

—সকালে।

—তাহলে হত্যাকাণ্ডের দিন বৈকাল থেকে রাত্রের মধ্যেই সায়াটা আপনার ঘর থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে।

—আপনি দেখিয়ে দিলেন বলে তাইতো এখন মনে হচ্ছে। বাড়ীতে যে ভীষণ ঘটনা ঘটেছে, সায়াটার কথা ভুলেই গিয়েছিলুম।

—আর কোন তুচ্ছ ঘটনার কথা আপনার মনে পড়ছে?

মিনিট তিন ভেবে চিন্তে মানসী নিশ্চিন্তভাবে বললে, না, আর কিছু ঘটেনি।

—বেশ, আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। নমস্কার।

মানসী চ'লে গেলে জয়ন্ত চুপ করে বসে বসে কি ভাবলো। তারপর বললে, মানসীদেবীর মনে যে সব ছোট ছোট তুচ্ছ ঘটনা

ঘটেছে, স্থান-কাল-পাত্র হিসাবে সেগুলো কতখানি বিস্ময়কর, ভালো করে ভেবে দেখ, মানিক। ঠিক হত্যাকাণ্ডের সময়ে বা তার কিছু আগে কি কিছু পরে মানসীর ঘর থেকে হারিয়েছে একটা সায়া; ঘরের আলমারির তলায় পাওয়া গিয়েছে রক্তের দাগ আর হয়তো সেই সময়েই আলমারির ভিতরেও ঢুকেছে একখানা রক্তাক্ত রুমাল। আপাততঃ এগুলো অর্থহীন বলে বোধ হচ্ছে বটে, কিন্তু কিছু কিছু অর্থের সন্ধানও যেন এখনি পাওয়া যায়। মানসীর অজ্ঞাতসারেই খুব সম্ভব হত্যাকাণ্ডের রাত্রেই তার ঘরের ভিতরে একজন বাইরের লোকের আবির্ভাব হয়েছিল। প্রশ্ন—কে সে? শত্রু, না মিত্র, না হত্যাকারী? যেই-ই হোক, সে চুরি করেছে অসামান্য কিছু নয়—সামান্য একটা সায়া মাত্র। প্রশ্ন: কেন? স্ত্রীলোকের একটা সায়া তার কোন্ কাজে লাগতে পারে? অথবা সায়াটা বিশেষ করে মানসীর বলেই তার কাছে কি মূল্যবান? সায়াটা গেল কোথায়? অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ কোন কার্যসাধনের জন্যে সায়াটা কি আবার আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে? মানসীর ঘরের ঐ রক্তের দাগ। প্রশ্ন: কার সে রক্ত? সৌদামিনী দেবীর, না যে ঘরের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করেছে তার নিজের? যারই হোক, এটা বোঝা যাচ্ছে যে, আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে সে একটা কিছু করছিল। প্রশ্ন: কি করছিল? রক্তাক্ত রুমালখানা স্থাপন করছিল আলমারির ভিতরে? কেন, কেন, কেন? নিজের রক্তাক্ত রুমাল মানসীর আলমারির ভিতরে রাখলে তার কি উপকার বা মানসীর কি অপকার হবার সম্ভাবনা? পাগলা-গারদের বাসিন্দার মন বোঝবার চেষ্টার মত এই শেষ প্রশ্নটার অর্থ অনুধাবন করবার চেষ্টাও হবে সমান দুশ্চেষ্টা। বলতে বলতে হঠাৎ থেমে পড়ে হঠাৎ আবার চীৎকার করে জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল: হয়েছে হয়েছে।

মানিক সবিস্ময়ে বললে, ক্ষেপে গেলে নাকি? কি হয়েছে হে?

—আলমারির ভিতরে সে হস্তচালনা করেছিল মানসীর কোন অনিষ্ট সাধনের জন্যেই।

—রক্তাক্ত রুমালখানা ওখানে রাখার কারণ কি ভাই?

—নিশ্চয়ই নয়। তার রক্তাক্ত রুমাল তো মানসীর বিরুদ্ধে না গেলে তার নিজের বিরুদ্ধেই কাজে লাগবে। রুমালখানা আলমারির ভিতরে পড়ে গিয়েছিল তার অজ্ঞাতসারেই। এছাড়া ও রুমালের কোন মানেই হয় না।

—কিন্তু জয়ন্ত, আলমারির মধ্যে মানসীর পক্ষে অনিষ্টকারক কিছু পাওয়া গিয়েছে কি ?

—কেন যে পাওয়া যায়নি সেইটেই তো বুঝতে পারছি না। কিন্তু বুঝব—বুঝব, শীঘ্র তাও বুঝব। মানিক হে, জল বেশ ফুটে উঠেছে, ভাত সিদ্ধ হ'তে আর বিলম্ব হবে না।

॥ সাত ॥

দ্বিজেনের সৌভাগ্য

আসন্ন সন্ধ্যা। বাগানে আলো-আঁধারি খেলা। বড় বড় গাছের বুকের ভিতর থেকে ভেসে আসছে পাখীদের বেলাশেষের কলরব। আজকে চাঁদের ছুটি। একটু পরেই অসামসী পাতবে অন্ধকারের আসর।

গোল টেবিলের ধারে বসে পবিত্রবাবুর সঙ্গে জয়ন্ত খেলছে দাবা-বোড়ে। মানিক হচ্ছে নির্বাক দর্শক। উপর-চাল বলে দেবার উপায় নেই, কারণ তাহলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবে জয়ন্ত।

একবার, দুবার, তিনবার জয়ন্ত করলে কিস্তিমাৎ। বললে, আমি একাসনে বসে চব্বিশ ঘণ্টা দাবা খেলতে পারি। কিন্তু আপনার কি আর খেলবার সখ আছে ?

—আপত্তি নেই। বললেন পবিত্রবাবু।

দাবার ঘুটি সাজান হ'ল। পবিত্রবাবু প্রথম চাল চালতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে দ্বিজেনের প্রবেশ।

জয়ন্ত স্মিতমুখে বললেন, আসুন দ্বিজেনবাবু। বসুন। দাবার ছকের উপরে আমাদের দুজনের যুদ্ধ দর্শন করুন।···কিন্তু আপনার মুখের হাবভাব তো কৌ···কৌতুক দেখবার মত নয়। হয়েছে কি ?

দ্বিজেন বললে, আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।

—গোপনে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—পবিত্রবাবু, তাহলে আজ আর যুদ্ধ নয়, আপাতত সন্ধি। আপনি না হয় মানিকের সঙ্গে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে গল্প করে আসুন।

মানিক পবিত্রবাবুর প্রস্থান।

—তারপর দ্বিজেনবাবু? এইবারে আপনি নির্ভয়ে কথার ঝুলি ঝাড়তে পারেন।

—আজ দুটি খবর শুনবেন জয়ন্তবাবু। একটি শুভ, একটি অশুভ।

বাগানের দিকের বারান্দার উপরে তিনটে জানলা, একটা দরজা। একটিমাত্র জানালা খোলা ছিল। সেই জানালাটার দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত উঠে দাঁড়াল। টেবিলের উপর থেকে একটা পাউডারের কৌটা তুলে নিয়ে বললে, একটু সবুর করুন দ্বিজেবাবু, আমি এক মিনিটের মধ্যেই আসছি। সে দরজা দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

মিনিট দেড়েক পরে ঘরে এসে আসন গ্রহণ করে জয়ন্ত বললে, আগে শুভ খবরটা কি শুনি।

—আমিই আবার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছি।

জয়ন্ত চমৎকৃত হয়ে বললে, কেমন করে?

—জ্যাঠামশাই মারা গিয়েছেন।

—হীরেন্দ্রনারায়ণ রায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—হঠাৎ?

—হ্যাঁ, হার্ট ফেল করে।

—কোথায়?

—এলাহাবাদে।

—কিন্তু আইনত সম্পত্তির অধিকারী তিনি। কোন উইল করে তিনি কি আপনাকে সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছেন?

—পিসিমার নতুন উইল হবার আগেই তিনি মারা পড়েছেন। কলকাতা থেকে কোন কাজে তিনি পশ্চিমে যাচ্ছিলেন। ট্রেন যখন এলাহাবাদ ষ্টেশনে পৌঁছয়, সেই সময়ে তিনি হৃদ-রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা পড়েন।

—এ খবর আপনি কবে পেয়েছেন?

—সবে আজকেই।

—এত দেরিতে খবর পেলেন কেন?

—তাঁর দেহ সনাক্ত হতে দেরী হয়। পুলিশ অনেক সন্ধান নেবার পর জানতে পারে, তিনি আমাদের আত্মীয়।

—বুঝলুম। সুসংবাদ বটে কিন্তু তবু আপনার মুখে আনন্দের লক্ষণ নেই কেন? জ্যাঠামশাইকে আপনি কি খুব ভালবাসতেন?

—ভালোবাসার পথ তিনি রাখেননি। আমার কাছে তিনি ছিলেন প্রায় অপরিচিতের মত। আমি পিসিমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলে আমাকে তিনি ঘৃণা করতেন। আমার সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত করতেন না। কেবল আমি নই, এ-বাড়ীর সকলেই তাঁর চক্ষুশূল। তিনি সম্পত্তির মালিক হলে এখানকার সকলকেই বিদায় নিতে হ'ত। তার মৃত্যুতে আমি আঘাত পাইনি। অবশ্য মৃত্যু মাত্রই দুঃখজনক, কিন্তু আত্মীয়বিয়োগে লোকে যেমন ব্যথা পায়, তার মৃত্যুতে তেমন কোন ব্যথা আমি অনুভব করিনি।

—তবে আপনার মুখ অমন বিরস কেন?

দ্বিজেন ঘাড় হেঁট করে নীরবে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মুখ তুলে করুণস্বরে বললে, কিন্তু জয়ন্তবাবু, আমি বোধহয় সম্পত্তি ভোগ করবার কোন সুযোগই পাব না।

জয়ন্ত চমকে উঠে বললে, সেকি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি হতভাগ্য!

—এ আত্মলাঞ্ছনার অর্থ কি?

—বলছি। কিন্তু তার আগে জিজ্ঞাসা করি, হত্যাকারীর কোন সন্ধান আপনি পেয়েছেন কি?

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জয়ন্ত বললে, উঃ! বড্ড গুমোট মনে হচ্ছে। দাঁড়ান, জানলার পর্দাটা খুলে দিয়ে আসি, ঘরের ভিতরে বাইরের বাতাস চলাফেরা করুক।

পর্দাটা টেনে সরিয়ে সে ফিরে এসে বললে, হ্যাঁ, কি বলছেন দ্বিজেনবাবু? খুনীর সন্ধান আমরা পেয়েছি কিনা? হ্যাঁ, আমরা জানি যে, খুনী এই বাড়ীরই লোক।

—অসম্ভব, খুনী কে, আপনারা জানেন না।

—হঠাৎ অতটা নিশ্চিন্ত হচ্ছেন কেন দ্বিজেনবাবু! খুনীর আরো কোন কোন কীর্তির পরিচয় আমরা পেয়েছি।

—কি রকম কীর্ত্তি?

—আমরা জানি যে এখানকার হত্যাকাণ্ডের পরের দিন সকালে মানসীদেবীর ঘরের মেঝেতে রক্তের দাগ পাওয়া যায়।

দ্বিজেন বিকৃতস্বরে বললে, হতেই পারে না, হতেই পারে না!

—মানসীদেবী নিজেই এ-কথা আমাদের কাছে স্বীকার করেছেন।

—মানসী মিথ্যা কথা বলেছে?

—কেন তিনি মিথ্যা কথা বললেন?

—তা আমি জানি না। কিন্তু সে মিথ্যা বলেছে। বেশ, আপনারা আর কি জানেন বলে মনে করেন।

—খুনী কোন্ অস্ত্র ব্যবহার করেছে তাও আমাদের অজানা নেই।

দ্বিজেন হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলে, কোন অস্ত্র?

—'ছত্রপতির ছোরা'

—এই নিন 'ছত্রপতির ছোরা'। দ্বিজেন একখানা কোষবদ্ধ ছোরা টেবিলের উপরে স্থাপন করলে।

॥ আট ॥

হত্যাকারীর স্বীকারোক্তি

জয়ন্ত টেবিলের উপর থেকে ছোরাখানা তুলে নিলে এবং ভাবহীন মৌনমুখে পরীক্ষা করতে লাগল।

খাপ রৌপ্যখচিত চামড়ায় তৈরী। ছোরার হাতল হাতীর দাঁতের। তার উপরে মূল্যবান পাথর-বসানো সোনার কাজ। ফলা নীল ইস্পাতের, সাত ইঞ্চি লম্বা। ফলার উপরে শুকনো রক্তের দাগ।

ছোরাখানা আবার কোষবদ্ধ করে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে জয়ন্ত বেশ সহজ স্বরেই জিজ্ঞাসাকরলে, ছোরাখানা কোথায় পেলেন?

—ঠাকুরদাদার লাইব্রেরীতে।

—এতদিন এখানা কোথায় ছিল?

—আমার কাছে।

—তারপর?

—তারপর আর বিশেষ কিছু বলবার নেই। ঐ ছোরা দিয়েই আমি পিসিমাকে খুন করেছি।

পূর্ণ এক মিনিটকাল ধরে জয়ন্ত নীরবে দ্বিজেনের মুখের পানে তাকিয়ে রইল মর্মভেদী দৃষ্টিতে—যেন সে তাঁর মনের সমস্ত গুপ্ত কাহিনী বাইরে আকর্ষণ করে আনতে চায়, তারপর নীরস হাস্য করে বললে, কেন এ পাপ করলেন?

দ্বিজেন উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, ক'রব না? কেন করব না? পিসিমা কি আমার দিকে তাকিয়েছিলেন? তিনি আমাকে পথের ভিখারী করতে চেয়েছিলেন বিনা অপরাধে। কেবল আমাকে নয়, মানসীকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করে আবার তা কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন। কেন আমি হাত-পা গুটিয়ে এ-সব অত্যাচারসহ্য করব? কোন মানুষই তা পারে না! পিসিমা বৃদ্ধা বিধবা, সন্তানহীনা। পৃথিবীর পক্ষে একেবারের ব্যর্থ জীব। তাঁকে ইহলোক থেকে সরিয়ে দিলে পৃথিবীর কোন অপকারই হবে না। আমাদের তরুণ জীবনকে সার্থক করে তোলবার জন্য তাঁকে হত্যা করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। অবশ্য যদি তখন জানতুম তার আগেই নতুন উইল হয়ে গেছে, তাহলে বোধহয় অকারণে হত্যা করে আমার হাত কলঙ্কিত করতুম না। কিন্তু তখন আমি তা জানতুম না—আমি তা জানতাম না।

জয়ন্ত অবিচলিতভাবে বললে, আপনার কথাগুলি বেশ যুক্তিপূর্ণ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি হত্যা করেছি বটে, কিন্তু যুক্তিহীন হত্যা করিনি।

—এখন কি ক'রবেন?

—আপনাদের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রব।

—তার কি ফল হবে জানেন?

—জানি। ফাঁসি।

—এই কি আপনার কামনা?

—দোষ স্বীকারের পর কোন্ খুনী জীবনের আশা করে?

—আপনার মৃত্যুর পর মানসীদেবীর কি অবস্থা হবে সেটাও ভেবে দেখেছেন বোধহয়।

অন্তরের মধ্যে যেন চরম আঘাত পেয়ে দ্বিজেন শিউরে উঠল। ভগ্ন-স্বরে বললে, সে কথা ভাবলেও আমি পাগল হয়ে যাব।

—মানসীদেবী এ কথা শুনলে কি বলবেন?

—আত্মহত্যা ক'রবে।

—তবে?

—দোহাই জয়ন্তবাবু, এখন আর মানসীর কথা আমাকে মনে করিয়ে দেবেন না। আমি তাকে একেবারে ভুলে যেতে চাই।

—ভোলা কি এতই সহজ?

—না, সহজ নয়। কিন্তু তা ছাড়া উপায় কি?

—কোন উপায় কি নেই?

—কোন উপায় নেই, কোন উপায় নেই!—না, না, একটা উপায় আছে বটে। কিন্তু তা অসম্ভব।

—কি অসম্ভব দ্বিজেনবাবু?

—আপনি কি আমাকে মুক্তি দিতে রাজি আছেন?

—অপরাধ স্বীকারের পরেও আপনি আমার কাছ থেকে মুক্তি প্রার্থনা করছেন।

—নিজের জন্যে করছি না, মানসীর জন্যে করছি। আমার মরা-বাঁচার উপরেই তার মরা-বাঁচা নির্ভর করছে জয়ন্তবাবু।

—সব বুঝি। কিন্তু কি করে আমি আপনাকে মুক্তি দিতে পারি।

—আপনি সরকারী গোয়েন্দা নন। আমি অনুভব করতে পারছি আমার উপরে আপনার সহানুভূতি আছে।

—কিন্তু কি ক'রে আপনাকে মুক্তি দেব তাই বলুন।

—আপনি ছাড়া আর কেউ জানে না, আমি খুনী।

—তা জানেনা বটে। কিন্তু পুলিসকে ঐ কথা জানানোই হচ্ছে আমার কর্তব্য।

—পুলিসের শক্তিতে আমার আস্থা নেই। আপনি যদি মামলার ভার ত্যাগ করেন, তাহ'লে আমি নিশ্চয়ই রক্ষা পাব।

—কিন্তু অক্ষম ব'লে আমার দুর্নাম হবে।

—যেটুকু দুর্নাম হবে, তার বিনিময়ে আপনি কিছু লাভ করতেও পারেন।

—কি লাভ?

—অর্থ।

—তার মানে?

—জয়ন্তবাবু, ভেবে দেখুন। দুদিন পরেই আমি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হব। আপনি যদি এই মামলাটা ছেড়ে দেন, তা'হলে কোন্ দিক দিয়ে লাভবান হবেন বুঝতে পারছেন?

—আপনি আমাকে ঘুষ দিতে চান।

—ঘুষ নয় জয়ন্তবাবু, আমার কৃতজ্ঞতার দান।

—উত্তম। কত টাকা আপনি দিতে পারেন?

—আপনিই বলুন।

—পাঁচ হাজার টাকা?

—আরও বাড়িয়ে বলুন।

—দশ হাজার টাকা?

—তাও উল্লেখযোগ্য হ'ল না।

—পনেরো হাজার টাকা?

—আমি আপনাকে পঁচিশ হাজার টাকা দিতে পারি যদিও

আমার জীবনের দাম আরো ঢের বেশী হওয়া উচিত।

—টাকাটা কবে দেবেন?

—তারিখ না দিয়ে আজকেই আমি চেক দিয়ে দিচ্ছি। সম্পত্তি হাতে এলেই আপনার টাকা পাবেন।

—তাই সই। লিখুন চেক।

দ্বিজেন চেক লিখতে বসল। জয়ন্ত হাসলে মুখ-টেপা হাসি।

—আপনি আমাকে বাঁচালেন জয়ন্তবাবু। চেকখানা গ্রহণ করুন। এতক্ষণ চোখে অন্ধকার দেখছিলুম।

—এইবারে চোখে আলো দেখতে পেয়েছেন শুনে খুশি হলুম। অতঃপর প্রথমেই আপনাকে একটি কাজ করতে হবে।

—আজ্ঞা করুন।

—ছত্রপতির ছোরাখানা আবার যথাস্থানে রেখে আসুন।

—এখনি রেখে আসছি। নমস্কার।

—নমস্কার।

॥ নয় ॥

ঘুষখোর জয়ন্ত

দ্বিজেনের প্রস্থানের পর জয়ন্ত মিনিট-পাঁচেক চুপ করেই রইল। তারপর উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলে, মানিক!

পাশের ঘর থেকে সাড়া এল, আসছি।

অনতিবিলম্বে মানিকের সঙ্গে সুন্দরবাবুর প্রবেশ।

জয়ন্ত বললে, এই যে সুন্দরবাবু! কতক্ষণ?

—বেশ খানিকক্ষণ। মানিকের মুখে শুনলুম দ্বিজেনের সঙ্গে তোমার নাকি পরামর্শ চলছিল!

—ঠিক পরামর্শ নয় সুন্দরবাবু, খুনী নিজের মুখে দোষ স্বীকার করে গেল।

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললেন, খুনী! কে খুনী?

—দ্বিজেন।

—দ্বিজেন খুনী?

—তাইতো সে বলে গেল।

—আর তাকে তুমি ছেড়ে দিলে!

—তা দিলুম বৈকি!

—দিলুম বললেই হ'ল! রোসো, দেখছি তাকে! সুন্দরবাবু প্রস্থানোদ্যত।

—আরে মশাই শ্রবণ করুন, শনৈঃ পন্থা শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম্। ধীরে দাদা, ধীরে!

—না, না, ধীরে-টিরে নয়, আমার এখন বেগে ধাবমান হওয়া উচিত দ্বিজেনের দিকে।

—আমি দ্বিজেনকে গ্রেপ্তার করতে দেব না!

—দেবে না কি রকম?

—সে আমাকে কি দিয়েছে দেখুন।

—চেক?

—হ্যাঁ, পঁচিশ হাজার টাকার চেক।

—হুম, ঘুষ!

—ঠিক তাই।

—হুম, হুম, হুম! মানিক, তোমার বন্ধুর কি অধঃপতন হয়েছে দেখ।

মানিকের মুখের উপরে ফুটে উঠল দারুণ অভিযোগের ভাব!

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, যা মন্দার বাজার পড়েছে, লোভ সামলাতে পারলুম না ভাই!

মানিক প্রায় অবরুদ্ধকণ্ঠে বললে, জয়ন্ত তোমার মৃত্যুই শ্রেয়।

সুন্দরবাবু ঝাঁঝালো গলায় বললেন, পোড়ার মুখে হাসতে লজ্জা করছে না তোমার?

—আগে আমার সব কথা শুনুন! তারপর বিচার করুন, আমার হাসা উচিত কি না!

—যা বলবার বল। কিন্তু জেনে রেখ, তোমার সব কথা শোনবার পরও দ্বিজেনকে আমি গ্রেপ্তার না করে ছাড়বো না।

মানিক বললে, আমারও ঐ মত।

জয়ন্ত বললে, ছিঃ বন্ধু, তুমি শত্রু-শিবিরে?

—আমি ঘুষখোরের বন্ধু নই।

জয়ন্ত সশব্দে ফোঁস ক'রে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললে, বেশ, তাহলে আমার কথাই শোনো। দ্বিজেনের সঙ্গে তার যে কথোপকথন হয়েছিল, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বর্ণনা করে গেল জয়ন্ত। কখনো ক্রুদ্ধভাবে কখনো ঘৃণাভরে সুন্দরবাবু শ্রবণ করলেন তার কথা।

জয়ন্ত বললে, এই তো ব্যাপার! এখন আমার কি করা উচিত?

মানিক বললে, গলায় দড়ি দাও।

—সুন্দরবাবুর মত কি?

—তোমার কি করা উচিত, আমি কি জানি! তবে আমার যা করা উচিত তাই করতে চললুম।

—কোথায় চললেন মশাই?

—দ্বিজেনকে গ্রেপ্তার করতে।

—যাবেন না, যাবেন না।

—আলবাৎ যাব, আলবাৎ যাব।

—দ্বিজেনকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন না, পারবেন না।

—কেন? তুমি ঘুষ খেয়েছ বলে?

—না, অন্য কারণে।

—কারণটা কি শুনি?

—দ্বিজেন হত্যাকারী নয়।

জয়ন্তর মুখের পানে চেয়ে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলেন সুন্দরবাবু। মানিকেরও সেই ভাব।

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতর পায়চারী করতে করতে গম্ভীরস্বরে বললে, হ্যাঁ, দ্বিজেন হচ্ছে নিরপরাধ। কেউ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না।

সুন্দরবাবু আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললেন, তবে কি এতক্ষণ তুমি মস্করা করছিলে? দ্বিজেন অপরাধ স্বীকার করেনি?

—দ্বিজেন অপরাধ স্বীকার করেছে।

—পাগলের মত তুমি কি বলছ জয়ন্ত।

—মানসীদেবীর আলমারীর ভিতরে যে রক্তমাখা রুমালখানা পাওয়া গেছে সেখানা তো এখন আপনার কাছেই আছে?

—আছে।

—সেখানা সাধারণ সাদা রুমাল। দ্বিজেন ওরকম রুমাল ব্যবহার করে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে রুমালখানা খুনীরই সম্পত্তি। দ্বিজেন খুনী হলে মানসীকে বিপদে ফেলবার জন্যে রুমালখানা কখনই তার আলমারীর ভিতরে রেখে আসতো না, কারণ মানসীকে সে ভালবাসে। তাকে বিবাহ করবার জন্যে সে সমস্ত সম্পত্তি থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হতে বসেছিল। মানসীকে সে বিপদে ফেলতে পারেই না। আর ঐ রুমালখানা তার নিজের হলেও ওখানা সে আলমারীর ভিতরে রেখে আসতে না, কারণ তাহলে তার নিজেরই বিপদের সম্ভাবনা। যেচে বিপদে পড়বে বলে কেন সে নিজের রুমাল মানসীর আলমারির ভিতরে স্থাপ করবে?

মানিক বললে, তোমার তো বিশ্বাস রুমালখানা তার মালিকের অজ্ঞাতসারেই আলমারির ভিতরে পড়ে গিয়েছে।

—হঁ্যা—কিন্তু রুমালের মালিক হত্যাকাণ্ডের পরে মানসীর আলমারীর ভিতরে হাত চালাতে গিয়েছিল কেন, অনুমান করতে পারেন সুন্দরবাবু?

—উঁহু। না, না—আলমারির ভিতর থেকে হয় সে কিছু নিতে, নয় ওখানে কিছু রাখতে গিয়েছিল।

—মানসীর আলমারিতে হত্যাকারীর পক্ষে দরকারী কি থাকতে পারে? মানসীর একটা সায়া সেদিনই হারিয়েছিল বটে, কিন্তু সেটা ছিল আলমারির বাইরে আলনার উপরে। আমার মনে হয় হত্যাকারী কিছু রাখতেই গিয়েছিল।

—সেটা কি হতে পারে?

—হয়তো ছত্রপতির ছোরা?

—আরে, ছোরাখানা তো আছে দ্বিজেনের কাছে।

—তা থাকতে পারে।

—আর সে নিজের মুখেই তো তোমার কাছে অপরাধ স্বীকার করে গিয়েছে।

—তা করতে পারে।

—তবু বলবে সে অপরাধী নয়?

—তবু বলবো সে অপরাধী নয়। তার মুখ-চোখের ভাব-ভঙ্গি কথার ধরণ-ধারণ সব প্রকাশ করে দিচ্ছিল, সে অপরাধী নয়। এত অভিজ্ঞতার পরও কি আমার মানুষ চেনবার ক্ষমতা হয় নি! দ্বিজেন মিছে কথা বলেছিল।

—এমন বিপদজনক মিছে কথা কেউ কখনো বলে জয়ন্ত? এ তো আত্মহত্যার সামিল।

—দ্বিজেন কেন যে এমন আশ্চর্য মিছে কথা বলে গেল, তার কারণও আমি আন্দাজ করতে পারছি।

—কারণটা কি বল।

—এখনো বলবার সময় হয় নি।

—দ্বিজেন যদি নিরপরাধী হয়, তাহ'লে এই খুনের জন্যে দায়ী কে হতে পারে? হীরেন্দ্রনারায়ণ? কিন্তু সে তো এখন আমাদের নাগালের বাইরে।

—খুনী সম্বন্ধেও কিছু কিছু ধারণা করতে পারছি। কিন্তু ধারণা এখনো প্রকাশ করবার মত স্পষ্ট হয় নি।

—তুমি কি মনে কর, দ্বিজেন তার পিতৃব্যের গৌরবহারার জন্যেই এমন নির্বোধের মত মিছে কথা বলেছে?

—ও সব কথা এখন থাক্। আপাতত এক কাজ করতে হবে আপনাকে। এই বাড়ীর প্রত্যেক লোকের ডান হাতের আঙুলের ছাপ তুলে নিতে হবে। এমন কি ঝি চাকর দ্বারবান সকলেরই।

—আজই ?

—আজই। তারপর সেগুলো নিয়ে কি করতে হবে, আপনাকে বলা বাহুল্য। কিছু বক্তব্য থাকলে ফোনে জানাবেন। কাল সন্ধ্যার আগে আবার এখানে আপনার দেখা পেতে চাই। খুব সম্ভব সেই সময়েই হত্যাকারীকে আপনার হাতে সমর্পণ করতে পারব।

—বল কি হে, তুমি এতটা নিশ্চিত ?

—হ্যাঁ সুন্দরবাবু। এইবারে চলুন, আমার সঙ্গে বারান্দায় গিয়ে কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ বায়ু ভক্ষণ করবেন ?

—আচমকা এ আবার কি খেয়াল ?

—চলুন না। ঘুঘু দেখাত পারব না বটে, কিন্তু ফাঁদ দেখাতে পারব।

—তোমার সবই হেঁয়ালি। চ'ল।

বাইরে গিয়ে সুন্দরবাবু এদিকে ওদিকে দৃষ্টি চালনা করে বললেন, বাবা, বাইরে তো দেখছি খালি অমাবস্যার অন্ধকার।

—এই যে, আমি অন্ধকারে আলোকপাত করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছি। একটা জানালার কাছে এগিয়ে জয়ন্ত টর্চ টিপে নীচে আলো ফেললে।

—দেখুন সুন্দরবাবু।

—জানলার তলায় সাদা মতন কি ছড়ানো রয়েছে হে ?

—পাউডারের গুঁড়ো। গুঁড়োর মাঝখানে কি দেখছেন ?

—আরে, পায়ের দাগ না ?

—হ্যাঁ, হত্যাকারী কিংবা তার সহকারীর পদচিহ্ন।

—হুম! বলে সুন্দরবাবু হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বিস্ফারিত চক্ষে পদচিহ্ন পরীক্ষা করতে লাগলেন।

মাণিক বললে, ছোট খালি পায়ের দাগ। দেখে মনে হয় স্ত্রীলোকের পা।

জয়ন্ত বললে, সে বিচার ক'রব ছাঁচ তোলবার পর।

সুন্দরবাবু শুধোলেন, ঠিক এইখানেই যে কারুর আবির্ভাব হবে,

তুমি কেমন করে জানলে জয়ন্ত ?

—কোন' মূর্ত্তি আগেও এখানে আড়ি আততে এসেছিলেন। আন্দাজে ধরেছিলুম, আজও তিনি দয়া করে আসবেন। অন্য জানালা দুটো বন্ধ করে ঐটেই খালি খোলা রেখেছিলুম, যাতে ঐখানেই তাঁর উদয় হয়। তবে বেশীক্ষণ তাঁকে দাঁড়াতে দিইনি, পর্দা সরাতেই তিনি চম্পট দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কাল পূর্ণ হয়ে এসেছে, আর তিনি আমাকে ফাঁকি দিতে পারবেন না।

দশ

অভিনয়ের আয়োজন

পরের দিন সকালবেলায় জয়ন্ত চা পানের পর বাড়ীর ভিতর দিকের বারান্দায় পায়চারি করছে, এমন সময়ে দুইজন বেয়ারার সঙ্গে পবিত্রবাবুর আবির্ভাব।

জয়ন্ত শুধোলে, কি পবিত্রবাবু, বেয়ারা নিয়ে কোথায় চলেছেন ?

—আর কোথায়, লাইব্রেরীতে ; আজ যে লাইব্রেরী সাফ করবার দিন।

—আপনি তো খুবই কর্তব্যপরায়ণ দেখছি। সৌদামিনীদেবী স্বর্গে ; পৃথিবীতে ব'সে এখনো আপনি তাঁর আদেশ পালন করছেন।

—সপ্তাহে একদিন করে লাইব্রেরী সাফ করতে হবে, এই ছিল তাঁর আদেশ। এখনো তাঁরই অন্ন খাচ্ছি, তাঁর আদেশ পালন করব না! কিন্তু এ বাড়ীতে আমার অন্ন এইবারে বোধহয় উঠল। সৌদামিনীদেবীকে খুন করে কোন্ পাষণ্ড আমার সর্বনাশ করলে!

—কেন পবিত্রবাবু ?

—নতুন মনিব আমার মত বুড়ো ঘোড়াকে আর কি কাজে বহাল রাখতে চাইবেন ? সৌদামিনীদেবীর মৃত্যু, আমাদেরও সর্বনাশ! সবই নিয়তির খেলা। আসি মশাই। অত্যন্ত দুঃখিতভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে পবিত্রবাবু অগ্রসর হলেন লাইব্রেরীর দিকে।

পবিত্রবাবুর গমন-পথের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত অবাক হয়ে ভাবতে

লাগল, নতুন মনিব বলতে উনি কাকে বুঝেছেন? হীরেন্দ্রনারায়ণ না দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ?

লাইব্রেরী ঘরের ভিতর থেকে পবিত্রবাবুর উত্তেজিত কণ্ঠের সাড়া পাওয়া গেল—জয়ন্তবাবু, জয়ন্তবাবু!

জয়ন্ত চেঁচিয়ে বললে, কি পবিত্রবাবু?

—শীগ্‌গির একবার এদিকে আসুন।

শীঘ্র যাবার কোন চেষ্টাই করলে না জয়ন্ত। ব্যাপারটা আন্দাজ করে মনে মনে হেসে সে ধীরে ধীরে লাইব্রেরীর ভিতরে গিয়ে হাজির হ'ল। যা ভেবেছে তাই। শো-কেসের পাশে পবিত্রবাবু থ' হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর মুখ-চোখ উদ্‌ভ্রান্তের মত।

জয়ন্ত বললে, কি হল মশাই? আপনি কি সৌদামিনীদেবীর প্রেতাত্মা দেখেছেন নাকি?

—তা দেখলেও আমি এতটা অভিভূত হতুম না। কিন্তু যা তাঁকে প্রেতাত্মায় পরিণত করেছে, চোখের সামনে আমি তাই-ই দেখছি।

—মানে?

—ছত্রপতির ছোরা। হত্যার দিন যা অদৃশ্য হয়েছিল, হত্যার পরে আবার তা যথাস্থানে ফিরে এসেছে।

—কি করে জানলেন যে ঐ ছোরা দিয়েই সৌদামিনীদেবীকে খুন করা হয়েছে?

—সেদিন তো আপনারাই এই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।

—তা বটে। কিন্তু সে কেবল সন্দেহ। নিশ্চিতভাবে কিছুই বলিনি।

—কিন্তু ঘটনার দিনে ছোরাখানা চুরিই বা গেল কেন, আর চোরে আবার তা ফিরিয়েই বা দিলে কেন?

—এটা ভাববার কথা বটে।

—তবে কি হত্যাকারী এখনো এই বাড়ীর ভিতরেই বাস করছে?

—থাকতেও পারে।

—বাপরে, বলেন কি মশাই!

—ছোরাখানা 'শো-কেসে'র ভিতর থেকে বার করুন দেখি।

পবিত্রবাবু শিউরে উঠে বললেন, আমি মরে গেলেও পারব না।

—কেন?

—যদি ওর উপরে এখনো সৌদামিনীদেবীর রক্ত লেগে থাকে। ও ছোরা স্পর্শ করলেও মহাপাপ।

—তাহলে ও ছোরা ছুঁয়ে কাজ নেই। আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকুন। আমি বাগানে একটু বেরিয়ে আসি।

পবিত্রবাবু ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলেন। জয়ন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

† † †

দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়ারপর জামা-কাপড় পরে জয়ন্ত বললে, মানিক, আমি একবার এটর্নি হরিদাস চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে আসি।

যথাসময়ে হরিদাসবাবুর কাছে গিয়ে জয়ন্ত আত্মপরিচয় দিলে। সাদর সম্ভাষণ করে হরিদাসবাবু শুধোলেন, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি।

—সৌদামিনীদেবীর নতুন উইলখানা একবার দেখতে চাই।

—অনায়াসে দেখতে পারেন। কিন্তু জানেনতো সেখানা ব্যর্থ উইল। হীরেন্দ্রনারায়ণ রায় মারা পড়েছেন।

—জানি।

উইল এ'ল। তার উপরে চোখ বুলোতে বুলোতে জয়ন্ত বললে' একজন সাক্ষী তো দেখছি আমাদের পবিত্রবাবু। দ্বিতীয় সাক্ষীটি কে?

হরিদাসবাবু বললেন, আমার কেরানী।

—সৌদিমিনীদেবীর প্রথম উইলখানা আছে তো?

—আছে বটে, কিন্তু এতদিনে ওর অস্তিত্ব থাকবার কথা নয়।

—কেন?

—উইলখানা তাঁকে আর একবার দেখিয়ে আমাকে নষ্ট করে ফেলতে বলেছিল। কিন্তু দেখাবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাই

সেখানা এখনও বর্তমান আছে।

—সে উইলখানাও একবার দেখতে পাই কি?

—সেখানা আপনার কোন কাজে লাগবে বলে মনে হয় না।

—তবু একবার দেখতে দোষ কি!

—তবে দেখুন।

পুরাতন উইলখানা আনানো হ'ল। জয়ন্ত সেখানা পাঠ করে ফিরিয়ে দিলে।

হরিদাসবাবু হেসে বললে, দেখছেন তো, ওখানা আপনার পক্ষে একেবারে অকেজো কাগজ।

জয়ন্ত পকেট থেকে রূপোর সামুকদানী বার করে দুই টিপ নস্য নিয়ে বললেন, না হরিদাসবাবু, উইলখানা দেখবার সুযোগ পেয়ে বড়ই উপকৃত হলুম।

—উপকৃত হলেন!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, অত্যন্ত।

—কোন্ দিক দিয়ে যে উপকৃত হ'লেন, কিছুই বুঝতে পারছি না!

—সেটা এখনো বলবার সময় হয়নি, ক্ষমা করবেন। কিন্তু এইটুকু জেনে রাখুন, প্রথম উইলখানা দেখতে পেলুম ব'লেই আমার এখানে আসা সার্থক হ'ল। আপনি আমাকে অন্ধকারে আলো দেখালেন। ধন্যবাদ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার।

*　　*　　*

বাসায় ফিরে এসে জয়ন্ত দেখলে মানিকের সঙ্গে দাবা খেলবার জন্যে ছকের উপর ঘুঁটি সাজাচ্ছেন পবিত্রবাবু।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, পবিত্রবাবু, নতুন উইলের সময় আপনি যে সাক্ষী ছিলেন, একথা তো জানতুম না।

পবিত্রবাবু বললেন, একথা তো এ বাড়ীর সবাই জানে। তাছাড়া এ বাড়ীতে আমি ছাড়া উইলের সাক্ষী হবে কে? আমি হচ্ছি যে সৌদামিনীদেবীর বিশ্বস্ত পুরাতন কর্মচারী।

—বুঝলুম। কিন্তু দ্বিজেনবাবুকে আপনি একরকম কোলে পিঠে

করেই মানুষ করেছেন। তাঁকে কি আপনি ভালবাসেন না?

—বলেন কি, ভালবাসি না আবার! নিজের ছেলের মতই ভালোবাসি।

—তাহলে সৌদামিনীদেবী যখন দ্বিজেনবাবুকে সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে উদ্যত হন, তখন আপনি তাঁকে বাধা দেননি কেন?

—যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলুম মশাই, যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলুম। আপনি সৌদামিনীদেবীকে তো জানেন না। তিনি ছিলেন তৈলপক্ক বাঁশের মত—এতটুকু নোয়ানো অসম্ভব। আমাকে দ্বিজেনের পক্ষ গ্রহণ করতে দেখেই তিনি অগ্নিমূর্তি ধারণ করে যে সব কথা বললেন, আর যা করলেন সে-সব কথা আর প্রকাশ না করাই ভালো।

জয়ন্ত বললে, আপনি কর্তব্যপালন করেছেন শুনে খুশী হলুম। যাক্, এখন আপনি একটি কার্যভার গ্রহণ করবেন?

—কেন করব না? আপনার অনুরোধ তো আদেশ।

—আজ সন্ধ্যার আগে কোন একটা বড় ঘরে বাড়ীর সবাইকে এনে জড়ো করতে পারবেন?

—পারব। কিন্তু কেন বলুন দেখি?

—একটা অভিনয় হবে।

—কারা অভিনয় করবে?

—আমরা সকলেই।

এগারো

অপূর্ব অভিনয়

একখানা হলঘর। একদিকে পাশাপাশি উপবিষ্ট জয়ন্ত, মানিক সুন্দরবাবু ও কয়েকজন পুলিশ-কর্মচারী। আর একদিকে দেখা যাচ্ছে দ্বিজেন, পবিত্রবাবু, মানসী, সুরবালা, উমাতারা সিন্ধুবালা এবং বাড়ীর কয়েকজন ভৃত্য ও দ্বারবান।

সুন্দরবাবু বললেন, তাহলে জয়ন্ত, তুমিই পালা সুরু কর'।

জয়ন্ত গাত্রোত্থান ক'রে বললে, দ্বিজেনবাবু অনুগ্রহ ক'রে এগিয়ে আসবেন কি?

দ্বিজেন অগ্রসর হয়ে জয়ন্তের কাছে এসে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি সন্দেহপূর্ণ, ভাবভঙ্গি সঙ্কুচিত।

জয়ন্ত বললে, দ্বিজেনবাবু, সৌদামিনীদেবীকে হত্যা করেছে কে?

দ্বিজেন হতভম্ব, ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল।

—সৌদামিনীদেবীকে হত্যা করেছে কে? আপনি?

দ্বিজেনের মুখ নীরব, মাথা নত।

জয়ন্ত কঠোর কণ্ঠে বললে, এখনও কি ও-কথা আপনি অস্বীকার করতে চান? কিন্তু মনে রাখবেন, আপনি নিজেই আমার কাছে অপরাধ স্বীকার করেছেন।

দ্বিজেন মৃদু বললে, আমার কিছুই বক্তব্য নেই।

ও-পাশ থেকে পবিত্রবাবু বলে উঠলেন, অসম্ভব! দ্বিজেন কিছুতেই হত্যাকারী হতে পারে না!

জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বললে স্তব্ধ হোন পবিত্রবাবু। আপনারা কেউ আমাকে বাধা দেবেন না। দ্বিজেনবাবু যে হত্যাকারী নন, আমি তা জানি।

দ্বিজেন ভয়ে ভয়ে মুখে তুলে তাকালে; জয়ন্তের আসল উদ্দেশ্য যে কি আন্দাজ করতে পারছে না সে!

জয়ন্ত বললে, আমি জানি, দ্বিজেনবাবু হত্যাকারী নন। আমি জানি, হত্যাকারী কে? দ্বিজেনবাবু আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছেন। নয় কি দ্বিজেনবাবু?

দ্বিজেন তাড়াতাড়ি আবার মুখ নামিয়ে ফেলল।

—আর একজনকে বাঁচাবার জন্যেই দ্বিজেনবাবু মিথ্যা কথা বলেছেন। তিনি কে দ্বিজেনবাবু?

দ্বিজেনের সর্ব শরীর থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল।

—তিনি কে দ্বিজেনবাবু?

দ্বিজেন প্রাণপণে কোনরকমে বলে উঠল, দয়া করুন জয়ন্তবাবু, দয়া করুন।

অট্টহাস্য করে জয়ন্ত বললে, দয়া! বাঘ মারতে গিয়ে শিকারী

করবে দয়া! অপরাধী ধরতে এসে গোয়েন্দা করবে দয়া! ··যাঁকে বাঁচাবার জন্যে আপনি ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে চেয়েছিলেন, তিনি কে? এখানো আপনি বলবেন না? তাহলে আমিই বলে দিচ্ছি— দ্বিজেনবাবু বেশ জানেন, সৌদামিনীদেবীকে হত্যা করেছেন শ্রীমতী মানসীদেবী।

দ্বিজেন মর্মান্তিক আর্তনাদ করে উঠল। সকলের বিস্মিত দৃষ্টি মানসীর উপর গিয়ে পড়ল বিদ্যুতের মত। কিন্তু মানসীর মুখে নেই কোন ভাবের রেখা। মূর্তির মত স্থির তার দেহ।

জয়ন্ত বললে, দ্বিজেনবাবুকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা বৃথা। আপাতত ওর কাছে থেকে জবাব পাওয়া যাবে না, কিন্তু প্রত্যেক কার্যের সঙ্গে থাকে কারণের সম্পর্ক আর দুইয়ের দুই সঙ্গে যোগ করলে হয় চার। দ্বিজেনবাবুরই কাছ থেকে তাঁর মন ধার নিয়ে আর মামলার অন্যান্য সূত্রগুলো যথাস্থানে সাজিয়ে আমি যা পরিকল্পনা করেছি, সকলে এখন তাই শ্রবণ করুন। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার কিছু কিছু গরমিল থাকতে পারে, কিন্তু মোটামুটি ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই রকম।

দ্বিজেনবাবু মাঝরাত্রে ঘরে শুয়ে আছেন, চোখে ঘুম আসছে না। এমন সময়ে বাইরে শব্দ পেয়ে সাড়া নিয়ে জানলেন, মানসীদেবীও তখন পর্যন্ত জেগে আছেন।

সেই রাত্রেই নিহত হলেন সৌদামিনীদেবী। সকলেরই দৃঢ় ধারণা হত্যাকারী বাড়ীর বাইরের লোক নয়। সে সময়ে সকলেই সহজে অন্য লোককে সন্দেহ করে। গত-কল্যকার রাত্রের কথা ভেবে দ্বিজেনবাবুর মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। অত রাত্রেও কেন জেগেছিলেন মানসী দেবী?

সন্দেহে আরো একটা বিশেষ কারণ আছে। প্রথমত, সৌদামিনী দেবী প্রথম উইলে মানসীদেবীর জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। নতুন উইলে মানসীদেবীকে সে টাকা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, মানসীদেবীর সঙ্গে তিনি দ্বিজেনবাবু বিবাহ দিতে সম্পূর্ণ নারাজ আর তাঁর কথার অবাধ্য হওয়ার দরুণ দ্বিজেন-

বাবুকে পথের ভিখারী করেছেন। সুতরাং সৌদামিনীদেবীর উপর মানসীদেবীর বিজাতীয় ক্রোধ আর দারুণ আক্রোশ হওয়াই স্বাভাবিক।

মানসীদেবী যখন অন্যান্য সকলের সঙ্গে সৌদামিনীদেবীর মৃতদেহ নিয়ে অভিভূত হয়ে চুপিচুপি মানসীদেবীর ঘরে ঢুকলেন আর জামা-কাপড়ের ভিতর থেকে আবিষ্কার করলেন রক্তমাখা 'ছত্রপতির ছোরা' আমার ধারণা, সেই সঙ্গে তিনি আরও কিছু আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু তা নিয়ে পরে আলোচনা করলেও চলবে।

এই অভাবিত আবিষ্কার ক'রে দ্বিজেনবাবু যে হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পান, সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু তবু মানসীদেবীর প্রতি তাঁর ভালবাসা একটুও কমলো না, বরং পুলিসের কবল থেকে তাকে উদ্ধার করবার জন্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে উদ্যত হলেন। কেমন দ্বিজেনবাবু আমার অনুমান বোধহয় নিতান্ত ভ্রান্ত নয়?

দ্বিজেন নিরুত্তর, তার অবস্থা জীবন্মৃতের মত।

জয়ন্ত বললে, সঞ্জিবীত হোন দ্বিজেনবাবু, আশ্বস্ত হোন। আমি জানি, আপনি মিথ্যা ভয় পেয়ে মিথ্যা কথা বলেছেন। আমি আপনাকে অভয় দিয়ে বলতে পারি, মানসীদেবী হত্যা করেন নি সৌদামিনী দেবীকে।

ঘরের ভিতর শোনা গেল বহু কণ্ঠের বিস্ময় গুঞ্জন। মানসীর মূর্তি যেমন নির্বাক, তেমনি নিস্পন্দ—সমান অটল আনন্দে-নিরানন্দে। দ্বিজেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে।

জয়ন্ত বললে, এইবারে পবিত্রবাবু কি একবার এদিকে আসবেন।

পবিত্রবাবু উঠে এলেন। দুই ভুরু তাঁর সঙ্কুচিত।

পবিত্রবাবু আজ এ্যাটর্নি-বাড়ীতে গিয়ে জানলুম যে প্রথম উইলে সৌদামিনীদেবী আপনার জন্যে বরাদ্দ রেখেছিলেন বিশ হাজার টাকা।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—নতুন উইলে আপনার ভাগ্যে ছিল না একটিমাত্র পয়সাও।

আপনি উইলের একজন সাক্ষী, এটা নিশ্চয়ই আপনি দেখেছিলেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

—নতুন উইলে আপনার টাকা মারা গেল কেন, এটা প্রথমে আমি বুঝতেও পারিনি। তাই আজ সকালে এ্যাটর্নি-বাড়ী থেকে ফিরে এসে কৌশলে আপনার কাছ থেকে গুপ্ত কথাটা আদায় করে নিই।—আপনাকে বঞ্চিত করবার কারণ, বোধহয় আপনি দ্বিজেন-বাবুর পক্ষসমর্থন করেছিলেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনার পক্ষে দ্বিজেনবাবুর পক্ষসমর্থন বলতে বোঝায় আত্মসমর্থনও।

—অর্থ বুঝলুম না।

—নতুন উইলে সম্পত্তির মালিক হ'তেন হীরেন্দ্রনারায়ণ। তিনি আপনাকে ঘৃণা করতেন। তাঁকে সম্পত্তির মালিক করার অর্থই হচ্ছে আপনাকে চাকরি থেকে তাড়ানো।

—ব্যাপারটা প্রায় সেইরকম দাঁড়ায় বটে।

—তাহলে একসঙ্গে বিশ হাজার টাকা হারিয়ে চাকরী খুইয়ে সৌদামিনীদেবীকে নিশ্চয়ই আপনি ধন্যবাদ দেননি ?

—বলা বাহুল্য।

—তাই ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে করেছিলেন সৌদামিনীদেবীর বক্ষে ছুরিকাঘাত ?

—আপনি কী আজগুবী কথা বলেছেন !

—আপনি এক ঢিলে মারতে চেয়েছিলেন দুই পাখী। সৌদামিনী দেবীকে হত্যা ক'রে নিজে নিরাপদে থাকবার জন্যে সমস্ত সন্দেহ চালনা করতে চেয়েছিলেন এমন এক নিষ্পাপ-নির্দোষ মহিলার দিকে, যার উপরে আপনি তুষ্ট ছিলেন না।

—কার উপরে আমি তুষ্ট ছিলুম না ?

—মানসীদেবীর উপরে। একথা আমি দ্বিজেনবাবুর মুখেই শুনেছি

—একেবারে বাজে কথা !

— প্রথমতঃ, আপনি ছত্রপতির ছোরাখানা মানসীদেবীর আলমারিতে রাখেন। কিন্তু তারপরই বোধ করি আপনার মনের হয় প্রমাণটা আরো দৃঢ় করা উচিত। মানসীদেবীর আলনা থেকে আপনি তার সায়াটা নামিয়ে নেন। সেটাও রক্তলিপ্ত করতে চান। সৌদামিনী দেবীর ঘরে গিয়ে মৃতদেহের ক্ষত থেকে রক্ত সংগ্রহ করা চ'লত, কিন্তু যে কোন মুহূর্তে লাইব্রেরী থেকে মানসীদেবী এসে পড়তে পারতেন। আর একটু দেরী করলে সত্যসত্যই আপনি সেইদিনইহাতে-নাতে ধরা পড়ে যেতেন, কারণ মানসীদেবী তখন নিজের ঘরের দিকেই আসছিলেন, আর আসতে আসতে দূর থেকে আপনার পলায়মান মূর্তি দেখেও চিনতে পারেননি। খুব চটপট কাজ সারবার জন্যে আপনি ছত্রপতির ছোরা দিয়েই নিজের বাঁ-হাতের এক জায়গা অল্প একটু কেটে রক্তপাত ক'রে সায়াটাকেও করেন রক্তাক্ত। তারপর ছোরা আর সায়া আলমারির ভিতরে গুঁজে রেখে পালিয়ে আসেন।

পবিত্রবাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, আপনি দিব্যি বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে পারেন। কিন্তু প্রমাণ কোথায়?

জয়ন্ত বললে, দ্বিজেনবাবু, আলমারির ভিতরে আপনি ছোরার সঙ্গে নিশ্চয়ই একটা রক্তমাখা সায়া পেয়েছিলেন?

দ্বিজেন শান্তস্বরে বললে, পেয়েছিলুম।

—সেটা কোথায় গেল?

—পুড়িয়ে ফেলেছি।

—আরো শুনুন পবিত্রবাবু। আপনি যে রোজ ডি, এন, বসুর ডিসপেন্সারিতে আপনার বাঁ-হাতের ক্ষত 'ব্যাণ্ডেজ' করতে যান, পুলিশ এ খবরও পেয়েছে। ছোরাখানা প্রাচীন। তাতে যে মর্চে ধরেছে তাও আমি দেখেছি। তাই আপনার ক্ষত বিষিয়ে অসামান্য হয়ে উঠেছে। আপনি জামার বাঁ-অস্তিন গুটোন দেখি, তাহলে সকলেই ব্যাণ্ডেজ দেখতে পাবে।

পবিত্রবাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, আমার হাতের ব্যাণ্ডেজ কি আমাকে হত্যাকারী বলে প্রমাণিত করবে?

—আপনি আমার ঘরের জানালায় আড়ি পেতে আমার কথা শোনবার চেষ্টা করতেন। কৌশলে আমি আপনার পদচিহ্ন সংগ্রহ করেছি। ছাঁচও উঠেছে। একটু মেলালেই আপনি ধরা পড়ে যাবেন।

পবিত্রবাবু এইবার অধীর স্বরে চীৎকার করে বললেন, আড়ি পেতে শোনা মানেই কি নরহত্যা করা? প্রমাণ দেখান, প্রমাণ দেখান, যত সরাবি কথা!

পবিত্রবাবু, তাহলে এইবারে আমাকে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করতে হয়। এই ছোরা দিয়ে বাঁ-হাত কাটবার পর রক্ত বন্ধ করবার জন্যে আপনি নিজের রুমাল ক্ষতের উপরে জড়িয়ে নিয়েছিলেন, তখন তিন ফোঁটা রক্ত পড়েছিল ঘরের মেঝের উপরে। সেই রক্তাক্ত রুমালের উপরে ছিল আপনার ডান হাতের একটা আঙুলের ছাপ। কিন্তু আলমারির ভিতরে ছোরা আর সায়াটা রাখবার সময়ে রুমালখানাও যে ক্ষতস্থান থেকে খসে পড়ে গিয়েছিল, মনের উত্তেজনায় আর তাড়াতাড়িতে আপনি তা একেবারেই টের পাননি। কাল পুলিশ এসে আপনাদের সকলকার ডানহাতের আঙুলের ছাপ নিয়ে গিয়েছে। পরীক্ষায় নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছে যে, রুমালের উপরে আপনারই আঙুলের ছাপ।···আপনার কিছু বক্তব্য আছে?

পবিত্রবাবুর মুখ হঠাৎ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল এবং ফুলে উঠল তাঁর কপালের দুই দিকের দুটো শিরা। তারপরই বিকট একটা চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দুই বাহু ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করে দুই হাত দিয়ে শূন্য আঁচড়াতে আঁচড়াতে দড়াম করে পড়ে গেলেন কক্ষতলে। মহা হৈ-চৈ করে সকলে কাছে ছুটে এল। পবিত্রবাবুর দেহ দুই-তিন বার নড়ে চড়ে একেবারেই স্থির হয়ে গেল। তিনি সংবরণ করলেন ইহলীলা।

জয়ন্ত বললে, আর এখানে নয় মানিক, সরে পড়ি চল। আমাদের কর্তব্য সমাপ্ত।

জয়ন্ত ও মানিক নিজেদের জিনিস-পত্তর গুছিয়ে নিচ্ছে, এমন সময়ে সুন্দরবাবু এসে বললেন, জয়ন্ত, একেবারে ডবল ট্রাজেডি!

পবিত্রবাবুর কীর্তি শুনে আর মৃত্যু দেখে তাঁর স্ত্রী সুরবালারও হৃদ-যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

জয়ন্ত দুঃখিতভাবে বললে, গোয়েন্দার কর্তব্য কি নিষ্ঠুর! আমাদের জন্যেই এই কাণ্ড! মারা গিয়েছিলেন কেবল সৌদামিনী-দেবী। আমরা এসে মরাকে তো বাঁচাতে পারলুমই না, উল্টে মারলুম আরো দু'জন লোককে।

মানসীকে সঙ্গে করে ঘরের ভিতর ঢুকতেঢুকতে দ্বিজেন হাসি মুখে বললে, না জয়ন্তবাবু, গোয়েন্দার কর্তব্যে মাধুর্যও আছে। আমরা তো মরতেই বসেছিলুম, আপনার জন্যেই আমরা আবার লাভ করলুম নবজীবন। আপনি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন। মানসীর সঙ্গে দ্বিজেন যুক্ত করে জানু পেতে জয়ন্তের সামনে উপবেশন করলে।

দুজনকে হাত ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে জয়ন্ত প্রসন্নমুখে বললে, প্রার্থনা করি, ভগবান যেন আপনাদের যুক্তজীবনকে আনন্দময় করে তোলেন। তারপর পকেট থেকে দ্বিজেনের দেওয়া চেকখানি বার করে সে আবার বললে, এই নিন আপনার চেক।

দুই হাত জোড় করে দ্বিজেন বললে, ক্ষমা করবেন। ও চেক আপনারই!

জয়ন্ত সকৌতুকে হেসে বললে, তাই নাকি! সুন্দরবাবুর ওষ্ঠাধরে একটা নতুন চুরোট ধারণ করুন তো। আচ্ছা, এইবারে আপনার দেশলাইটা আমাকে দিন। দ্বিজেনবাবু, আগেকার সখের বাবুরা নাকি দশ টাকার নোট পুড়িয়ে সিগারেট ধরাতেন। আমরাও বড় ছোট্ট মনুষ্য নই। এই দেখুন, আপনার চেকে অগ্নিসংযোগ করলুম, আর এই দেখুন, সুন্দরবাবুর শ্রীমুখ ধুম উদ্‌গীরণ করছে।

মানিক বললে, অতুলনীয় দৃশ্য-কাব্য! পঁচিশ হাজার'টাকার অগ্নিসংস্কার। এ দৃশ্য দেবতাদেরও লোভনীয়!

সুন্দরবাবু বললেন, হুম!*

---

* এই কাহিনীটিতে একটি বিদেশী গল্পের ছায়া আছে।

• এখানে যে কাহিনীটি দেওয়া হ'ল এটি গল্প নয়। একেবারে সত্যিকার গোয়েন্দাকাহিনী। এর একটি কথাও বানানো নয়। ঘটনাস্থল আমেরিকার সানফ্রানসিস্‌কো শহর।

শুভবন

রাত সাড়ে তিনটে। রাস্তার এক পাশে একখানা মোটর গাড়ী। সামনে আসনে মূর্ত্তির মত স্থির হয়ে ব'সে আছে একটা লোক। কনস্টেবল লুইস শিলি নিজের ঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নজর রাখছিল গাড়ীখানার উপরে। এইভাবে কেটে গেল ঘণ্টা খানেক। তারপর শিলি এগিয়ে এসে গাড়ীর ভিতরে ফেললে নিজের টর্চের আলো। ড্রাইভারের আসনে ব'সে ব'সেই ঘুমোচ্ছে একটি ছোকরা। দুই চোখ মোদা, মাথাটি এলিয়ে পড়েছে কাঁধের উপরে। শিলির প্রথম ধাক্কায় ছোকরা নড়ে-চ'ড়ে উঠল বটে কিন্তু তার ঘুম ভাঙ্গল না। দ্বিতীয় ধাক্কা দিয়ে শিলি হাঁকলে, এই! কে তুমি? উঠে পড়।

ধড়মড় ক'রে ছোকরা জেগে উঠল। তার চোখে-মুখে আতঙ্ক। তারপর ভালো ক'রে চেয়ে দেখে একটা অস্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে বললে, তবু ভালো, পুলিশ! আমি ভেবেছিলুম ডাকাত! যা ভয় পেয়েছিলুম!

শিলি শুধালে, কে তুমি বাপু? এখানে কি করছিলে?

—ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

—নাম কি?

—ডেভিড টিঙ্গো।

—বয়স?

—সতেরো।

—বাড়ী কোথায়?

—ক্যামডেনে।

—এত রাত্রে বাড়ীতে না গিয়ে রাস্তায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিলে কেন ?

—সিনেমা দেখে বাড়ী ফিরছিলুম। হঠাৎ চোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে এল।

ছোকরা জবাবগুলো দিচ্ছিল বেশ সপ্রতিভ মুখেই। তার ভাব-ভঙ্গিও সন্দেহজনক নয়। কিন্তু শিলি ভাবলে, তবু বলা তো যায় না, দিন-কাল যা খারাপ। চারিদিকেই চুরির পর চুরি হচ্ছে; ছোকরাকে আর একটু বাজিয়ে দেখা যাক।

—টিঙ্গো, তোমার গাড়ীর লাইসেন্স দেখি।

—একটা চামড়ার ব্যাগে পুরে লাইসেন্সখানা পকেটে রেখে দিয়েছিলাম। আজ দু'দিন হল ব্যাগটা হারিয়ে গিয়েছে।

—বটে, বটে। তাহ'লে আমার সঙ্গে একবার থানায় চল' তো বাপু।

টিঙ্গো কোনরকম ইতস্তত না ক'রেই শিলির অনুসরণ করলে।

থানায় এসে টিঙ্গো বললে, মা-বাবা আমার জন্যে ভাবছেন। একবার বাড়ীতে ফোন করতে পারি ?

টিঙ্গো চলে গেল। শিলি থানার 'ফাইল' ঘেঁটে দেখতে লাগল, ডেভিড টিঙ্গো নামে কোন ছোকরা আসামীর নাম খুঁজে পাওয়া যায় কিনা ? খোঁজা-খুঁজি ব্যর্থ হ'ল টিঙ্গোর নাম নেই।

টিঙ্গো বলেছে তার বাসা ক্যামডেনে। শিলি অন্য একটা ফোনের সাহায্যে সেই এলাকার থানার কর্মচারীকে ডাকলে। ডিটেকটিভ মর্গ্যান শিলির কাহিনী শুয়ে ক্যামডেন থানার 'ফাইল' খুঁজে বললেন, ডেভিড টিঙ্গো নামে কোন ছোকরা কোন দিন এ এলাকায় ধরা পড়েনি।' তখন শিলির বিশ্বাস হ'ল যে টিঙ্গো তাহলে দুষ্ট ছোকরা নয়।

সে টিঙ্গোর কাছে গিয়ে বললে, তোমার গাড়ী আপাতত থানাতেই

থাক। প্রায় ভোর হয়েছে। তুমি বাসে চড়ে বাড়ী যেতে পারবে ?

—অনায়াসেই।

—বেশ। বাড়ীতে গিয়ে তোমার বাবাকে একবার এখানে ডেকে আনো।

টিঙ্গো চমকে উঠল। প্রস্তাবটা তার পছন্দ হ'ল না। বললে, বাবাকে কেন ? মাকে ডেকে আনলে চলবে না ?

—বাবার নাম শুনেই তুমি চমকে উঠলে কেন ?

টিঙ্গো বললে, এত ভোরে বাবাকে ডাকাডাকি করলে তিনি চটে যেতে পারেন।

—বেশ, তাহলে যে কেউ এলে চলবে। তোমার বাবা কি মা এসে যদি লাইসেন্সের কথা স্বীকার করেন, তবে গাড়ী ছেড়ে দিতে আমি কোন আপত্তি করব না।

টিঙ্গোর প্রস্থান। শিলি বসে বসে ভাবতে লাগল, সাবধানের মার নেই বলেই এত হাঙ্গামা করলুম। ছোকরা অপরাধী নয়। দেখা যাক ওর মা এসে কি বলে।

আধ ঘণ্টা পরে বেজে উঠল টেলিফোনের ঘণ্টা। শিলি রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললে, হ্যালো!

—আমি ক্যামডেন থানার ডিটেকটিভ মর্গ্যান। একটু আগেই তুমি না বলেছিলে, ডেভিড টিঙ্গো নামে কে এক ছোক্‌রা তার চামড়ার ব্যাগ হারিয়ে ফেলেছে ?

—হ্যাঁ, তাই।

—উত্তম। সেই ব্যাগটা আমরা পেয়েছি। ছোকরা এখন কোথায় ?

—বাড়ী থেকে মাকে ডেকে আনতে গিয়েছে।

—সে ফিরে এলে থানায় বসিয়ে রেখ'। আমরা এখনি যাচ্ছি।

—মর্গ্যানের কণ্ঠস্বর উত্তেজিত।

শিলি অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, এ আবার কি ব্যাপার? টিঙ্গোর ব্যাগ, ক্যামডেন থানায় হাজির হল কেমন করে? আর ওটা যে টিঙ্গোর ব্যাগ, তাই বা মর্গ্যান জানতে পারলো কেমন করে?

এমন সময় টিঙ্গোর পুনরার্ভিাব—সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর এসে দাঁড়ালেন মর্গ্যান ও কেনলি দুই ডিটেকটিভ।'

শিলি জিজ্ঞাসা করলে, টিঙ্গো, তোমার মা কই?

—এত সকালে মাকে টানাটানি করতে ভাল লাগল না। তাঁকে আর আনবারও দরকার নেই।

—কেন?

—আমি ভুল করেছিলুম। ব্যাগে নয়, লাইসেন্সখানা ছিল আমার বাড়ীর ভিতরেই। এই নিন।

লাইসেন্সের উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে শিলি বললেন, দেখছি সব ঠিকঠাক আছে। ভালো কথা। টিঙ্গো, ক্যামডেন থানা থেকে এই দুজন ডিটেকটিভ এসেছেন তোমার সন্ধানে।

দুই

ক্যামডেনেই তার বাসা, সেখানকার দু-দুজন ডিটেকটিভ তাকে খুঁজতে এসেছে শুনে টিঙ্গোর মুখ শুকিয়ে গেল। সে জিজ্ঞাসা করলে, কেন? ব্যাপার কি?

মর্গ্যান বললেন, ব্যাপার কিছুই নয় বাপু! তবে তোমার কাছ থেকে হয়তো আমরা কিছু সাহায্য পেতে পারি। দেখ তো এই চামড়ার ব্যাগটা তোমার কি না? তিনি টেবিলের উপরে একটি ছোট ব্যাগ স্থাপন করলেন।

ব্যাগটা নকল চামড়ার তৈরি। তার উপরে মুদ্রিত আছে এক অশ্বারোহী 'কাউ-বয়ে'র ছবি। বালকরাই এ-রকম ব্যাগ ব্যবহার করতে ভালবাসে।

টিঙ্গো এক গাল হেসে বললে, বাঃ, এ তো আমারই ব্যাগ! আপনারা এটা কোথায় পেয়েছেন?

তীক্ষ্ণ চোখে তার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে মর্গ্যান বললেন, টিঙ্গো, তুমি ঐ চেয়ারে বোসো।

টিঙ্গো বসল। চেয়ার টেনে তাকে ঘিরে বসলেন গোয়েন্দারাও।

মর্গ্যান বললেন, শোনো টিঙ্গো। আজই রাশি রাশি চোরাই মাল আমাদের হস্তগত হয়েছে। কেমন ক'রে তা বলতে চাই না, কারণ সে হচ্ছে অনেক কথা। এইটুকু খালি জেনো রাখো, সেইসব চোরাই মালের ভিতরে ছিল তোমার এই ব্যাগটাও। ফাউণ্টেন পেন, বন্দুক, রিভলবার, জড়োয়া গহনা প্রভৃতি আরো অনেক কিছু দামী-দামী জিনিসের সঙ্গে এই তুচ্ছ ব্যাগটি ছিল কেন, আমরা তা বুঝতে পারছি না। এখন তুমি যদি বলতে পারো ব্যাগটা কোথায়, কেমন করে হারিয়ে ফেলেছিলে, তাহলে চোরের সন্ধান পেতে দেরী হবে না।

ডেভিড টিঙ্গোর মুখ দেখে মনে হল যেন দস্তুরমত হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। তারপর সে মাথা নেড়ে বলল, ব্যাগটা আমার কাছ থেকে চুরি যায়নি, ওটা আমি নিজেই কোথাও হারিয়ে ফেলেছিলুম। তবু চোরাই মালের সঙ্গে পাওয়া গেল আমার ব্যাগ, ভারি আজব ব্যাপার তো!

মর্গ্যান বললেন, ব্যাগটা হয়তো তোমার কাছ থেকেই চুরি গিয়েছে।

—অথচ আমি টের পাইনি।

—আশ্চর্য্য কি, হয়তো চোর তোমার পকেট মেরে সরে পড়েছিল।

টিঙ্গো আবার মাথা নেড়ে জানালো, না।

মর্গ্যান শুধোলেন, তোমার ব্যাগটা কবে হারিয়ে গিয়েছে?

—দিন তিনেক আগে।

—তোমার ঠিক মনে আছে।

—অন্তত গেল দুদিন থেকে ব্যাগটা খুঁজে পাচ্ছি না।

মর্গ্যান পকেট থেকে একখানা 'ট্রসি'-হস্তাক্ষরপত্র বার করে বললেন, এখানা কি তোমার?

—নিশ্চয়। যদিও ও কাগজখানা এখনো আমি ব্যবহার করিনি।

মর্গ্যান বললেন, কাগজখানা তোমার ঐ ব্যাগের ভিতরেই ছিল।

আচম্বিতে টিঙ্গোর মুখ হয়ে গেল রক্তশূন্য। সে বলে উঠল, না, না, ও কাগজখানা আমার নয়। আমি কি বলতে কি বলে ফেলেছি। আপনারা আমার মাথা গুলিয়ে দিয়েছেন।

—হ্যাঁ, তাই দিয়েছি বটে।

—ও কাগজ আমার হতে পারে না। আমি বলছি ও কাগজ আমার নয়।

মর্গ্যান গাত্রোত্থান করে বললেন, টিঙ্গো তোমাকে এখন আমাদের সঙ্গেই যেতে হবে। দেখছি, আমরা কোন সাধারণ চুরির মামলা হাতে পাইনি, এর ভিতরে আছে গভীর রহস্য।

মর্গ্যানের কথাই পরে সত্য হয়ে দাঁড়ায়। ডেভিড টিঙ্গো বালক মাত্র, কৈশোর অতিক্রম করে সবে যৌবনে পা দিয়েছে বটে, কিন্তু এখনো তার মুখের উপরে আছে বালকতার সুস্পষ্ট ছাপ। অথচ তারই চারিদিক ঘিরে রচিত হয়েছিল যে জটিল ও অদ্ভুত রহস্যের জাল, তা যেমন অসাধারণ, তেমনি অভাবিত ও অতুলনীয়। আপাতত আমরাও টিঙ্গোকে পুলিশের জিম্মায় রেখে গোয়েন্দাদের সঙ্গে রহস্য-জালের খেই খোঁজবার চেষ্টা করব।

চুরির হিড়িক সুরু হয় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট তারিখে। চোরেরা হানা দেয় কলিংস রোডের মিঃ ওটো টপকারের বাড়ীতে। তারা একটা জানালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেছিল। চুরির আগে ভারি-ভারি আসবাবগুলো টেনে এনে এমনভাবে সদর দরজার



—ও কাগজ আমার হতে পারে না। আমি বলছি ও কাগজ আমার নয়।

পৃষ্ঠা-১৪

উপরে চাপিয়ে রেখেছিল যে, বাড়ীর মালিক ভিতরে আসবার জন্যে ঠেলাঠেলি করলেই তারা স'রে পড়বার সুযোগ পাবে। চুরির পর তারা বেরিয়ে গিয়েছিল খিড়কীর দরজা দিয়ে।

তারপর থেকে সুরু হ'ল চুরির পর চুরি—ক্যামডেন, কলিংস্‌উড, গ্রসেষ্টার, পেন্‌সকেন ওক্‌লীন, অডুবন ও হ্যাডন হাইট্‌স্‌ প্রভৃতি সাউথ ডারসির সহরে-সহরে। সর্বত্র তাদের একই পদ্ধতি। তারা জানলা ভেঙে ভিতরে ঢোকে, সদর দরজার উপরে আসবাবগুলো চাপিয়ে রাখে এবং খিড়কীর দরজা দিয়ে পলায়ন করে।

প্রত্যেকবারেই তাদের আবির্ভাব হয় রাত আটটার কাছাকাছি কোন একটা সময়ে। সেই জন্যে তাদের নাম রাখা হ'ল 'রাত আটটার চোরের দল'। তারা যে সন্ধানী চোর সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কারণ প্রত্যেকবারেই চুরির সময়ে বাড়ীর লোক থেকেছে অনুপস্থিত।

অনেকদিন পর্য্যন্ত জনপ্রাণী চোরেদের মুখদর্শন করবার সুযোগ পায়নি। একবার মাত্র জনৈক ব্যক্তি একটি ঘটনাক্ষেত্রে দুইজন লোককে চলে যেতে দেখেছিল, কিন্তু সেও তাদের পিছন দিক ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনি।

অবশেষে মিঃ জ্যাফার্টির বাড়ীতে তাদের একজনের খানিকটা বর্ণনা পাওয়া গেল।

ডিটেকটিভ মর্গ্যান ও কনলির কাছে জ্যাফার্টি বললেন: বাড়ীর অন্যান্য লোকেরা সিনেমা দেখতে গিয়েছিল, আমি সব আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। রাত যখন আটটা পনেরো, তখন একতলায় কি একটা শব্দ হয়, আমারও ঘুম ভেঙে যায়। আমি বিছানা থেকে নেমে পা টিপে টিপে গিয়ে সিঁড়ির আলো জ্বেলে দিয়ে দেখি। নিচে একটা লোক দাঁড়িয়ে উর্দ্ধমুখে তাকিয়ে আছে আমার পানে। সে আমাকে শাসিয়ে বললে 'খবর্দার, টুঁ শব্দটি কোরো না।' পর মুহূর্ত্তে সে সাঁৎ করে নিজের পকেটে হাত

চালিয়ে দিল—আমি ভাবলুম, এই রে এই রে, এইবারে বার করে বুঝি রিভলবার। তারপর সে রিভলবার বার করলে না বটে, কিন্তু পকেট থেকে নিজের হাত বার করে আমার দিকে একটা অঙ্গুলি-নির্দেশ করে তালুতে জিভ লাগিয়ে একটা শব্দ উচ্চারণ করলে। তার পরেই খিলখিল করে হেসে উঠে এক ছুটে বাড়ীর বাইরে পালিয়ে গেল। আমি নীচে নেমে গিয়ে দেখি, আমার আসবাবগুলো স্থানচ্যুত হয়েছে বটে কিন্তু চোর সেগুলো সদর দরজা পর্য্যন্ত নিয়ে যাবার সময় পায়নি। একটা জানালাও ভাঙা।

গোয়েন্দারা চোরের চেহারার বর্ণনা জানতে চাইলেন।

জ্যাফার্টি বললেন, তার বয়স, উনিশ-বিশের মধ্যেই। মাথার উচ্চতা হবে আন্দাজ সাড়ে পাঁচ ফুট, দেহের ওজন দুই মণের বেশী হবে না। তার মাথায় লম্বা-লম্বা চুল, সরু নাক। দুই গালের হাড় উঁচু, তার চোখ দু'টো ছোট ছোট।

সব থানাতেই জেল-খাটা বিখ্যাত বা অবিখ্যাত আসামীদের অসংখ্য ফটো সংগ্রহ করে রাখা হয়।

গোয়েন্দারা বললেন, লোকটার ছবি দেখলে আপনি চিনতে পারবেন?

—পারব।

জ্যাফার্টিকে ছবির বইগুলোর সামনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেওয়া হ'ল—গাদা-গাদা বই। কয়েক ঘণ্টা পরে ছবি দেখা শেষ করে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার বাড়ীতে যে অনাহূত অতিথি এসেছিল এর মধ্যে তার ছবি নেই।

। তিন ।

গেল পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পরের দিনের কথা। গ্রসেষ্টারের একখানা বাড়ীতে গিয়ে হানা দিলে 'রাত আটটার চোরের দল'। তার পরের দিনই কলিংউডে হ'ল আবার তাদের আবির্ভাব। এ

পর্য্যন্ত তারা যে সব নগদ টাকা, জড়োয়া গয়না, রেডিও ও ঘড়ি প্রভৃতি সরিয়ে ফেলতে পেরেছে তার মোট দাম হবে প'য়ত্রিশ হাজার টাকার চেয়েও বেশী।

পুলিশের অবস্থা অত্যন্ত অসহায়। তারা উদভ্রান্তের মত ছুটোছুটি করছে, প্রাণপণ চেষ্টার ও তদন্তের কিছুই বাকি রাখছে না, তবু নিয়মিতভাবেই চুরি হচ্ছে আজ এখানে, কাল ওখানে—যেখানে সেখানে। পুলিশ অতঃপর কি করবে যেন তা জানতে পেরেই চোরের দল পুলিশের আগে-আগেই গিয়ে আবির্ভূত হয় যে কোন ঘটনা-ক্ষেত্রে।

পুলিশের খাতায় ছাড়া পাওয়া যত দাগী চোরের নাম আছে, তাদের ভিতর থেকে প্রত্যেক সন্দেহজনক ব্যক্তিকে আবার ধরে এনে খোঁজ-খবর নেওয়া হল—ফল কিন্তু অষ্টরম্ভা। রাতে পথে পথে চৌকিদারের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। যে-সব দোকানে লোক জিনিসপত্তর বাঁধা রাখে বা বিক্রি করে, সেখানে খানাতল্লাস করেও একটিমাত্র চোরাই মাল পাওয়া গেল না।

কর্নেল একদিন মর্গ্যানকে ডেকে বললেন, চোরেরা যদি না চুরির পদ্ধতি বদলায় আর রাত আটটায় চুরি করার অভ্যাস না ছাড়ে, তবে একদিন না একদিন আমাদের হাতের মুঠোর ভিতরে তাদের আসতে হবেই।

তারপর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের দোসরা জানুয়ারী তারিখে সাতষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ জর্জ ব্রাউন রাজপথ দিয়ে যেতে যেতে আক্রান্ত হলেন দুইজন গুণ্ডার দ্বারা।

একটা গুণ্ডা রিভলবার দেখিয়ে টাকার দাবি করে। ব্রাউন প্রতিবাদ করাতে সে রিভলবারের বাড়ি মেরে তাঁর মাথা ও মুখ ক্ষত বিক্ষত করে দেয় এবং তিনি মাটির উপরে পড়ে যান প্রায় অচৈতন্যের মত।

পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে ব্রাউনের কাছ থেকে আততায়ীর

যে বর্ণনা সংগ্রহ করলে, তার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল গত পরিচ্ছেদে জ্যাফার্টির দ্বারা বর্ণিত চোরের চেহারা।

অধিকতর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ঘটনাটা ঘটেছিল প্রায় রাত আটটার সময়েই।

মর্গ্যান বললেন, একই লোকের কীর্তি বলে সন্দেহ হচ্ছে।

কনলি মাথা নেড়ে বললেন, কিন্তু আচমকা এই নূতন পদ্ধতিটা আমার ভাল লাগছে না। কোথায় বাড়িতে বাড়িতে চুরি, আর কোথায় রাজপথে রাহাজানি। চোরেরা সাধারণতঃ নিজেদের এক এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলে মনে করে, সহসা তারা নিজেদের পদ্ধতি বদলায় না। তবু বর্তমান ক্ষেত্রে সময় আর চেহারার যে মিল দেখছি, তাও উপেক্ষা করা চলে না।

চুরির পর চুরি চলতে লাগল, একটানা চলতে লাগল চুরির পর চুরি। চোরেদের হাত যেন দম-দেওয়া ঘড়ির কাঁটা, নির্দিষ্ট সময়ে করে নির্দিষ্ট কর্তব্যপালন।

হ্যাডন হাইটের একখানা বাড়ী থেকে রাত আটটার চোরেরা নিয়ে গেল সাত লক্ষ টাকার জড়োয়া গহনা।

মর্গ্যান ও কনলি থানায় এসে চোরেদের নব-নব কীর্তি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, হঠাৎ এল' টেলিফোনের আহ্বান।

স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর। সে মার্কেট স্ট্রিটের এক রেস্তোর'ার পরিবেশিকা। উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, শীগগির আসুন, শীগগির! এখানে একটা লোক এসেছ।

—কে লোক? কি বলছ তুমি?

—এখানে একটা লোক কোথায় রাহাজানি করে এসেছে বন্ধুদের কাছে সেই গল্প করছে। শীগগির আসুন, নইলে সে চলে যাবে।

তখনই দুই গোয়েন্দা মোটর ছুটিয়ে দিলেন সেই রেস্তোর'ার দিকে। পরিবেশিকা রেস্তোর'ার দরজাতেই দাঁড়িয়ে পুলিশের জন্যে

অপেক্ষা করছিল। এক ব্যক্তিকে সে দেখিয়ে দিলে অঙ্গুলি-নির্দেশ। সে তখন বাইরে বেরিয়ে পথের উপরে এসে দাঁড়িয়েছে।

তার পথরোধ করলে গোয়েন্দারা।

সচমকে সে বললে, কি চান আপনারা?

—আমরা পুলিস।

সে ভয়ে ভয়ে বললে, তাই নাকি?

মর্গ্যান বললেন, তুমি কোথায় গিয়ে রাহাজানি করেছ, এতক্ষণ সেই গল্প বলছিলে। আমরাও গল্পটা শুনতে চাই।

—রাহাজানি!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাহাজানি। এতক্ষণ তাই নিয়ে যে খুব মুখ-সাবাসি করছিলে!

—মুখসাবাসি! হ্যাঁ মশাই, ঠিক তাই। বন্ধুবান্ধবের কাছে অনেকেই মুখের কথায় রাজা-উজীর মারতে চায়, তা কি আপনারা জানেন না? আমি যা বলছিলুম সব বাজে বানানো কথা।

—তোমার নাম?

—আমাদের সঙ্গে থানায় চল'।

ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় বৃদ্ধ জর্জ ব্রাউনকে থানায় ডেকে আনা হ'ল।

ক্লিংকে আরো কয়েকজন লোকের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গোয়েন্দারা জিজ্ঞাসা করলেন, মিঃ ব্রাউন, দোসরা জানুয়ারীতে যে লোকটা আপনাকে রিভলবার দিয়ে মেরে আহত করেছিল, সে এই দলের মধ্যে আছে?

ব্রাউন মিনিট কয়েক ভালো করে লক্ষ্য করে দেখিয়ে দিলেন অ্যাণ্ডি ক্লিংকে।

ক্লিং যেন একেবারেই স্তম্ভিত। তারপর সে আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, না, না, এ সত্য নয়। উনি ভুল করেছেন।

ব্রাউন বললেন, অসম্ভব! আমি যদি আরো দশ লক্ষ বৎসর বাঁচি তাহলেও তোমার মুখ জীবনে ভুলতে পারব না।

কর্নেলির জামার হাতা চেপে ধরে ক্লিং বললে, আমার কথায় বিশ্বাস করুন। এ ভদ্রলোক কি বলছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

কর্নেলি বললেন, উনি তোমাকে সনাক্ত করেছেন। তবু তুমি দোষ স্বীকার করছ না কেন?

ক্লিং বললে, যে দোষ করিনি তাই আমাকে স্বীকার করতে হবে?

—সেদিন তোমার সঙ্গে আর একজন লোক ছিল। কে সে?

—কেউ নয়। আমিই যখন ঘটনাস্থলে হাজির ছিলুম না, তখন আমার সঙ্গে আবার থাকবে কে?

—এই যে রাত আটটায় চুরি, এর সম্বন্ধে তুমি কি জানো?

—আপনি কি বলতে চান? আমার বিরুদ্ধে আরো সব চুরির মামলা আছে নাকি?

গোয়েন্দারা এমনি সব প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন, কিন্তু ক্লিংয়ের কাছ থেকে কোন স্বীকার-উক্তিই আদায় করতে পারলেন না। তার এক কথা—সে ব্রাউনকে আক্রমণ করেনি, রাত আটটার চুরি সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ জানে না।

গোয়েন্দারা বুঝলেন, ব্রাউনের মামলায় ক্লিংকে দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে বটে, কিন্তু রাত আটটার চুরির মামলায় তার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণিত হয়নি। তখন জ্যাফার্টিকে ডেকে আনা হ'ল সর্বপ্রথমে যাঁর সঙ্গে রাত আটটার চোরদের একজনের মুখোমুখি দেখা হয়ে গিয়েছিল।

তিনিও কয়েকজন লোকের ভিতর থেকে ক্লিংকে বেছে নিয়ে বললেন, এই লোকটিকে সেই চোরটার মতন দেখতে বটে, কিন্তু এ ভিন্ন লোকও হ'তে পারে।

—তাহ'লে আপনি ঠিক সনাক্ত করতে পারছেন না?

—প্রায় তাই-ই বটে। চোরের চেহারার সঙ্গে এর অনেকটা মিল আছে, এর বেশী আর কিছু আমি বলতে পারব না।

ক্লিংকে রাহাজানি মামলায় বিনা জামিনে ধ'রে রাখা হ'ল।

মর্গ্যান বললেন, ক্লিং বন্দী, এখন দেখা যাক এর পরেও রাত আটটার চুরি বন্ধ হয় কি না? তা যদি হয়, তবে বুঝতে হবে ক্লিং সত্য সত্যই ঐ চুরিগুলির সঙ্গে জড়িত আছে।

চার

এপারে ক্যামডেন, ওপারে ফিলাডেল্‌ফিয়া এবং দুই শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যায় ডেলীওয়ার নদী। নদী পার হয়ে অপরাধীরা দুই শহরে গিয়েই উৎপাত করে এবং নদী পার হয়ে গোয়েন্দাদেরও দুই শহরে গিয়েই কাজ করতে হয়।

কিন্তু ফিলাডেলফিয়ায় এ পর্যন্ত 'রাত আটটার চোরেদের' কোন উপদ্রব হয়নি। তার বদলে ঘটতে লাগল অন্যরকম ঘটনা।

আদালতে যেদিন অ্যাণ্ডি ক্লিংয়ের মামলা, ঠিক সেই তারিখেই ফিলাডেল্‌ফিয়ার ডাক্তার গ্রুয়েস যখন নিজের ডিসপেন্‌সারিতে ব'সে আছেন, তখন দুজন লোক এসে তার কাছে সর্দি-কাশির ঔষধ চাইল ডাক্তার গ্রুয়েস তাদের সঙ্গে কথা কইছেন, হঠাৎ একটা লোক রিভলবার বার করে বললে, তোমার কাছে টাকাকড়ি কি আছে দাও।

ডাক্তার বিনা বাক্যব্যয়ে নিজের ব্যাগটা (তার ভিতরে দুই শ' টাকা ছিল) বার করে দিলেন। তবু অকারণেই তারা তাঁকে রিভলবারের দ্বারা নির্দয়ভাবে প্রহার না করে অদৃশ্য হল না।

পুলিশ ভাবলে, স্থানীয় অপরাধীর কীর্তি।

আরো দুই হপ্তা পরে ঠিক ঐ ভাবেই নিজের ডিস্‌পেন্সারিতে

বসেই আক্রান্ত ও প্রহৃত হলেন ডাক্তার আর্ভিং রোজেনবার্গ। চোরেরা তাঁর কাছ থেকে হস্তগত ক'রলে এক হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা।

গোয়েন্দারা বললেন, একই দলের কীর্তি।

দুই হপ্তা পরে স্থানান্তরে আবার সেই কাণ্ড। এবারে ষ্টানলি বক্ নামে আর এক ডাক্তারের পালা।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আবির্ভূত হয়েছিল দুজন করে লোক এবং প্রত্যেক ডাক্তারের কাছ থেকেই পাওয়া গিয়েছিল তাদের চেহারার বর্ণনা। কিন্তু পুলিশ তবু কোন অপরাধীরই নাগাল পেল না।

এদিকে অ্যাণ্ডি ক্লিং যখন বাস ক'রছে ক্যামডেনের জেলখানায়, তখনও বন্ধ হ'ল না রাত আটটার চুরিগুলি।

সত্যি কথা বলতে কি আদালতে যেদিন উঠল অ্যাণ্ডি ক্লিংয়ের মামলা, ঠিক সেদিনই রাত আটটার সময়ে চোরের দল হানা দিলে কলিংস্উডের একখানা বাড়ীতে এবং যাবার সময়ে পিছনে রেখে গেল নিজেদের বিখ্যাত ট্রেডমার্ক: সেই ভাঙা জানালা, সেই খোলা খিড়কীর দরজা।

কন্লি বললেন, কিছুই বুঝতে পারছি না, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

মর্গ্যান বললেন, ক্লিংয়ের রাহাজানির সঙ্গে এই রাত আটটার চুরির কোন সম্পর্ক নেই।

কন্লি বললেন, ক্লিং ধরা পড়ার পরও তার জুড়িদার রাত আটটার ব্যবসা চালিয়ে, যাচ্ছে এও হতে পারে তো?

মর্গ্যান বললেন, তাতে আর আমাদের কি সুরাহা হবে? ক্লিং তো তার জুড়িদারের নাম আমাদের কাছে ফাঁস করে দেবে না?

এদিকে চুরির পর চুরি, ওদিকে ডাক্তারের পর ডাক্তারের উপরে আক্রমণ, দুই কাজই চলতে লাগল একসঙ্গে। এই দুই ব্যাপারের মধ্যে যে কোন যোগাযোগ আছে, এমন সন্দেহ পুলিশের মনে ঠাঁই

পেলে না। কাগজওয়ালারা খাপ্পা হয়ে উঠল। কিন্তু পুলিশ নাচার।

ডাক্তার হোরেসিয়ো ক্যাম্পবেল ডিসপেনসারিতে উপবিষ্ট। বাহির থেকে দরজায় করাঘাত হ'ল। তিনি উঠে দরজা খুলে দিয়ে দেখলেন, তিনজন লোক বাইরের বেঞ্চির উপর পাশাপাশি বসে আছে।

একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বড়ই ঠাণ্ডা লেগেছে ডাক্তারবাবু। ওষুধ-টষুধ দিতে পারেন?

ডাক্তার ক্যাম্পবেলের বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। ডাক্তারদের উপর আক্রমণের কাহিনী তাঁর জানতে বাকি নেই। আততায়ীদের চেহারার বর্ণনাও তিনি খবরের কাগজে পাঠ করছেন। তিন জনের মধ্যে দুইজনের চেহারা সেই বর্ণনার সঙ্গে অবিকল মিলে যায়।

কোন রকমে বুকের কাঁপুনি থামিয়ে শান্ত ভাবেই তিনি বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনই সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

ঘরের ভিতরে ফিরে এসেই তিনি ধারণ করলেন টেলিফোন যন্ত্র। তারপরেই থানার লোক পেলে তাঁর বিপদের খবর।

তারপর কাটল এক মিনিট···দু' মিনিট···তিন মিনিট। প্রত্যেকটা মিনিট কি সুদীর্ঘ। প্রত্যেক মিনিটেই ডাক্তারের ভয় হয় এই বুঝি ডাকাতের দল হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে রিভলবার হাতে করে তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চার মিনিট—পাঁচ মিনিট।

অবশেষে ঘরের বাইরে শোনা গেল কাদের কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর। ডাক্তার বাইরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে দুইজন পুলিশ কর্মচারী।

পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানা গেল তিনজন সন্দেহজনক আগন্তুকের মধ্যে দুইজন হচ্ছে সহোদর—নাম ওয়াল্টার ও ডানিয়েল গ্রেনম। তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে তাদের শ্যালক—নাম ওয়াল্টার স্যামসন।

গোয়েন্দারা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এখানে কি করতে এসেছ?

—স্যাম্‌সনের ঠাণ্ডা লেগেছে। আমরা ওষুধ নিতে এসেছি।

গোয়েন্দারা বললেন, স্যামসনের ঠাণ্ডা লাগার কোন লক্ষণই তো দেখতে পাচ্ছি না!

স্যামসন বললে, ঠাণ্ডা লেগেছে আমার বুকের ভেতরে। আপনারা তা যদি দেখতে না পান সে জন্যে আমি দায়ী নই।

—বেশ, থানায় চল।

যে তিনজন ডাক্তার অক্রান্ত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু'জনের পাত্তা পাওয়া গেল। ডাক্তার বক্ কিছুক্ষণ লোক তিনজনের দিকে তাকিয়ে ওয়াল্টার গ্রেননকে সনাক্ত করলেন। এবং ওয়াল্টার স্যাম্‌সন সম্বন্ধে বললেন, ওকেও দ্বিতীয় ব্যক্তির মত দেখতে বটে, কিন্তু আমি হলফ করে কিছু বলতে পারব না।

ডাক্তার রোজেনবার্গও ওয়াল্টার গ্রেননকে সনাক্ত করলেন; এবং ডানিয়েল গ্রেনন সম্বন্ধে বললেন, ওর সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তির মিল আছে বলেই মনে হচ্ছে।

তিনজন আসামীই প্রবল প্রতিবাদ করে জানালে তারা সম্পূর্ণরূপেই নিরপরাধ এবং ও দুইজন ডাক্তারকে তারা জীবনে কখনো চোখেও দেখিনি।

তাদের উপরে বিনা জামিনে হাজতবাসের হুকুম হ'ল।

পাঁচ

ফিলাডেলফিয়ার ওয়াল্টার গ্রেনন ক্রমাগত প্রতিবাদ করছে— আমি নিরাপরাধ। ডাক্তারদের আমি আক্রমণ করিনি।

ক্যামডেনের অ্যান্ডি ক্লিংয়ের মুখেও ঐ একই কথা: আমি নিরপরাধ। মিঃ ব্রাউনের উপরে আমি হানা দিইনি।

অথচ আক্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের দু'জনকেই নিশ্চিতরূপে সনাক্ত করতে পেরেছেন।

এদিকে রাত আটটার চোরের দল নিজেদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে পরিপূর্ণ উৎসাহে।

অবশেষে ক্যামডেনের মিসেস ক্যাথারাইন অ্যান্টনের কাছ থেকে টেলিফোনে থানায় খবর এল, তাঁর প্রতিবেশী এক শিশুপুত্র একটি বাক্স কুড়িয়ে পেয়েছে, তার মধ্যে আছে বন্দুক, জড়োয়া গয়না, ঘড়ি ও আরো হরেক রকম দামী জিনিস।

কনলি তখনই যথাস্থানে গিয়ে হাজির হতে দেরি করলেন না। শিশুর নাম ফ্রেডি টম, বয়স সাত বৎসর। সে একটা নয়, পেয়েছে তিন তিনটে বাক্স।

একটা বাক্স খুলে দেখা গেল, তার ভিতরে রয়েছে অনেক ঘড়ি, ফাউন্টেন পেন, রূপোর বাসন, আংটি, হীরকখচিত সোনার গহনা, একটা রিভলবার ও কতকগুলো কার্তুজ—

কনলির বুকের ভিতর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল রক্তস্রোত! বিপুল আগ্রহে অন্য দুটোও তিনি খুলে ফেললেন তাড়াতাড়ি। সে দু'টো বাক্সও ঐ রকম দামী জিনিসে ঠাসা।

এ যে রাজার ঐশ্বর্য!

দু' একখানা গয়না পরীক্ষা করেই বোঝা গেল, সেগুলো হয়েছিল রাত আটটার চোরের দলের করতলগত।

এ যে স্বপ্নাতীত সৌভাগ্য।

শিশুর দিকে ফিরে কনলি শুধোলেন, খোকাবাবু, এগুলো তুমি কোথায় পেয়েছ?

—নদীর ধারে। খুব ভোরবেলায় খেলা ক'রতে গিয়েছিলুম। সেইখানে ছুটোছুটি খেলা করতে করতে আমি আর একটু হ'লেই বাক্সগুলোর উপরে হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গিয়েছিলুম আর কি।

—তুমি বাক্সগুলো খুলে দেখেছিলে?

—তা আবার দেখিনি? আমি ভেবেছিলুম এগুলো হচ্ছে বোম্বেটেদের গুপ্তধন।

—তারপরই তুমি সোজা বাড়ীতে ফিরে এলে বুঝি?

—উহুঁ। আমার যে সব বন্ধু বাক্সগুলোকে বাড়ীতে তুলে আনবার জন্যে সাহায্য করেছিল, বাক্সের কিছু কিছু জিনিস নিয়ে আগে তাদের কিছু উপহার দিয়েছিলুম।

—কি কি জিনিস বাছা?

—অত কি ছাই মনে আছে? যে যা চাইলে, তাই?

ফ্রেডি টমের মায়ের দিকে ফিরে কনলি বললেন, আপনি পেয়েছেন এক আশ্চর্য সৎপুত্র। বেশীর ভাগ ছেলেই এ-রকম কিছু পেলে আর কারুর কাছে সে কথা প্রকাশ ক'রত না।

থানায় যখন বাক্স তিনটে নিয়ে আসা হ'ল সবাই তখন চরম বিস্ময়ে একবারে হতবাক্।

মর্গ্যান বললেন, এত ঐশ্বর্য্য নদীর ধারে পরিত্যক্ত হ'ল কেন? যে এমন কাণ্ড করেছে তাকে আমরা খুঁজে বার করব যে কোন উপায়ে।

কনলি বললেন, আমিও ও-কথা ভেবে দেখেছি। আমার কি সন্দেহ হয় জানো? ক্লিং ধরা পড়াতে তার জুড়িদার ভয় পেয়ে এই কার্য্য করেছে।

জিনিসগুলো ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক নতুন কোন সূত্র পাওয়া যায় কি না।

রাত আটটার চোরের দল যেখান থেকে যে-সব জিনিস চুরি ক'রেছিল, পুলিশের কাছেই ছিল তার সুদীর্ঘ তালিকা।

পরীক্ষা-কার্য যখন চলছে, সেই সময় মর্গ্যান বাক্স হাতড়ে বার করলেন একটা নকল চামড়ার ব্যাগ। একখান 'ট্রলি'-হস্তান্তরপত্র ছাড়া তার ভিতরে আর কিছুই ছিল না।

মর্গ্যান বললেন, এই ব্যাগের উপরে সম্ভবত কারুর নামের দু'টো আদ্য অক্ষর লেখা আছে—ডি, টি। এ-রকম ব্যাগ তো ছোক্‌রারাই ব্যবহার করে। এর মানে কি?

—হ্যাঁ, এ ছোকরাদের উপযোগী বটে।

—এমন এক ছোকরা, যার নামের দুটো আদ্য অক্ষর হচ্ছে ডি, টি, যদিও তা হয়তো সম্ভবপর নয়, তবু একটা কথা আমার মনে হচ্ছে।

—কি কথা?

একটু আগেই গ্রসেষ্টারের থানা থেকে ফোন এসেছিল, ডেভিড টিঙ্গো নামে এক ছোকরার খবরাখবর নেবার জন্যে। সে-ও না কি তার একটা চামড়ার ব্যাগ হারিয়ে ফেলেছে। ডি, টি. তো ডেভিড টিঙ্গোরও নামের আদ্য অক্ষর হতে পারে।

কনলি তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হয়ে বললেন, চলো সেখানেই যাই।

তার আধ ঘণ্টা পরেই গ্লাসষ্টারের থানায় গিয়ে মর্গ্যান ও কনলির সঙ্গে ডেভিড টিঙ্গোর যে-সব কথাবার্তা হল, আমরা তা বর্ণনা করেছি এই আখ্যায়িকার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই।

তবু এখানে একটু খেই ধরিয়ে দেওয়া দরকার।

টিঙ্গো স্বীকার করলে ব্যাগটা তারই। তিনদিন আগে হারিয়ে গিয়েছিল।

গোয়েন্দারা তাকে সেই ব্যাগের ভিতরে 'ট্রলি'-হস্তান্তরপত্রখানাও দেখালেন। প্রথমটা সেখানাও সে নিজের ব'লে মেনে নিলে। কিন্তু পর-মুহূর্তেই রক্তহীন হয়ে গেল তার মুখ। সে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, না—না, ওখানা আমার নয়। আমি কি বলতে কি ব'লে ফেলেছি! আপনারা আমার মাথা গুলিয়ে দিয়েছেন।

হস্তান্তর-পত্রের উপরে ছিল গতকল্যকার তারিখ। অথচ টিঙ্গো বলে তার ব্যাগ খোয়া গেছে তিনদিন আগে। তাঁর মানে, গতকল্যও এই ব্যাগটি ছিল তার কাছেই।

কেন সে এই মিথ্যে কথাটা বললে? পুলিশের সন্দেহ হল তখন।

ডেভিড টিঙ্গো নিয়ে গোয়েন্দারা গেলেন তার বাড়ীতে। তার বাবা তখন কর্মস্থলে গিয়েছেন। বাড়ীতে ছিলেন কেবল তার মা।

তাদের বাসা খানাতল্লাস করে সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেল না, কেবল একটা রিভলভার ছাড়া। সেটা বেলজিয়ামে প্রস্তুত এবং লুকানো ছিল ডেভিড টিঙ্গোর শোবার ঘরের বিছানার তলায়।

তাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, রিভলবারটা কোথা থেকে সে পেয়েছে? সে বেশ সপ্রতিভভাবেই বললে, রাস্তায় একখানা আরোহীহীন মোটর গাড়ী দাঁড় করানো ছিল, ওটা পড়েছিল তারই পিছনের আসনে। ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে একটা রিভলভার পাবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। তাই লোভ সামলাতে পারলুম না। রিভলভারটা চুপি চুপি তুলে নিয়ে স'রে পড়লুম। তার আগে জীবনে আর কোনদিন আমি চুরি করিনি।

তার কাছ থেকে কোন তথ্য উদ্ধার করা গেল না।

রাত আটটার চোরের দল এ পর্যন্ত যাদের বাড়ীর উপরে হানা

দিয়েছিল তাঁদের প্রত্যেককেই থানায় আহ্বান করা হ'ল, তিনটে বাক্সে পাওয়া চোরাই মালগুলো সনাক্ত করবার জন্যে।

সেই বেলজিয়ামে প্রস্তুত রিভলভারটা দেখেই জনৈক মহিলা বললেন, ওটা আমাদের সম্পত্তি। চোরেরা আমাদের বাড়ী থেকে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু রিভলভারের 'ক্লিপ'টা তাড়াতাড়িতে বা ভুল ক'রে নিয়ে যেতে পারেনি, এখনো আমাদের বাড়ীতেই পড়ে আছে।

তৎক্ষণাৎ 'ক্লিপ'টা আনিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল, রিভলভারের সঙ্গে তা খাপ খেয়ে যায় যথাযথ ভাবেই।

কনলি বললেন, 'টিঙ্গো' রিভলভারটা তা'হলে তুমি কোন মোটরগাড়ী থেকে চুরি করোনি। তুমি যে রাত আটটার চোরেদেরই একজন, এইবার তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। তুমি কি এখনো মিথ্যা কথা বলতে চাও?

না, ডেভিড টিঙ্গো আর মিথ্যা কথা বলতে চায় না। কিন্তু সে যে সব আজব কথা বললে, তা শ্রবণ ক'রে গোয়েন্দাদের চিত্ত একেবারে চমকৃত হয়ে গেল।

রাত আটাটার চুরিতে তার জুড়িদার ছিল না আর্থি ক্লিং।

টিঙ্গোর একমাত্র জুড়িদার হচ্ছে তার পিতা স্বয়ং।

সে বললে, বাবা রোজ রাত্রে চুরি করবার জন্যে আমাকে জোর করে সঙ্গে নিয়ে যেতেন, আমাকে তার সঙ্গী হতে হ'ত ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাই রাত্রে রাস্তায় মোটরে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলুম।

সেই রাত্রেই ডেভিড টিঙ্গোর বাবা ধরা পড়ল। তার নাম বেঞ্জামিন টিঙ্গো। ধরা পড়েই সে অপরাধ স্বীকার করতে একটুও ইতস্তত করলে না। সে এক অদ্ভুত চরিত্রের লোক—সত্যিকারের

ডাঃ জেকিল ও মিঃ হাইড। দিনের বেলায় ভালো চাকরি করে, মাহিনা পায় হপ্তায় পাঁচশো টাকা। সকলেই তাকে অত্যন্ত সাধু, ভদ্র, নম্র প্রকৃতির মানুষ বলে জানে। সে যার-পর-নাই ধর্মভীরু, নিজের বাড়ীতে প্রত্যেক ঘরে রাখে একখানা করে বাইবেল।

সে নিজের বাড়ীর গুপ্তস্থান থেকে আরও চল্লিশ হাজার টাকার চোরাই মাল বার করে দিয়ে বললে, পুলিশ চারিদিকে ধর-পাকড় করছে বলে ভয় পেয়ে আমি তিন বাক্স চোরাই মাল নদীর ধারে ফেলে দিয়েছিলুম। সেই সঙ্গে ভ্রমক্রমে গিয়েছিল আমার ছেলের চামড়ার ব্যাগটাও।

কিন্তু এখনো গোয়েন্দাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে নতুন নতুন বিস্ময়!

বেঞ্জামিন টিঙ্গো নিজেই বললো, ফিলাডেলফিয়ার ডাক্তারদের উপর হানা দিয়েছিলুম আমরাই।

ডেভিড টিঙ্গো বললে, অ্যাণ্ডি ক্লিংকে বিনা দোষে ধরা হয়েছে। বুড়ো জর্জ ব্রাউনকে রিভলভারের দ্বারা আঘাত করেছিলুম আমিই। তাদের কথা যে মিথ্যা নয়, সে প্রমাণ পেতে বিলম্ব হ'ল না। নির্দোষ ব্যক্তিরা মুক্তিলাভ ক'রল। আসামীরা গেল কারাগারে।

আর সেই ছোট্ট জর্জ ফ্রেডি টম—যে আবিষ্কার করেছিল চোরাই মালের বাক্স তিনটে, সে উপহার লাভ করলে একখানি বাইসাইকেল।

এখানে যে ডিটেক্‌টিভ কাহিনীটি দেওয়া হ'ল, এটি গল্প নয়—একেবারে সত্য ঘটনা। ঘটনাক্ষেত্র হচ্ছে আমেরিকা। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

একখানা উল্টে-পড়া চেয়ার

সদাশিব মুখোপাধ্যায়। যখন জয়ন্ত ও মাণিককে গোয়েন্দা ব'লে কেউ জানত না, তিনি তখন থেকেই বন্ধু।

জমিদার মানুষ। বাস করেন শিবপুরের গঙ্গার ধারে মস্ত এক বাড়িতে। জয়ন্ত ও মাণিক আজ তাঁর কাছে এসেছে সান্ধ্য ভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রতে।

তখন সন্ধ্যার শাঁখ বাজেনি। সদাশিববাবুর সাজানো-গুছানো লম্বা চওড়া বৈঠকখানায় ব'সে জয়ন্ত ও মাণিক গল্প করছে সকলের সঙ্গে। সকলে মানে, সদাশিববাবু ও তাঁর কয়েকজন প্রতিবেশী বন্ধু। তাঁরা আকৃষ্ট হয়েছেন ভুঁড়ি-ভোজনের লোভে নয়, জয়ন্তের নাম শুনেই। জয়ন্তের মুখে তার কোন কোন মামলার কথা শুনবেন, এই তাঁদের আগ্রহ।

কিন্তু জয়ন্তর আগ্রহ জাগ্রত হচ্ছে না নিজের মুখে নিজের কথা ব্যক্ত করবার জন্যে।

ভদ্রলোকেরা তবু নাছোড়বান্দা। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কৌতুহলী হচ্ছেন আবার তিনকড়িবাবু, তিনি সদাশিববাবুর বাড়ীর খুব কাছেই থাকেন। আগে কোন সরকারী অফিসের কর্মচারী ছিলেন, এখন কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। বয়সে ষাট পার হয়েছেন। বিপত্নীক ও নিঃসন্তান।

অবশেষে অনুরোধে উপরোধে ঠেলায় প'ড়ে জয়ন্ত বলতে বাধ্য হল: আচ্ছা, তাহলে এমন কোন কোন মামলার কথা বলতে পারি, আমি যেগুলো হাতে নিয়ে ব্যর্থ হয়েছি।

তিনকড়িবাবু বললেন, না, না, তাও কি হয়! আমরা আপনাদের সফলতার ইতিহাসই শুনতে চাই। ব্যর্থ মামলা তো অসমাপ্ত গল্প।

জয়ন্ত শেষে নাচার হয়ে বললে, মাণিক, আমাকে রক্ষা কর

ভাই! আমি নিজের গুণকীর্ত্তন করতে পারব না কিছুতেই। তুমিই না হয় ওঁদের দু-একটা মামলার কথা শোনাও।

তাই হ'ল। জয়ন্তের কাহিনী নিয়ে মানিক ঘণ্টা দুই সকলকে মাতিয়ে রাখলে।

তারপর সদাশিববাবু ঘোষণা করলেন, আর নয়, এইবার খাবার সময় হয়েছে।

আসর ভাঙল।

কিন্তু খেতে বসতে না বসতেই আকাশ বলে ভেঙে পড়ি! বজ্রের হুঙ্কার, ঝড়ের চীৎকার, গঙ্গার-হাহাকার! বিদ্যুতের পর বিদ্যুতের অগ্নিবাণের আঘাতে কালো আকাশ যেন খান্‌খান্‌ হয়ে গেল। তারপর ঝড় কাবু হতে না হতেই সুরু হল বৃষ্টির পালা। আর সে কি যেসে বৃষ্টি! দেখতে দেখতে মাটির বুক হয়ে গেল জলে জলে জলময়।

সদাশিববাবু বললেন, জয়ন্ত, মাণিক! আজ আর বাড়ী যাবার নাম মুখে এনো না। বাড়ীতে 'ফোন' করে দাও, আজ এখানেই তোমরা রাত্রিবাস করবে।

দুই

সকালে সদাশিববাবু, বললেন, যাবার আগে চা পান ক'রে যাও।

মাণিক বললে, সাধুপ্রস্তাব।

অনতিবিলম্বে চায়ের সঙ্গে এল আরো কিছু। এবং চায়ের পেয়ালায় দু-একটা চুমুক দিতে না দিতেই হন্তদন্তের মত ছুটে এসে তিনকড়িবাবু বললেন, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে!

সদাশিববাবু বললে, ব্যাপার কি তিনকড়িবাবু?

—চোরে আমার বিশ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে।

জয়ন্ত বললে, থানায় খবর পাঠিয়েছেন।

—পাঠিয়েছি। পুলিস এখনো আসেনি। কিন্তু পুলিস আসবার আগে আপনাকে আমি চাই।

জয়ন্ত সবিস্ময়ে বললে, আমাকে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। পুলিসের চেয়ে আপনার উপরেই আমার বেশী বিশ্বাস।

—আমাকে মাপ করবেন। এ-সব সাধারণ চুরির মামলা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। পুলিস অনায়াসেই এ রকম মামলার কিনারা করতে পারবে।

তিনকড়ি করুণস্বরে বললেন, সদাশিববাবু, আমার মতন লোকের কাছে এ চুরি সাধারণ চুরি নয়। ঐ বিশ হাজার টাকার দাম আমার কাছে কত, আপনি তা জানেন? আপনি যদি দয়া করে আমার জন্যে জয়ন্তবাবুকে একটু অনুরোধ করেন—

সদাশিববাবু বললেন, বেশ, তা করছি। জয়ন্ত, আমারও ইচ্ছা—

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, আর বলতে হবে না, তোমার ইচ্ছা কি বুঝেছি। কিন্তু নিমন্ত্রণ খেতে এসে চুরির মামলা নিয়ে জড়িয়ে পড়বার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই। বড় জোর তিনকড়িবাবুর মুখে চুরির বিবরণ শুনে ঘটনাস্থলে একবার চোখ বুলিয়ে আসতে পারি। তার বেশী আর কিছু পারব না!

তিনকড়ি আশান্বিত হয়ে বললে, আমার পক্ষে তাই হবে যথেষ্ট।

তিন

জয়ন্ত শুধোলে, আপনার টাকাগুলো কোথায় ছিল ?

—একতলায়, আমার পড়বার ঘরে বইয়ের আলমারির ভিতরে।

—বলেন কি, অত টাকা রেখে দিয়েছিলেন বইয়ের আলমারির ভিতরে !

—দোতলার ঘরে আমার লোহার সিন্দুক আছে বটে কিন্তু বছর চারেক আগে আর একবার চোর এসে সিন্দুক থেকে তিন হাজার টাকা নিয়ে গিয়েছিল, তাই তার ভিতরে আর দামী কিছু রাখতে ভরসা হয় না।

—টাকাগুলো ব্যাঙ্কে জমা রাখেন নি কেন ?

—তাই তো রেখেছিলুম জয়ন্তবাবু। কিন্তু গেল বছরে ভিতরে ভিতরে খবর পাই, আমার ব্যাঙ্ক লাল বাতি জ্বালবার আয়োজন করছে। তাড়াতাড়ি টাকা তুলে আনলুম আর তারই দিন ছয়েক পরেই ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ করলে, অনেক হতভাগ্যের সর্বনাশ হ'ল। ব্যাপার দেখে আমি এমন 'নার্ভাস', হয়ে গেলুম যে, টাকাগুলো আর কোন ব্যাঙ্কেই জমা রাখতে পারলুম না।

—আপনার বাড়ীতেই যে অত টাকা আছে, এ খবর আর কেউ জানত ?

—আমি তো জন-প্রাণীর কাছে ও টাকার কথা বলি নি।

—কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে যে আপনি টাকা তুলে এনেছেন এটা তো অনেকেই জানে।

—তা জানে বটে।

—আর নতুন কোন ব্যাঙ্কে আপনি টাকা জমা রাখেন নি এ খবরটাও তো কেউ কেউ রাখতে পারে ?

—তাও পারে বটে। কিন্তু চোর কেমন ক'রে জানবে যে এত

জায়গা থাকতে আমি বইয়ের আলমারির ভিতরের টাকা লুকিয়ে রেখেছি ?

—তিনকড়িবাবু, এ চোর হচ্ছে সন্ধানী। সে কেমন করে আপনার পড়বার ঘরে ঢুকেছে।

—সেটা খালি আমার পড়বার ঘর নয়, আমার বৈঠকখানাও। তার দক্ষিণ দিকে হাত-আষ্টেক চওড়া আর বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটুখানি জমি আছে, তার পরেই সরকারী রাস্তা। চোর সেই বেড়া টপকে এসেছে। প্রথমে খড়খরির পাখী তুলে ফাঁক দিয়ে আঙুল গলিয়ে জানলা খুলেছে। তারপর কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র বা বাটালি দিয়ে একটা গরাদের গোড়ার দিককার কাঠ খানিকটা কেটে ফেলে গরাদটা সরিয়ে ফেলেছে। তারপর ঘরে ঢুকে নিজের চাবি দিয়ে আলমারি খুলে টাকা নিয়ে স'রে পড়েছে। কিন্তু এখনো আমি এই ভেবেই আশ্চর্য্য হচ্ছি যে টাকা সে আবিষ্কার করলে কেমন করে ?

—কেন ?

—টাকাগুলো আমি সাধারণভাবে লুকিয়ে রাখি নি। দপ্তরীকে ফরমাজ দিয়ে আমি ঠিক কেতাবের মত দেখতে একটি বাক্স তৈরী করিয়ে ছিলুম আর তারই ভিতরে রেখেছিলুম বিশ খানা হাজার টাকার নোট। আলমারির বাইরে থেকে দেখলে বাক্সটাকে সোনার জলে নাম লেখা একখানা সাধারণ বই ছাড়া আর কিছুই মনে করবার উপায় ছিল না।

—পড়বার ঘরই আপনার বৈঠকখানা ? সেখানে তাস-দাবা-পাশার আসরও ব'সত ?

—তা ব'সত বৈকি, রোজ নয়—শনি-রবিবারে আর ছুটির দিনে।

—সে আসরে নিয়মিতভাবে অনেকেই আসতেন ?

—আমার বন্ধুর সংখ্যা বেশী নয় জয়ন্তবাবু। নিয়মিতভাবে আমাদের বৈঠকে যে ছয় সাত জন লোক আসেন, চুরির খবর পেয়ে তাঁরা সকলেই আমার বাড়ীতে ছুটে এসেছেন, আপনি সেখানে গেলেই তাঁদের দেখতে পাবেন।

—বেশ, তবে তাই হোক। পুলিসের আগেই আমি ঘটনাস্থলে হাজির হ'তে চাই।

চার

একখানা ছোটখাটো দোতলা বাড়ী। সামনে অপেক্ষা করছে জনকয়েক কৌতূহলী লোক, জয়ন্ত ও মাণিক তাদের মধ্যে কারুকে কারুকে গতকল্য সন্ধ্যায় দেখেছিল সদাশিববাবুর বাড়িতেও।

তিনকড়ি বাড়ীর ভিতরে ঢুকে তাঁর পাঠগৃহের দরজার তালা খুলে ফেললেন।

জয়ন্ত গলা তুলে সকলকে শুনিয়ে বলল, তিনকড়িবাবু, বাইরে এঁদের এইখানেই অপেক্ষা করতে বলুন। আগে আমরা ঘরের ভিতরটা পরীক্ষা ক'রে দেখি, তারপর অন্য কথা।

মাঝারী আকারের ঘর। মাঝখানে একখানা গালিচা-বিছানা তক্তাপোষ। একদিকে একটি ছোট টেবিল ও দুখানা চেয়ার। আর একদিকে বই-ভরা দুটো আলমারি এবং আর একদিকেও পুস্তক-পূর্ণ সেল্‌ফ। একটি আলমারির সামনে মেঝের উপরে উল্টে পড়ে রয়েছে একখানা চেয়ার। ঘরের এখানে-ওখানে যেখানে-সেখানেও ছড়ানো রয়েছে নানা আকারের কেতাব ও মাসিকপত্র প্রভৃতি। দেখলেই বোঝা যায় যে তিনকড়িবাবু হচ্ছেন দস্তুরমত 'গ্রন্থকীট'।

জয়ন্ত মিনিট-দুয়েক ধ'রে নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করতে লাগল। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, তিনকড়িবাবু, টাকা চুরি গিয়েছে কোন আলমারির ভিতর থেকে ?

তিনকড়ি অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলেন।

—ওর সামনে একখানা চেয়ার উল্টে রয়েছে কেন ?

—জানিনা। তবে ওটা হচ্ছে চোরেরই কীর্তি। কারণ কাল রাত্রে আমি যখন এ ঘরের দরজা বন্ধ করে যাই, চেয়ারখানা তখন চার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েই ছিল।

—আপনি কাল যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যান চেয়ারখানা তখন কোথায় ছিল ?

—ওদিককার সামনে।

—তা হলে চোরই চেয়ারখানা আলমারির সামনে টেনে এনেছে ?

—তা ছাড়া আর কি ?

জয়ন্ত পকেট থেকে রূপোর ছোট্ট ডিপে বার করে নস্য নিতে নিতে (এটা হচ্ছে তার আনন্দের লক্ষণ—নিশ্চয় সে কোন উল্লেখ-যোগ্য সূত্র আবিষ্কার করেছে) বললে, বটে, বটে, বটে! আপনার সেই জাল-কেতাবে পুরে আসল নোটগুলো আলমারির কোন তাকে রেখেছিলেন ?

তিনকড়ি থতমত খেয়ে বললেন, জাল-কেতাব ?

—হ্যাঁ, জাল-কেতাব। অর্থাৎ যা কেতাবের মত দেখতে, কিন্তু কেতাব নয়।

—ও, বুঝেছি। সেই কেতাব-বাক্সটা ছিল আলমারির সব-উপর তাকে।

—'যা ভেবেছি তাই' বলতে বলতে জয়ন্ত আলমারির কাছে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর আলমারিটা পরীক্ষা করতে করতে

আবার বললে, আলমারির কলে যে চাবিটা লাগানো রয়েছে সেটা কি আপনার?

তিনকড়ি বললেন, আজ্ঞে না। ওটা নিশ্চয়ই চোরের সম্পত্তি।

—তাহলে এ চোর পেশাদার চোর নয়।

—কি ক'রে বুঝলেন?

—পেশাদার চোরের কাছে প্রায়ই চাবির গোছা থাকে, এ-রকম একটিমাত্র চাবি থাকে না। এখানে চোর এসেছিল একটি মাত্র চাবি নিয়ে। তার মানে সে জানত, এই একটিমাত্র চাবি দিয়েই সে কেল্লা ফতে করতে পারবে। যদি বলেন, সে এতটা নিশ্চিত হয়েছিল কেন? তবে তার উত্তর হচ্ছে, সে আগে থাকতেই যে কোন সুযোগে এই আলমারির কলে একটা মোমের বা অন্য কিছু ছাঁচ তুলে নিয়ে বিশেষ একটি চাবি গড়ে তবে এখানে এসেছিল। চুরি তার ব্যবসা নয়, এ চাবি পরে তার কোন কাজে লাগবে না, তাই চাবিটাকে সে এখানে পরিত্যাগ করেই প্রস্থান করেছে। তিনকড়িবাবু, দেখছি ঐ জানালাটার একটা গরাদ নেই। চোর কি ঐখান দিয়েই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

জয়ন্ত জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর জানালাটা ভালো করে পরীক্ষা করে ফাঁক দিয়ে গলে বাইরে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল।

মাটির উপর কিছুক্ষণ হুমড়ি খেয়ে বসে কি পর্য্যবেক্ষণ করলে। তারপর উঠে বললে, মানিক, কাল রাত্রে কখন বৃষ্টি থেমেছিল, তুমি তা জানো তো?

মাণিক বললে, হ্যাঁ, আমি তখনও জেগেছিলুম। বৃষ্টি থেমেছিল রাত দুটোর সময়ে।

—তাহলে এখানে চোরের আবির্ভাব হয়েছে রাত দুটোর পর।

সদাশিব শুধোলেন, একথা কেমন করে জানলে ?

জয়ন্ত বললে, খুব সহজেই। ভিজে মাটির উপরে রয়েছে কয়েকটা স্পষ্ট পায়ের দাগ। নিশ্চয়ই চোরের পদচিহ্ন। কালকের প্রবল বৃষ্টিপাতের ভিতরে চোর এখানে এলে সব পায়ের দাগ ধুয়ে-মুছে যেত। হ্যাঁ, পায়ের দাগেও বেশ বিশেষত্ব ?

তিনকড়ি সাগ্রহে বললেন, কি বিশেষত্ব আছে ?

—যথাসময়ে প্রকাশ্য, বলতে বলতে জয়ন্ত আবার জানালার ফাঁক দিয়ে গলে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল। তারপর নিম্নস্বরে আবার বললে, তিনকড়িবাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসার আছে।

—আজ্ঞা করুন।

—আপনি কি আলমারির ভিতর থেকে জাল কেতাবখানা মাঝে মাঝে বার করতেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, করতুম। দেখতুম নোটগুলো যথাস্থানে আছে কিনা।

—তখন নিশ্চয়ই ঘরের ভিতরে আপনি একলা থাকতেন।

—সে কথা জিজ্ঞাসা করাই বাহুল্য।

জানালার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত নিজের মনে কি ভাবতে লাগল কিছুক্ষণ। তারপর শুধোল, রাস্তার ওপারে ঐ সেগুনে রঙের বাড়ী রয়েছে, ওখানা কার বাড়ী ?

—যদুবাবুর। আমার এক বিশেষ বন্ধু।

—তার পাশের ঐ হলদে বাড়ীখানা ?

—মাধববাবুর। ইনিও আমার বিশেষ বন্ধু।

—আচ্ছা, অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছি, একটি ছোটখাটো ভদ্রলোক বারবার দরজার ওপাশ থেকে উঁকিঝুঁকি মারছেন, উনি কে ?

তিনকড়ি বললেন, আমিও দেখেছি, ওঁরই নাম যদুবাবু।

যদুবাবুও জয়ন্তের প্রশ্ন শুনতে পেলেন। দরজার সামনে এসে তিনি বললেন, জয়ন্তবাবু, ক্ষমা করবেন। আমি আমার কৌতূহল সংবরণ করতে পারছিলুম না। কে না জানে আপনি হচ্ছেন এক আশ্চর্য যাদুকর-গোয়েন্দা। আজ এখানে এসে আবার কি যাদু সৃষ্টি করেন তাই দেখবার জন্যে আমার আগ্রহের আর সীমা নেই।

জয়ন্ত সহাস্যে বলল, ব্যাপারটা এতই স্পষ্ট যে, কোন যাদু সৃষ্টি করবার দরকার নেই। আমার যা জানবার তা জেনেছি। এখন আপনারা সকলেই ঘরের ভিতরে আসতে পারেন।

—তাই নাকি! তাই নাকি! বলতে বলতে ও হাসতে হাসতে সর্বপ্রথমেই ঘরের ভিতরে পদার্পণ করলেন যদুবাবু। ছোট্টখাটো বললেই তাঁর চেহারার বর্ণনা করা হয় না, ভগবানের দয়ায় তিনি বামন হ'তে হ'তে বেঁচে গিয়েছেন—কারণ তাঁর দেহের দৈর্ঘ্য সাড়ে চার ফুটের চেয়ে বেশী নয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সেই অনুসারেই মানানসই—যদিও তার দেহখানি ছোটর ভিতরেই দিব্যিই নাদুস-নুদুস।

যদুবাবুর পর দেখা দিলেন মাধববাবু, দস্তুরমত দশাসই চেহারা, —উচ্চতাতেও ছয় ফুটের কম হবে না! এলেন আরো জনচারেক ভদ্রলোক।

তিনকড়ি একে একে সকলের সঙ্গে জয়ন্তের আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, আমার তাস-দাবা খেলার সাথী হচ্ছেন এরাই।

জয়ন্ত মুখে কিছু বললে না, কেবল একবার করে চোখ বুলিয়ে প্রত্যেকের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিলে।

মাধববাবু বললেন, বলেন কি জয়ন্তবাবু, ব্যাপারটা এখনি আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! খুব স্পষ্ট।

—কিন্তু আমরা তো স্পষ্ট কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

—এখানে কাল রাত্রে চুরি হয়ে গিয়েছে।

—তাই তো শুনছি।

—চোর ঐ গরাদ খুলে এই ঘরে ঢুকেছে।

—তাই তো দেখছি!

—তাহলে ব্যাপারটা কি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না?

—উঁহু! চোর কে?

—সেটা পুলিশ এসে আবিষ্কার করবে। আমি এখানে চোর ধরতে আসি নি, আপনাদের মত মজা দেখতে এসেছি।

যদুবাবু আপত্তি ক'রে বললেন, আমরা এখানে মজা দেখতে আসিনি, বন্ধুর দুঃখে সহানুভূতি জানাতে এসেছি।

মাধববাবু বললেন, আমরা ভেবেছিলুম, আপনি যখন এসেছেন, চোর ধরা পড়তে দেরি লাগবে না।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, পুলিশ যদি চোরকে ধরতে পারে তাহলে দেখবেন, চোর আপনার মত মাথায় ছ'ফুট উঁচু নয়।

মাধববাবু সবিস্ময়ে বললেন, বলেন কি? কেমন করে জানলেন?

—সে কথা বলবার আর সময় হবে না। ঐ পুলিশ এসে পড়েছে।

পাঁচ

ইন্‌স্পেক্টর হরিহরবাবু একজন সহকারীকে নিয়ে গট্ গট্ করে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। বয়সে প্রৌঢ়, মোটাসোটা দেহ, মুখে উদ্ধত ভাব।

রুক্ষ স্বরে তিনি বললেন, ঘরে এত ভিড় কেন? বাড়ীর কর্তা কে?

তিনকড়ি এগিয়ে এসে বললেন, আজ্ঞে, আমি।

—আপনারই টাকা চুরি গিয়েছে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ওঁরা কে ?

—এঁরা আমার বন্ধু। আর উনি হচ্ছেন বিখ্যাত সৌখীন গোয়েন্দা জয়ন্তবাবু।

কৌতূহলী চোখে হরিহর একবার জয়ন্তের মুখের পানে তাকালেন, তারপর বললেন, শুনেছি ইন্‌স্পেক্টর সুন্দরবাবুকে মাঝে মাঝে আপনি কোন কোন মামলায় সাহায্য করেন।

জয়ন্ত বিনীতভাবে বললে, আজ্ঞে, ঠিক সাহায্য করি বলতে পারি না, তবে সাহায্য করার চেষ্টা করি বটে।

মুখ টিপে হেসে হরিহর বললেন, এখানেও কি সেই চেষ্টা করতে এসেছেন ?

—আজ্ঞে না। মশায়ের চেহারা দেখেই বুঝেছি, আপনার কাছে আমার চেষ্টা নগণ্য।

—ঠিক। সুন্দরবাবুর সঙ্গে আমার মত মেলে না। আমার মত হচ্ছে, সখের গোয়েন্দার কাছে পেশাদার গোয়েন্দার শেখবার কিছুই নেই।

জয়ন্ত বললে, আপনার মত অভ্রান্ত। আমিও ঐ মত মানি।

হরিহর বললেন, এইবার মামলার বৃত্তান্তটা আমি শুনতে চাই।

তিনকড়ি আবার সব কথা বলে গেলেন একে একে।

হরিহর সব শুনে বললেন, যে লোক এই বাজারে বিশ হাজার টাকা রাখে বৈঠকখানার কেতাবের আলমারিতে, তাকেই আমি অপরাধী বলে মনে করি। এ হচ্ছে চোরকে নিমন্ত্রণ করা আর খামকা পুলিসের কাজ বাড়ানো।

তিনকড়ি চুপ করে রইলেন কাঁচু-মাচু মুখে।

জয়ন্ত বললে, টাকা ছিল ঐ আলমারির ভিতরে।

হরিহর বললেন, টাকা যখন লোপাট হয়েছে, তখন আলমারিটা হাতড়ে আর কোন লাভ হবে না।

—ঐ যে চেয়ারখানা আলমারির সামনে উল্টে পড়ে রয়েছে, ওখানা ছিল ঐ টেবিলের সামনে।

—বসবার জন্যে চোর ওখানা টেনে এনেছিল আর কি!

—হ'তে পারে, না হতেও পারে!

—না হ'তেও পারে কেন?

—চোর চটপট কাজ হাসিল ক'রে সরে পড়তে চায়। সে চেয়ার পেতে ব'সে বিশ্রাম করে না। আর করলেও সে টেবিলের সামনেই গিয়ে বসতে পারত, চেয়ারখানা এত দূরে টেনে আনত না। বিশ্রাম করবার জন্যে এখানে ঢালা বিছানা রয়েছে, তবে চেয়ার নিয়ে টানাটানি কেন?

হরিহর ঠাট্টার সুরে বললেন, কেন? তার জবাব আপনিই দিন না।

—আপনি না পারলে পরে আমাকেই জবাব দিতে হবে বৈকি।

হরিহর মুখভার করে বললেন, আপনার জবাব শোনবার জন্যে আমার কোনই আগ্রহ নেই। তিনকড়িবাবু, আলমারির কলে একটা চাবি লাগানো রয়েছে দেখছি!

—ও চাবি আমার নয়।

—চোরের?

—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

—চাবিটা নতুন

—আলমারিটা খোলবার জন্য চোর হয়তো এই চাবিটা গড়িয়েছিল।

—তাহলে সে আগে এখানে এসে লুকিয়ে কলের ছাঁচ তুলে নিয়ে গিয়েছে।

—তাইতো জয়ন্তবাবু বললেন, এ কোন সন্ধানী চোরের কাজ।



—ঐ যে চেয়ারখানা আলমারির সামনে উল্টে পড়ে রয়েছে, ওখানা ছিল ঐ টেবিলের সামনে।

—জয়ন্তবাবু না বললেও এটুকু আমি বুঝতে পারতুম। তিনকড়ি বাবু, আপনার বাড়ীতে আপনি ছাড়া আর কে কে আছে?

—আমার স্ত্রী। আমার ছেলে নেই, কেবল একটি বিবাহিত মেয়ে আছে। সে শ্বশুরবাড়ীতে। এখানে একজন রাত-দিনের চাকর, বামুন আর ঠিকে ঝি আছে।

হরিহর ফিরে নিজের সহকারীকে বললেন, সুশীল, বামুন আর চাকরকে সেপাইদের হেপাজতে রেখে এস।

তিনকড়ি বললেন, আপনি কি তাদের সন্দেহ করছেন? তারা যে খুব বিশ্বাসী।

হরিহর ধমক দিয়ে বলল, আরে রাখুন মশাই! জানেন তো সব, এরকম বেশীর ভাগ চুরির জন্যেই দায়ী গৃহস্থের বামুন-চাকররা। যাও সুশীল।

জয়ন্ত বললে, চোর ঐ গরাদ খুলে ঘরের ভিতর ঢুকেছে।

হরিহর উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। খোলা গরাদটা হাতে ক'রে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বললেন, এর মধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছুই নেই।

—না। কিন্তু জানালার বাইরে কর্দ্দমাক্ত জমির উপরে চোরের পায়ের ছাপ আছে।

—বটে, বটে! সেগুলো তো দেখতে হয়!

—গরাদ-খোলা জানলার ফাঁক দিয়ে গ'লে বাইরে গিয়ে ছাপগুলো আমি দেখে এসেছি। কিন্তু আপনি কি তা পারবেন?

প্রবল মস্তকান্দোলন করে হরিহর বললেন, মোটেই নয়, মোটেই নয়। ঐটুকু ফাঁক দিয়ে কিছুতেই আমার গতর গলবে না। আমার দেহ গলবার জন্যে দরকার একটা গোটা দরজার ফাঁক। তিনকড়িবাবু ঐ জমিতে যাবার জন্য অন্য পথ আছে তো?

—আছে। আসুন। এই ব'লে তিনকড়ি অগ্রবর্তী হলেন।

যদুবাবু চুপিচুপি বললেন, জয়ন্তবাবু, একটা আরজি জানাতে পারি ?

জয়ন্ত বললে, নিশ্চয়ই পারেন।

—আমি গোয়েন্দার গল্প পড়তে ভারি ভালবাসি। কিন্তু সত্যিকার গোয়েন্দারা কেমন করে কাজ করেন তা কখনো দেখি নি। শুনেছি, পায়ের ছাপ দেখে গোয়েন্দারা অনেক কথাই বলতে পারেন। আপনাদের কাজ দেখবার জন্যে আমার বড় আগ্রহ হচ্ছে।

—বেশ তো, আসুন না।

মাধববাবু বললেন, আমাদের আগ্রহও কম নয়। আমরাও যেতে পারি কি ?

জয়ন্ত বললে, আপনারা সবাই আসুন।

ছয়

ছোট একফালি জমি—লম্বায় পঁচিশ হাত, চওড়া আট হাত। দক্ষিণ দিকে বাঁশের বেড়া, তারপর রাজপথ।

হরিহরের আগেই জয়ন্ত সেই জমির উপরে গিয়ে দাঁড়াল—তার পিছনে পিছনে যদুবাবু এবং আর সবাই।

জমির সব জায়গাই তখনো ভিজে রয়েছে। জয়ন্ত বললে, যদুবাবু, আমার পাশে পাশে আসুন। মাটির উপরে সাবধানে পা ফেলুন, চোরের পায়ের ছাপ মাড়িয়ে ফেললে হরিহরবাবু মহা খাপ্পা হয়ে উঠবেন।

তারা তিনকড়িবাবুর বৈঠকখানার গরাদ খোলা জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একদিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করে জয়ন্ত বললে, মাটির উপরে ঐ দেখুন চোরের পায়ের ছাপ। বেশ বোঝা যায়, সে

বাঁশের বেড়া টপ্‌কে যেদিক থেকে এসেছে, আবার চ'লে গিয়েছে সেই দিকেই।

যদুবাবু বললেন, চোরটা কি বোকা! এতবড় একটা সূত্র পিছনে রেখে গিয়েছে।

জয়ন্ত হেসে বললে, চোরটা হচ্চে কাঁচা, নইলে সে সাবধান হ'ত।

এমন সময় তিনকড়ি প্রভৃতিকে নিয়ে হরিহর এসে পড়লেন। তিনি তীক্ষ্নদৃষ্টিতে পায়ের ছাপগুলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তিনকড়ি বললেন, জুতো-পরা পায়ের ছাপ। হরিহরবাবু, আমার বামুন আর চাকর জুতো পরে না।

হরিহর বললেন—হয়তো বাইরের চোরের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আছে। রুলের গুঁতো খেলেই পেটের কথা বেরিয়ে পড়বে।

জয়ন্ত বললে, হরিহরবাবু, পায়ের ছাপগুলো দেখে কি বুঝলেন?

—যা বোঝবার তা বুঝেছি। আপনাকে বলব কেন?

জয়ন্ত হাস্যমুখে বললে, বেশ, আপনি কি বুঝেছেন জানতে চাই না। কিন্তু আমি যা বুঝেছি, বলব কি?

হরিহর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, বলতে ইচ্ছা করেন, বলতে পারেন। আমার শোনবার আগ্রহ নেই।

জয়ন্ত বললে, প্রত্যেক পায়ের দাগের মাঝখানকার ব্যবধানটা লক্ষ্য করুন। এটা আপনাকে মনে করিয়ে দেওয়া বাহুল্য যে ঢ্যাঙা লোক পা ফেলে বেশী তফাতে তফাতে আর খাটো লোক পা ফেলে কম তফাতে তফাতে। এখানে পায়ের দাগের ব্যবধান দেখে কি মনে হয়?

হরিহর মাটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, এগুলো নিশ্চয়ই কোন ছোট ছেলে—অর্থাৎ বালকের পায়ের ছাপ।

—ধরলুম তাই। এইবারে তিনকড়িবাবুর বৈঠকখানার দৃশ্যের

কথা ভেবে দেখুন। তাঁর নোটগুলো ছিল আলমারির উপর তাকে। মাথায় ছোট চোরের হাত উঁচুতে পৌঁছয়নি। তাই সে টেবিলের সামনে থেকে চেয়ারখানা আলমারির সামনে টেনে নিয়ে গিয়ে তার উপরে উঠে দাঁড়িয়ে নোটগুলো হস্তগত করে। তারপর তাড়াতাড়ি পালাবার সময়ে তার পায়ের ধাক্কা লেগে চেয়ারখানা উল্‌টে পড়ে যায়। এ ব্যাপারটা গোড়াতেই আমি আন্দাজ করতে পেরেছিলুম। এদিকে আপনারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলুম কিন্তু অধীনের কথা আপনি গ্রাহ্যের মধ্যেও আনতে রাজী হননি।

অপ্রতিভ ভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন হরিহর।

তিনকড়ি বললেন, বালক চোর? কি আশ্চর্য্য!

যদুবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বললেন, একটা পুঁচকে ছোকরা বিশ হাজার টাকা হাতিয়ে লম্বা দিয়েছে। আজব কাণ্ড!

মাধববাবু বললেন, কালে কালে হ'ল কি?

সাত

জয়ন্ত বললেন, হরিহরবাবু এই জুতো পরা পায়ের ছাপের আর একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করুন। চোর যে জুতো প'রে এখানে এসেছিল, তার ডান পাটার তলায় বাঁ-দিকের উপর-কোণের চামড়ার খানিকটা চাক্‌লা উঠে গিয়েছে। এই দেখুন, প্রত্যেক ডান পায়ের ছাপেই তার স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

হরিহরের মুখের উপর থেকে মুরুব্বিয়ানার ভাব মিলিয়ে গেল। তিনি বলে উঠলেন, তাই তো বটে, তাই তো বটে! তাকে পেলে তার বিরুদ্ধে মামালা সাজাতে আর কোন কষ্ট হবে না। তারপরেই একটু থেমে মুষড়ে প'ড়ে তিনি আবার বললেন, কিন্তু তাকে আর পাব কি?

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, চোর নিজেই আমদের কাছে এসে ধরা দেবে।

হরিহর সচমকে সুধোলেন, কি বললেন?

—চোরের খোঁজ আমি পেয়েছি।

—কোথায়, কোথায়?

—এইদিকে একটু এগিয়ে আসুন। এই পায়ের ছাপগুলো দেখে কি বুঝছেন?

—এও তো চোরেরই পায়ের ছাপ।

—কোন তফাৎ নেই তো?

ভালো করে দেখে সন্দিগ্ধ স্বরে হরিহর বললেন, মনে হচ্ছে এ ছাপ যেন টাট্‌কা।

জয়ন্ত বললে, ঠিক তাই। এগুলোর সৃষ্টি হয়েছে এইমাত্র। নির্বোধ চোর খেয়ালে আনেনি, কাল রাতের বিষম বৃষ্টির জন্যে মাটি এখনো ভিজে আছে।···আরে, আরে, যদুবাবু, খরগোশের মত দৌড়ে কোথা যান? মানিক হুঁশিয়ার!

সকলে বিপুল বিস্ময়ে দেখলে, যদুবাবুর বামনাবতারের মত অতিখর্ব্ব দেহখানি দৌড় মেরেছে তীব্রবেগে বাঁশের বেড়ার দিকে। কিন্তু বেড়া টপকাবার আগেই মাণিক তাকে ছুটে গিয়ে গ্রেপ্তার করে ফেললে।

তিনকড়ি বিস্মিত স্বরে বললেন, যদু, তুমি কার ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলে?

জয়ন্ত বললে, পুলিশের ভয়ে। এখনি ওঁর বাড়ীখানা তল্লাস করলে আপনার বিশ হাজার টাকার সন্ধান পাওয়া যাবে।

তিনকড়ি এ কথা যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না, ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে যদুবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন।

জয়ন্ত বললে, যখন চেয়ারের রহস্য আন্দাজ করলুম, পায়ের ছাপগুলো পরীক্ষা করলুম, আর স্বচক্ষে যত্নবাবুর বালকের মত খাটো মূর্তিখানি দর্শন করলুম, তখন জেগে উঠেছিল আমার সন্দেহ। ওঁর আর তিনকড়িবাবুর সামনাসামনি বাড়ী। তিনকড়িবাবু যে বাড়ীতে বিশ হাজার টাকা এনে রেখেছেন, ওঁর পক্ষে একথা জানা খুবই স্বাভাবিক। ওঁর বন্ধু যখন মাঝে মাঝে আলমারির ভিতর থেকে নোটগুলো বার করতেন, তখন সে দৃশ্য তিনি যে নিজের বাড়ী থেকেই দেখতে পেতেন, এইটুকুও অনুমান করা যায় খুব সহজেই। বৈঠকখানায় ছিল তাঁর নিয়মিত আসা-যাওয়া। আলমারির কলের ছাঁচ তোলবার অবসর পেতে পারেন উনিই। সুতরাং অধিক বলা বাহুল্য। তবে এ কথা ঠিক যে, নিম্নশ্রেণীর নির্বোধের মত আজ যেচে ভিজে মাটি মাড়িয়ে উনি যদি আমার ফাঁদে পা না দিতেন, তাহলে এত তাড়াতাড়ি ওঁকে হরিহরবাবুর কবলে আত্মসমর্পণ করতে হ'ত না।

—হ্যাঁ, ভালো কথা। যত্নবাবুর ডানপাটির জুতোর তলাটা একবার পরীক্ষা ক'রে দেখলে ভালো হয়।

পরীক্ষার ফল হ'ল সন্তোষজনক। জুতোর তলায় যথাস্থানে ছিঁড়ে গিয়েছে খানিকটা চামড়া।

জয়ন্ত বললে, মানিক, এখন শেষকৃত্যের ভার পুলিশের হাতে সমর্পণ করে চল' আমরা এখান থেকে প্রস্থান করি। কিন্তু যাবার আগে একটি জিজ্ঞাস্য আছে। হরিহরবাবু, সখের গোয়েন্দারা কি একেবারেই ঘৃণ্য জীব?

হরিহর অনুতপ্ত স্বরে বললেন, আমাকে ক্ষমা করবেন। আজ আমার চোখ ফুটল।

জয়ন্তের প্রথম মামলা

আমার বন্ধু জয়ন্ত গোয়েন্দাগিরি ক'রে এখন যথেষ্ট যশস্বী হয়েছে। সে যে কত মামলার কিনারা করেছে তার আর সংখ্যা হয় না। কিন্তু তার প্রথম মামলার কথা আজ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয়নি। মামলাটি যদিও বিশেষ অসাধারণ নয়, তবু তরুণ বয়স থেকেই সে যে কি রকম আশ্চর্য্য পর্য্যবেক্ষণ শক্তির অধিকারী ছিল, আমার এই কাহিনীর ভিতরে তার উজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যাবে।

আমি আর জয়ন্ত তখন 'থার্ড-ইয়ারে'র ছাত্র। সে যে ভবিষ্যতে একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা হবে, জয়ন্ত তখনও এ কথা জানত না বটে, কিন্তু সেই সময় থেকেই দেশ-বিদেশের অপরাধী-বিজ্ঞান, নামজাদা গোয়েন্দা ও অপরাধীদের কার্যকলাপ নিয়ে দস্তুরমত মস্তিষ্ক চালনা সুরু ক'রে দিয়েছিল। সময়ে সময়ে অতি তুচ্ছ সূত্র ধ'রে সে এমন সব বৃহৎ বৃহৎ তথ্য আবিষ্কার ক'রত যে, আমরা—তার সহপাঠীরা—বিস্ময়ে অবাক না হয়ে পারতুম না।

একটি বৈকাল। জয়ন্ত ও আমি গোলদীঘিতে পায়চারী করছি। এমন সময় তপনের সঙ্গে দেখা। সেও আমাদের কলেজের 'থার্ড-ইয়ারে'র ছাত্র বনিয়াদী বংশের ছেলে। তার পূর্বপুরুষরা আগে বিপুল সম্পত্তির মালিক ছিলেন; তাদের আধুনিক অবস্থা ততটা উন্নত না হলেও, এখনো তারা ধনবান বলে পরিচিত হতে পারে। আজও তাদের বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসবে সমারোহের অভাব হয় না।

জয়ন্তকে দেখেই তপন ব'লে উঠল, আরে, তোমাকেই খুঁজছি যে!

জয়ন্ত সুধোলে, আমাকে খুঁজছো কেন?

—একটা হেঁয়ালির অর্থ জানতে চাই।

—কি রকম হেঁয়ালি?

—আমাদের বাড়ীতে একটা ঘটনা ঘটেছে। গুরুতর কিছু নয় বটে, কিন্তু যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। এ-সব ব্যাপারে তোমার মাথা খুব খেলে কিনা তাই তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই।

—ঘটনাটা বল।

—এই ভিড়ে নয়, আমার বাড়ীতে চল। মনে কোরো না কেবল ঘটনাটা বলবার জন্যেই তোমাদের বাড়ীতে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। যৎ-সামান্য ঘটনা, তুচ্ছ চুরি কোন ছিঁচকে চোরের কীর্তি! কিন্তু তোমাদের সঙ্গ আমার ভাল লাগে, তাই একসঙ্গে বসে চা-টা খেতে খেতে কিছুক্ষণ গল্পসল্প করতে চাই।

আমার দিকে ফিরে জয়ন্ত বলল, কি হে মাণিক, রাজি আছ?

আমি বললুম, মন্দ কি! অন্তত খানিকটা সময় কাটানো যাবে তো।

দুই

তপনদের সাজানো-গুছানো বৃহৎ বৈঠকখানা। চা এল খাবার এল।

তপন বললে, আগে ঘটনাটা শোনো, তোমার মত বল, তারপর অন্য গল্পসল্প।…দেখ, আমার প্রপিতামহ স্বর্গীয় তারাশঙ্কর চৌধুরী ছিলেন অত্যন্ত খেয়ালী মানুষ। কোন্ খেয়ালে জানি না, তিনি গুটিকয় দেব-দেবীর মূর্তি গড়িয়েছিলেন: বিষ্ণু, মহাদেব, কৃষ্ণ, রাধা, কালী, লক্ষ্মী আর সরস্বতী—এই সাতটি মূর্তি। ওর মধ্যে লক্ষ্মীর মূর্তিটিই সব চেয়ে বড়—লম্বায় এক ফুট। অন্য অন্য মূর্তির কোনটি আট ইঞ্চি লম্বা, কোনটি ছয় ইঞ্চি। মূর্তিগুলি বেশ ভারি। কি দিয়ে

গড়া জানি না, বাবা বলতেন পিতলের মূর্তি। কিন্তু বাহির থেকে বোঝবার উপায় ছিল না, কারণ প্রত্যেক মূর্তির আপাদমস্তক ছিল রঙিন এনামেল দিয়ে ঢাকা। ঠাকুরঘরের মধ্যে একটি গ্লাস-কেসের ভিতরে মূর্তিগুলি সাজানো ছিল—আমার প্রপিতামহের আমল থেকেই। আমার ঠাকুরদা কি বাবা, ও মূর্তিগুলো নিয়ে কিছুমাত্র মাথা ঘামাননি, আমিও মাথা ঘামানো দরকার মনে করিনি, কিন্তু সম্প্রতি এক ব্যক্তি তাদের নিয়ে রীতিমত মাথা না ঘামিয়ে পারেনি।

—কে সে?

—কোন অজ্ঞাত চোর।

—তাহলে মূর্তিগুলি চুরি গিয়াছে?

—হ্যাঁ।

—কবে?

—তিন দিন আগে।

—মূর্তিগুলি কি মূল্যবান?

—মূল্যবান হলে সেগুলিকে কাঁচের আধারে ও-ভাবে ঠাকুরঘরে ফেলে রাখা হ'ত না।

—শিল্পের দিক দিয়েও তাদের কোন মূল্য থাকতে পারে তো?

—মোটেই নয়, মোটেই নয়। অতি সাধারণ মূর্তি, শিল্পীরা তাদের দিকেও ফিরেও তাকাবে না। কেবল এনামেল করা মূর্তি এইটুকুই যা বিশেষত্ব। তবে সেজন্য কেউ তাদের খুব বেশী দাম দিয়ে কিনতে রাজি হবে না। কিন্তু মজার কথা কি জানো? আমার অতি খেয়ালী প্রপিতামহ তাঁর উইলেও মূর্তিগুলির উল্লেখ করতে ভোলেন নি।

—কি রকম?

—উইলে তিনি বলেছেন, তাঁর কোন বুদ্ধিমান বংশধরের জন্য ঐ মূর্তিগুলি আর সত্যনারায়ণের পুঁথিখানি রেখে গেলেন, যে ওগুলির সদ্ব্যবহার করতে পারবে। মূর্তি আর পুঁথি যেন সযত্নে রক্ষা করা হয়।

—বটে, বটে! এতক্ষণ পরে একটা চিত্তাকর্ষক কথা শুনলুম। সত্যনারায়ণের পুঁথি কি তপন?

—সেকালে হাতে লেখা একখানা পুরাতন পুঁথি। সত্যনারায়ণের পূজার সময়ে পুঁথিখানি পাঠ করা হয়।

—আচ্ছা, পুঁথির কথা পরে হবে, আগে চুরির কথা বলো।

—পরশু দিন মামাতো বোনের বিয়ে ছিল। বাড়ীর সবাইকে নিয়ে মামার বাড়ীতেই রাত কাটাতে হয়েছিল। কাল সকালে ফিরে এসে দেখি 'গ্লাস-কেসে'র ভিতর থেকে মূর্তিগুলো অদৃশ্য হয়েছে।

—ঠাকুরঘরের দরজা কি তালাবন্ধ থাকত না?

—থাকত বই কি! চোর অন্য কোন চাবি দিয়ে তালাটা খুলে ফেলেছিল।

—মূর্তি ছাড়া আর কিছু চুরি যায় নি?

—না। এও এক আশ্চর্য কথা। ঠাকুরঘরের লক্ষ্মীর হাঁড়ির ভিতর ছিল আকবরী মোহর, কিছু কিছু রূপোর বাসন-কোসন, গৃহ-দেবতা রঘুনাথের রূপোর সিংহাসন, সোনার ছাতা, চূড়া, পইতা আর খড়ম। চোর কিন্তু সে সব স্পর্শও করেনি। সে যেন খালি মূর্তিগুলো চুরি করবার জন্যেই এখানে এসেছিল।

—পুলিশে খবর দিয়েছ?

—এই সামান্য চুরির মামলা নিয়ে পুলিশ-হাঙ্গামা করতে ইচ্ছেই হচ্ছে না।

—কারুর উপরে তোমার সন্দেহ হয়?

—কাকে সন্দেহ করব? দাস-দাসী, পাচক, দ্বারবান সকলেই বাবার আমলের পরীক্ষিত লোক, এতদিন পরে তাদের কারুর ঐ তুচ্ছ মূর্তিগুলোর উপরে দৃষ্টি পড়বে কেন? তারা ছাড়া বাড়ীতে থাকেন শীতলবাবু। তার কর্তব্য দু-রকম। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ানো আর এটা-ওটা-সেটার তত্ত্বাবধান করা। তিন বছর কাজ

করছেন, প্রায় আমাদের সংসারেরই একজন হয়ে উঠেছেন। গরীব হলেও লেখাপড়া জানা নিরীহ সচ্চরিত্র ব্যক্তি—সকল রকম সন্দেহের অতীত।

জয়ন্ত বললে, তোমাদের ঐ সত্যনারায়ণের পুঁথির কথা এইবার বল। তোমার প্রপিতামহ ঐ পুঁথিখানাকেও যখন সযত্নে রক্ষা করতে বলেছেন, তখন ওর মধ্যেও নিশ্চয় কোনও বিশেষত্ব আছে।

তপন বললে, বিশেষত্ব? পুঁথির ভিতরে আবার কি বিশেষত্ব থাকবে? বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে একটু ভেবে সে আবার বললে, না না, একটা বিশেষত্ব আছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে মূর্তি চুরির কোনই সম্পর্কই থাকতে পারে না।

জয়ন্ত বললে, হয়তো, কোনই সম্পর্ক নেই। তবু বিশেষত্বের কথা শুনে রাখা উচিত।

তপন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, পুঁথিখানা আমি এখনি নিয়ে আসছি তুমি স্বচক্ষে দেখতে পারো।

॥ তিন ॥

তপন নিয়ে এল পুঁথিখানা।

জয়ন্ত তার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললে, খুব প্রাচীন পুঁথি বটে। কিন্তু তপন, আর কোন বিশেষত্বই তো দেখতে পাচ্ছি না।

—পুঁথি যেখানে শেষে হয়েছে, বিশেষত্বটা খুঁজে পাবে সেইখানে।

যথাস্থানে দৃষ্টিপাত ক'রে কিছুক্ষণ মৌন মুখে বসে রইল জয়ন্ত। আরো লক্ষ্য করলুম, তার দুই চক্ষে ফুটে উঠেছে জ্বলন্ত কৌতূহল।

পুঁথি থেকে মুখ তুলে অবশেষে সে বললে, এখানে ভিন্ন হাতের একটু লেখা রয়েছে।

তপন বললে, হ্যাঁ, হিজিবিজি হেঁয়ালি। কোন্ ভাষা, কিছু বোঝবার যো নেই। কৌতূহল জাগায়, কিন্তু কৌতূহল মেটায় না। বহু চেষ্টা করে শেষটা হার মেনেছি।

—তোমার বাবা, তোমার ঠাকুরদাদাও নিশ্চয় পুঁথির এই লেখা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ, তাঁরাও কিছুই বুঝতে পারেন নি।

—তপন, বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, তোমার প্রপিতামহ যে বুদ্ধিমান বংশধরের জন্যে এই পুঁথিখানি সযত্নে রক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, তিনি এখনো তোমাদের পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নি।

কিঞ্চিৎ বিরক্ত স্বরে তপন বললে, তোমার কথার অর্থ বুঝলুম না।

—বেশ, বুঝিয়ে দিচ্ছি। জয়ন্ত উঠে প'ড়ে দেয়ালে ঝুলানো প্রকাণ্ড একখানা দর্পণের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর পুঁথিখানা তুলে ধরে আয়নার ভিতরেতার প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতেএকখণ্ড কাগজের উপরে কি সব লিখে যেতে লাগল। তারপর ফিরে এসে কাগজখানা আমাদের সামনে টেবিলের উপরে ফেলে দিয়ে বলল, এইবারে প'ড়ে দেখ।

সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে আমরা দুজনে এই কথাগুলি পাঠ করলুম :

'অভাবে স্বভাব নষ্ট করিবে না। সর্বদা দেবদেবীর মূর্তি স্মরণ করিবে। নিশ্চিন্ত জানিও, তোমার অভাব লইয়া মাথা ঘামাইতে হইবে না। চিন্তা দূর করিবে। লক্ষ্মীছাড়া হইলে জীবনে লক্ষ্মীর ঝাঁপি বিশেষ কাজে লাগে না। জগদীশ্বর কত রূপে দ্রষ্টব্য।'

তপন চমৎকৃত কণ্ঠে বললে, ঐ হেঁয়ালীর ভিতরে এই কথা ছিল ?

জয়ন্ত বললে, হ্যাঁ। কিন্তু যা তুমি হেঁয়ালী বলে ভ্রম করছ, তা হচ্ছে আমাদের সরল মাতৃভাষাই। কেবল উল্টোভাবে সাজানো।

—উল্টোভাবে সাজানো মানে ?

—এ হচ্ছে এক রকম সাদাসিদে গুপ্তলিপি। ইংরেজীতে একে বলে 'Looking Glsss Cipper' (দর্পন-গুপ্তলিপি)। পঞ্চদশ শতাব্দীতেও ইতালীর চিন্তাশীল চিত্রশিল্পী 'লিও নার্দো দ্য ভিঞ্চি' এই উপায়েই গুপ্তলিপি রচনা করে গিয়াছেন। আয়নার সামনে ধরলেই এ-রকম গুপ্তলিপি খুব সহজেই পাঠ করা যায়।

তপন বললে, এত সহজে গুপ্তলিপির পাঠোদ্ধার করে তুমি যথেষ্ট বাহাদুরির পরিচয় দিলে বটে, কিন্তু এটা আমাদের কোন কাজে লাগবে ? এতো কতকগুলি মামুলি উপদেশ মাত্র। সকলেই যা জানে, তার জন্যে আবার গুপ্তলিপির কি প্রয়োজন ?

—ঠিক বলছ তপন। এ রকম মামুলী উপদেশের জন্যে গুপ্তলিপির প্রয়োজন হয় না। তার উপরে উপদেশগুলো কেমন যেন খাপছাড়া ! আমার কি সন্দেহ হচ্ছে জানো ? তোমার প্রপিতামহ এই গুপ্তলিপি রচনার সময়ে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন। যেমন বেনারসের একরকম কৌটোর ভিতরেও আবার কৌটো থাকে, তেমনি এই গুপ্তলিপির প্রথম রহস্যের ভিতরেও অন্য কোন রহস্য আছে। তোমরা এখন দয়া করে বাইরে যাও, আমাকে কিছুক্ষণ একলা থাকতে দাও, একবার চেষ্টা করে দেখি, গুপ্তলিপির আসল অর্থ আবিষ্কার করতে পারি কিনা !

॥ চার ॥

বৈঠকখানার পাশেই ছিল তপনদের লাইব্রেরী। তপন আমাকে সেই ঘরেই নিয়ে গেল।

সাধারণতঃ বাঙ্গালীদের বাড়ীতে এত বড় লাইব্রেরী চোখে পড়ে না। মস্ত ঘরের চারিদিকের দেওয়ালের আধখানা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে আলমারির পর আলমারি। ভিতরকার বইগুলোর নাম পড়তে পড়তে কেটে গেল খানিকক্ষণ।

ফিরে বললুম, তপন, এখানে যতগুলো বইএর নাম পড়লুম, সবই দেখছি পুরানো যুগের।

—তা তো হবেই। এ ঘরের চার ভাগের তিন ভাগ কেতাব সংগ্রহ করে গিয়েছেন আমার প্রপিতামহ। বই কেনা আর বই পড়া ছিল তাঁর আর এক অদ্ভুত খেয়াল।

—বই কেনা আর পড়াকে তুমি অদ্ভুত খেয়াল বলে মনে কর। জানো আমরা পশুত্বের ধাপ থেকে মানুষের ধাপে উঠতে পেরেছি কেবল জ্ঞানার্জ্জনের দ্বারা।

—জানি। যে কোন বিষয়েই বাড়াবাড়িটাকে আমি 'ফ্যাড' বলেই মনে করি।

—না। যা আমাদের মনকে উন্নত করে, প্রশস্ত করে, তার বাড়াবাড়িও নিন্দনীয় নয়। দেখ্‌ছি তোমার প্রপিতামহ একজন অত্যন্ত সুধী ব্যক্তি ছিলেন।

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে ডাক দিলে—তপন! মাণিক! শীগগির এ ঘরে এস।

আমরা বৈঠকখানায় ঢুকে দেখলুম, জয়ন্ত একখণ্ড কাগজের দিকে তাকিয়ে স্থিরভাবে বসে আছে।

তপন সুধালো, ব্যাপার কি ভায়া? গুপ্তলিপির ভিতর থেকে আর কোন নতুন অর্থ আবিষ্কার করতে পেরেছ নাকি?

—পেরেছি। তোমাদের বাড়ির যত অনর্থের মূলেই আছে এই অর্থ।

—অর্থটা শুনি।

—এখন নয়। অর্থটা ইঙ্গিতময় শুনলেও ভাল করে বুঝতে পারবে না। অর্থটা প্রকাশ করবার আগে আমি একটা কথা জানতে চাই।

—কি কথা?

—সত্যনারায়ণের পুঁথির এই বিশেষত্ব নিয়ে তুমি আর কারুর সঙ্গে আলোচনা করেছ?

—আগে আগে করতুম বৈকি! কিন্তু কেউই ঐ হেঁয়ালী বুঝতে পারে নি। শেষে হতাশ হয়ে হাল ছেড়েদি। কেবল গত মাসে শীতলবাবুর কৌতূহল দেখে, পুথিখানা তাঁর হাতে দিয়েছিলুম বটে।

—তারপর?

—শীতলবাবু পরদিন পুঁথিখানা ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, তিনিও কিছুই বুঝতে পারেন নি।

—শীতলবাবুকে একবার এখানে ডাকবে?

—তিনি বৈকালেই দেশের জন্যে বাজার-হাট করতে বেরিয়ে গিয়েছেন, সন্ধ্যার আগে ফিরতে পারবেন না।

—দেশের জন্যে বাজার-হাট?

—হ্যাঁ। তাঁর কোন্ আত্মীয়ের বিয়ে, তাই এক হপ্তার ছুটি নিয়ে কাল তিনি দেশে যাচ্ছেন।

—কাল কখন?

—খুব ভোরের গাড়ীতে। সূর্যোদয়ের আগেই তাকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

—শীতলবাবু কি তোমার বাড়ীর দোতলায় থাকেন ?

—না, বাড়ীর একতলায়—খিড়কীর বাগানের সামনেই।

জয়ন্ত প্রায় পাঁচ মিনিটকাল স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল। তারপর বললে, তপন আজ রাত্রে তোমার বাড়ীতে আমাদের জন্য একটুখানি জায়গা হবে ?

তপন বিস্মিত কণ্ঠে বললে, তার মানে।

—আমি আর আমার বন্ধু মাণিক আজ তোমাদের বাড়ীতে রাত্রিবাস করতে চাই।

—যদিও তোমার এই প্রস্তাবের কারণ বুঝতে পারছি না, তবু সানন্দে স্বাগত সম্ভাষণ করছি। কেবল রাত্রিবাস কেন, ডানহাতের ব্যাপারটাও আমার এখানে সেরে নিও।

—আপত্তি নেই! আর একটা কথা; আমি আবার দক্ষিণ খোলা না হলে ঘুমুতে পারি না।

—নির্ভয় হও। আমার বাড়ীর দক্ষিণ দিকে আছে বাগান আর পুকুর—এখানা সেকেলে বাড়ী কিনা! আমার শয়ন গৃহও সেইদিকে। তোমরাও আমার সঙ্গে সেই ঘরেই শয়ন করবে।

॥ পাঁচ ॥

তপন যে গুরুতর আহার্যের ব্যবস্থা করেছিল, একটিমাত্র ডান হাতের সাহায্যে কোন মানুষই তার সদ্ব্যবহার করতে পারে না। খানিক পেটে পাঠিয়ে, খানিক পাতে ফেলে আমরা উঠে পড়তে বাধ্য হলুম—তপনের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও।

বাগানের দিকে দোতলার বারান্দায় খানিকক্ষণ পায়চারি করলুম তিনজনে। জ্যোৎস্নামালা রাত, বাগানের তাল নারিকেল পাতায় পাতায় আলোর ফুলঝুরি, সরোবরের নৃত্যশীল জলে চন্দ্রকরের

চক্‌মকি। মৃদু পত্র-মর্মর, বাতাসের ঠাণ্ডা দীর্ঘশ্বাস, ঝিল্লীদের ঘুমপাড়ানো ঝঙ্কার।

খানিকক্ষণ চলল গল্প। তারপর ঘুমে আমার চোখ ভরে এল। জয়ন্ত ঘন ঘন হাই তুলতে সুরু করেছে দেখে তপন বললে, চল, এইবার শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নেওয়া যাক।

শুয়ে শুয়ে খানিকক্ষণ ভাবলুম, জয়ন্ত গুপ্তলিপির এমন কি গূঢ় অর্থ আবিষ্কার করেছে, যে জন্য আজ এখানে তার রাত কাটাবার দরকার হল? জিজ্ঞাসা করলেও এখন সে জবাব দেবে না জানি, তাই তাকে কিছু জিজ্ঞাসাও করিনি? সময়ে সময়ে নিরতিশয় রহস্যময় হয়ে ওঠে জয়ন্ত!···এই সব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়লুম নিজের অজ্ঞাতসারে।

আচম্বিতে আমার ঘুম গেল ভেঙে—কে আমাকে ধাক্কার পর ধাক্কা মারছে।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে দেখি, জয়ন্ত!

তারপর সে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিল তপনকেও।

ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে বাজল রাত দুটো।

তপন সবিস্ময়ে বললে, এত রাত্রে একি ব্যাপার জয়ন্ত?

—কোন কথা নয়। একেবারে একতলায় নেমে চল। সিধে শীতলবাবুর ঘরে।

—সে কি, কেন?

—কথা নয়, কথা নয়! যা বলি শোন!

ঘর থেকে সবাই বেরিয়ে পড়লুম। সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নামলুম। খানিক এগিয়ে একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে তপন বললে, এই শীতলবাবুর ঘর।

দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছিল আলোর রেখা।

জয়ন্ত বললে, তপন, শীতলবাবুকে ডাকো।

তপন ডাকলে, শীতলবাবু, শীতলবাবু!

ঘরের আলো গেল নিভে।

কোন সাড়া নেই।

তপন আবার ডাকলে, শীতলবাবু! ঘরের আলো নেবালেন কেন? আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না কেন?

এবার ঘরের ভিতর থেকে সাড়া এল, কে?

—আমি তপন, দরজা খুলুন।

দরজা খুলে একটি লোক বাইরে বেরিয়ে এসে বললে, এত রাতে! ব্যাপার কি? কোন বিপদ-আপদ হয়েছে নাকি!

ইতিমধ্যে জয়ন্ত হাতের 'টর্চ' জ্বেলে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে সুইচ্ টিপে আলো জ্বেলে দিয়েছে।

শীতলবাবুও ঘরে ঢুকে ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠল, কে আপনি? আমার ঘরে আপনার কি দরকার?

তপন বললে, চুপ করুন শীতলবাবু। উনি আমার বন্ধু।

শীতলবাবু বললে, কিন্তু আপনার বন্ধু এত রাতে আমার ঘরে ঢুকে কি করতে চান?

জয়ন্ত বললে, আমি দেখতে চাই, একটা ভিজে পোঁটলা আপনি ঘরের ভিতর কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন?

—পোঁটলা? কিসের পোঁটলা?

কিন্তু জয়ন্ত আর তার কথার জবাব না দিয়ে নিজের মনেই বললে, হুঁ! এই তো ঘরের মেঝেয় রয়েছে জলের দাগ! এই তো একটা জলে ভেজা জিনিস টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে! হ্যাঁ টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে একেবারে চৌকির তলায়—বলতে বলতে সে মেঝের উপরে উপুড় হয়ে শুয়ে প'ড়ে বুকে হেঁটে প্রবেশ করল চৌকির তলদেশে এবং সেইভাবেই আবার যখন বাইরে বেরিয়ে এল, তখন দেখা গেল সে টানতে টানতে নিয়ে আসছে একটা চটের থলি।

তারপর সে থলির ভিতর হাত চালিয়ে একে একে বার করলে রাধা, কৃষ্ণ, লক্ষ্মী, কালী, মহাদেব ও সরস্বতী—এই সাতটি দেবদেবীর এনামেল করা মূর্তি।

তপন নির্বাক, বিষম বিস্ময়ে। শীতলবাবুও নির্বাক, দারুণ আতঙ্কে।

হঠাৎ বিষ্ণু মূর্তিটি তুলে ধরে জয়ন্ত বললে, আরে একি! বিষ্ণু ঠাকুরের ডান পায়ের উপর থেকে খানিকটা এনামেলের আবরণ তুলে ফেললে কে? বুঝেছি, এ হচ্ছে সুচতুর শীতলবাবুর কাজ! উনি সন্দেহ করেছিলেন, এনামেলের পাতলা আবরণ কেবল বোকাদের চোখ ঠকাবার জন্যে, কিন্তু তলায় আছে কোন মহার্ঘ ধাতু। তপন দেখতে পাচ্ছ কি, বিষ্ণু মূর্তিটির পা কি দিয়ে গড়া? সোনা। খালি পা কেন, সমস্ত মূর্তিটাই সোনা দিয়ে গড়া।

—বল কি জয়ন্ত!

—হ্যাঁ। কেবল বিষ্ণুমূর্তি নয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রত্যেক দেবদেবীর মূর্তিই নিরেট সোনা দিয়ে তৈরী। আন্দাজে মনে হচ্ছে এ মূর্তিগুলির মোট ওজন এক মণের কম নয়।

আমি তো স্তম্ভিত!

জয়ন্ত লক্ষ্মীদেবীর সবচেয়ে বড় মূর্তিটি তুলে নিয়ে বলল, তপন এইবার আমি তোমাকে আরেকবার অভিভূত করতে চাই। দেখছি লক্ষ্মীদেবীর দেহের তুলনায় ঝাঁপিটি অতিরিক্ত বড়। ঝাঁপির ভিতরটা ফাঁপা। কিন্তু ঝাঁপির ঢাকনিটা ভেঙে খুলে ফেললে কে? নিশ্চয়ই শীতলবাবুর কীর্তি! শীতলবাবু, ঝাঁপির ভিতরে কি ছিল?

শীতলবাবু শুষ্কস্বরে বললেন, আমি জানি না।

—আহা, জানেন বৈকি! ঝাঁপির ভিতরে যা ছিল এখনি আমাকে ফিরিয়ে দিন।

—ঝাঁপির ভিতর কিছুই ছিল না।

—এখনো মিথ্যে কথা ? তপন তাহলে আর দয়া নয়, তুমি এখনি থানায় ফোন করে দাও, পুলিশ এসে শেষ ব্যবস্থা করুক।

পুলিশের নামেই শীতলবাবু ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতেকাঁপতে বললে, আমাকে ধরিয়ে দেবেন না, আমাকে ধরিয়ে দেবেন না।

—তাহলে ঝাঁপির ভিতরে কি ছিল দিন।

শীতলবাবু বিনা বাক্যব্যয়ে জামার পকেটের ভিতর থেকে একটি ছোট কাগজের মোড়ক বার ক'রে জয়ন্তের হাতে সমর্পণ করলে।

জয়ন্ত আগে মোড়কটা খুলে তার ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে মুখ টিপে একটুখানি হাসলে। তারপর বললে, তপন, শীতলবাবুর মস্তিষ্ক যে তোমার চেয়ে শক্তিশালী সেটা তিনি প্রমাণিত করেছেন। কিন্তু অপরাধী হিসাবে তিনি একেবারে শিশুর মত কচি আর কাঁচা।

তিনি যদি এত তাড়াতাড়ি বামাল নিয়ে এখান থেকে সরে পড়বার চেষ্টা না করতেন, তা'হলে আমরা কিছুতেই ওঁর নাগাল পেতুম না। যাক্ ও কথা। এটা হচ্ছে শীতলবাবুর প্রথম অপরাধ। আর উনি এই অপরাধটা করেছেন বলেই তুমি হলে সব দিক দিয়েই আশাতীত-রূপে লাভবান। কারণ উনি অপরাধটা না করলে তুমিও আমাকে ডাকতে না, আর তাহলে তোমাদের এই দেবদেবীর মূর্তিগুলিও এনামেলের চাদরে গা ঢাকা দিয়ে ঐ কাঁচের আধারেরই শোভাবর্ধন করতেন, এ জীবনেও তুমি তাঁদের আসল চেহারা দেখতে পেতে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি ওকে ক্ষমা করবে, না পুলিশের হাতে সমর্পন করবে ?

তপন বললে, আমি ওঁকে ক্ষমাও করব না, পুলিশেও দেব না। শীতলবাবু বিশ্বাসহন্তা। উনি যেন এই মুহূর্তে আমার বাড়ী থেকে বিদায় হয়ে যান।

শীতলবাবুর অধিকাংশ মোটঘাট বাঁধাই ছিল। সে আর দ্বিরুক্তি

না ক'রে বাকি জিনিস-পত্তর গুছিয়ে নিয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, জয়ন্ত ঐ মোড়কটার ভিতরে কি আছে?

জয়ন্ত হাসিমুখে মোড়কটা আমার সামনে খুলে ধরে বললে, সাত রাজার ধন এক মাণিক।

প্রকাণ্ড এক হীরক খণ্ড। অতবড় হীরা আমি কখন চক্ষেও দেখিনি।

তপনের বোধহয় মাথা ঘুরে গেল। সে একটা অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করে ধপাশ করে চৌকির উপর ব'সে পড়ল।

। ছয় ।

জয়ন্ত বললে, আমি কেন শীতলবাবুর উপরে সন্দেহ করেছিলুম, এখন সেই কথাই শোন।

এনামেল করা মূর্তিগুলি যে অত্যন্ত মূল্যবান, আর সত্যনারায়ণের পুঁথিখানি যে অতিশয় দরকারি, এতদিন কেন যে তোমাদের এমন সন্দেহ হয়নি, সেটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। গুপ্ত-লিপির রহস্য তোমরা জানতে না বটে কিন্তু এটা তো সকলেই জানতে যে, তোমার প্রপিতামহ উইলে স্পষ্ট ভাষায় ব'লে গেছেন, যে ঐ মূর্তি-গুলির আর পুঁথির সদ্ব্যবহার করতে পারবে, সে তাঁর নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। হয়তো অভাবে পড়নি বলেই তোমরা ও-কথা-গুলির উপরে বিশেষ ঝোঁক দাওনি। হয়তো অভাবে পড়লেই তোমাদেরও মাথা খুলে যেত।

আমি গুপ্তলিপির পাঠোদ্ধার করবার আগেই ঐ কথাগুলি শুনেই নিশ্চিত ভাবে ধ'রে নিয়েছিলুম দেবদেবীর মূর্তিগুলি মহামূল্যবান। অবশ্য গুপ্তলিপি পড়বার পর ও সম্বন্ধে আমার আর কোন সন্দেহই থাকেনি।



জলের ভিতর থেকে দড়ি ধরে টেনে তুললে পোঁটলার মত কি একটা জিনিস।

[পৃষ্ঠা-৬৯

বাড়ীর লোকই যে চুরি করেছে, এটা বুঝতেও আমার বিলম্ব হয়নি। ঠাকুরঘরে তালার নতুন একটা চাবি গড়বার সুযোগ হয় বাড়ীর লোকেরই। বাইরের চোর মূর্তি রহস্য জানত না, অতএব কেবল মূর্তিগুলিই চুরি ক'রে স'রে পড়ত না। ঘটনার দিন রাত্রে বাড়ীতে ছিল দাসদাসী, পাচক আর দ্বারবানরা। নিশ্চয় তাদেরও কেউ চুরি করেনি, কারণ তাহলে সে ঠাকুরঘরের সোনা-রূপোর জিনিসগুলোও ফেলে যেত না। বাড়ীর ভিতরে তাদের কথা বাদ দিলে বাকি থাকে কেবল শীতলবাবু। আমার যুক্তি বললে, সেই-ই চোর।

কিন্তু কেন সে বেছে বেছে মূর্তিগুলোই চুরি করলে? আমার মত সেও কি ভিতরের রহস্য আবিষ্কার করবার কোন সুযোগ পেয়েছিল? তপনকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম, পেয়েছিল। মাসখানেক আগে সে হস্তগত করেছিল পুঁথিখানা। খুব সম্ভব আমার মত তাড়াতাড়ি সে গুপ্তলিপির পাঠোদ্ধার করতে পারিনি। সেই চেষ্টাতেই তার কিছুদিন কেটে যাবে। তারপর নতুন চাবি গড়িয়ে চুরি করে সে প্রথম সুযোগেই।

কিন্তু চোরাই মাল রাখলে কোথায়? অতরাত্রে মূর্তিগুলো নিয়ে নিশ্চয়ই সে বাড়ীর বাইরে যেতে সাহস করেনি, কেউ না কেউ তাকে দেখে ফেলতে পারে। আর বাইরেই বা সে যাবে কোথায়, তার বাসা যখন এই বাড়ীতেই? কিন্তু চোরাই মাল সে নিজের ঘরে রাখতেও ভরসা করবে না। পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে তার ঘরখানা তল্লাস করতে পারে। অতএব চোরাই মাল সে এমন কোন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে, যা তার ঘরের বাইরে কিন্তু বাড়ীর বাইরে নয়। কিন্তু সে জায়গাটা কোথায়? তার ঘরের পাশেই আছে বাগান আর পুকুর। বাগানের মাটি খুঁড়ে বা পুকুরের জলে ডুবিয়ে মূর্তিগুলো লুকিয়ে রাখা যেতে পারে।

শীতলবাবু বুদ্ধিমান, কিন্তু কাঁচা অপরাধী। ধরা পড়বার ভয়ে দু'দিন যেতে না যেতেই স্থির করলে, কোন ওজরে ছুটি নিয়ে দেশে চলে যাবে। আমি তৎক্ষণাৎ আমার পথ দেখতে পেলুম। সে দেশে যাবে কাল সকালে। আর যাবার সময়ে বহুমূল্য মূর্তিগুলো নিশ্চয়ই এখানে ফেলে রেখে যাবে না, আজ রাত্রে সেগুলোকে গুপ্তস্থান থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করবে। সুতরাং আজ এখানে রাত্রিবাস করবার জন্যে আমি তপনের কাছ থেকে চাইলুম একখানা দক্ষিণ খোলা ঘর, কারণ এ বাড়ীর দক্ষিণে যে বাগান আছে, সেটা আমার অজানা ছিল না।

আমি ঘুমোবার ভান ক'রে তোমাদের সঙ্গেই শুয়েছিলুম। তারপর তোমাদের নাসাগর্জন সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ে দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম। যা দেখবার আশা করেছিলুম, রাত পোৌণে ছটোর সময়ে দেখতে পেলুম ঠিক সেই দৃশ্যই। সন্তর্পণে বাগানে এসে দাঁড়ালো শীতলবাবু। তারপর পুকুর পাড়ে গেল। জলের ভিতর থেকে দড়ি ধরে টেনে তুললে পোঁটলার মত কি একটা জিনিস। তারপরের কথা বলবার দরকার নেই।

সাত

আমি বললুম, কিন্তু এখনো আমরা আসল কথা শুনতে পেলুম না।

জয়ন্ত বললে, কি কথা শুনতে চাও?

—গুপ্তলিপির ভিতর থেকে তুমি দ্বিতীয় কি অর্থ আবিষ্কার করেছ?

—কেবল আমি নই শীতলবাবুরও আবিষ্কার করেছে।

—অর্থটা কি?

জয়ন্ত আমাদের সামনে একখণ্ড কাগজ খুলে ধরলে—তার উপরে লেখা ছিল গুপ্তলিপির সেই উপদেশগুলি : 'অভাবে স্বভাব নষ্ট করিবে না' প্রভৃতি।

তারপর সে বললে, তপনের প্রপিতামহ সাবধানতার উপরে সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন। যদি কেউ 'Looking glass Cipper' এর গুপ্তকথা ধরতেও পারে, তাহলেও সে আসল গূঢ় অর্থ বুঝতে পারবে না, কথাগুলোকে উপদেশ ব'লেই গ্রহণ করবে। কিন্তু ভাল করে উপদেশের শব্দগুলোকে লক্ষ্য কর মোট লাইনে আছে ছয়টি। এখন প্রত্যেক লাইন থেকে যদি কোন প্রথম আর শেষ শব্দ নিয়ে পরে পরে সাজিয়ে যাও, তা'হলে পাওয়া যাবে এই কথাগুলি : 'অভাবে দেব-দেবীর মূর্তি তোমার অভাব দূর করিবে, লক্ষ্মীর ঝাঁপি বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য'। দেখছ, এখানেও সাবধানতা। স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি, কেবল ইঙ্গিত। কিন্তু বুদ্ধিমানের পক্ষে ঐ ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

আমি বললুম, তাহলে উপন্যাসের মর‍্যালটা দাঁড়াল কি?

জয়ন্ত হেসে বললে, মনীষা থাকলেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি অসৎ পথে যায়, তবে শেষ পর্যন্ত তাকে ঠকাতে হয়, যেমন শীতলবাবু।

—আর মনীষা না থাকলে?

—সৎপথে নির্বোধকে লাভবান করে। যেমন তপন।

তপন সহাস্য বদনে বললে, যতই আজ বাক্য-বাগুরা বিস্তার কর কিছুই আমি গ্রাহ্য করব না আমার সোনার দেব-দেবীদের শত শত প্রণাম ক'রে, এখনি দুর্ভেদ্য লোহার সিন্দুকে তুলে রাখব।